

অর্ঘ্য, চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

সূচনা।

শোকে যখন আমাদের হৃদয় মুহ্যমান, তখন আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি তাঁহার গুণের কীর্ত্তন ও শ্রবণই আমাদের ভাল লাগে। শুধু যে স্বজন-বন্ধুরই পরলোক-গমনে আমাদের মানসিক ভাব এইরূপ হয় তাহা নহে; যখনই সমাজ, স্বদেশ ও সাহিত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কোন মহানুভব মনীষী তাঁহার বিধি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যান, তখনই আমাদের শোকের বন্যা উক্ত ধারারই অনুসরণ করিয়া সভাসমিতিতে, প্রবন্ধে বক্তৃতায়, কাব্যে, গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। জাতির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর মহাত্মা যখন মর্ত্তসমাজ পরিত্যাগ করিয়া দেবসমাজে গমন করেন, কিম্বা স্বদেশপ্রেমিক যখন পরমপ্রেমিকের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া চলিয়া যান, তখন যে শোকের আবেগ সমস্ত দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলে, তাহাতে কৃত্রিমতা বড় থাকিতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মনীষী আছেন যাঁহারা সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক, কি দেশহিতৈষী অপেক্ষা জাতির হৃদয়ের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন; তাঁহারা প্রতিভাবান সাহিত্যিক। তাঁহাদের এই অনন্যসাধারণ প্রভাবের কারণ এই যে, তাঁহারা একদিকে যেমন লেখনীর সাহায্যে সমাজ ও দেশের সেবায় উক্ত মহাত্মাগণের ন্যায়ই আপনাদিগের নিয়োজিত করিতে পারেন, অপরদিকে তেমনই আবার সত্য, শিব, সুন্দরের যে আলোক তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার জ্যোতিতে সমস্ত জাতির চিত্ত আনন্দোদ্ভাসিত করিয়া তুলেন। তাই তাঁহাদের আসন শুধু গুণগ্রাহী সম্প্রদায়বিশেষের হৃদয়ে নহে, তাঁহারা

সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের মানসরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া থাকেন। দেশের ও দশের সেবায় মত্ততা জন্মাইয়া দিতে, আনন্দের বর্ত্তিকা লইয়া শিক্ষার পথ মুক্ত করিতে, আদর্শের সৃষ্টিদ্বারা মানুষকে চরম পরিণতির সন্ধান আনিয়া দিতে, একমাত্র সাহিত্যিক প্রতিভাই সমর্থ। সুতরাং যখন কোন সাহিত্যিক দিক্‌পাল সহসা এই কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া চিরশান্তির বিশ্রামকুঞ্জে গমন করেন, তখন দেশমধ্যে যে হাহাকার উত্থিত হয়, তাহা বুঝি সহজে নিবারিত হইবার নহে।

আজ কয়েক মাস ধরিয়া আমরা এইরূপ এক জন মনীষীর জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি। যাঁহার গানে আমরা কখনও হাসিয়াছি, কখনও কাঁদিয়াছি, আর কখনও বা স্বদেশপ্রেমের তীব্র উত্তেজনা অনুভব করিয়া জননী জন্মভূমির কালিমা ঘুচাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই প্রতিভাবান্ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মহাসিন্ধুর ওপারের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার নাটক বঙ্গরঙ্গালয়কে অপূর্ব্বগরিমায় গৌরবান্বিত করিয়াছিল, আজ সহসা তাঁহার জীবন-নাট্যে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। যিনি আজীবন ঝুটা, ভেজাল ও মেকীর উপর অজস্র শ্লেষ, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি আজ এমন একস্থানে গমন করিয়াছেন যেখানে সত্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। পরপদদলিত বাঙ্গালীকে যিনি দেশভক্তি শিখাইতেছিলেন, তিনি এখন যে দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহা স্বাধীন-পরাধীন-নির্ব্বিশেষে সকল জাতির সমান আবাসভূমি। যে বীণা সমগ্র দেশকে মাতাইয়াছিল, আজ তাহা নীরব হইয়াছে; যে দুন্দুভি মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইতে আর নিত্য নব নির্ঘোষ বাহির হইবে না।

তাই বাঙ্গালী আজ কাঁদিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার দোষগুণ বিচারের সময় এখনও আসে নাই। তাহার জন্য আমাদিগকে বোধ হয় এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু যদিও আমাদের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা তাঁহার কাব্য-নাটকের সমালোচনার ঠিক উপযোগী নহে, তথাপি তাঁহাকে যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করায় হানি কি? হয়ত সাহিত্যের হিসাবে আমাদের এই চেষ্টার কোন মূল্য না থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেই বা কি আসে যায়? এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া

আমরা তাঁহার কবিত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব-যুগ।

দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বলিতে গেলে তিনি যে যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার কথা আগে বলিতে হয়। কারণ প্রতিভার আবির্ভাব যে একেবারে আকস্মিক ও অসম্ভাবিত নয়, জাতীয় জীবনের সহিত তাহার যে অনেকটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং অনুকূল অবস্থাই যে তাহার বিকাশের সহায়, তাহা আমাদিগকে প্রথম হইতেই মনে রাখিতে হইবে। 'দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর' জাতীয় জড়তা ও অসাদের পর বাঙ্গালী যখন আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, জগতের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার তাহারও যে একটা অধিকার আছে, এই প্রাণোন্মাদকারী ভাব যখন তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তখন বাঙ্গালার তথা ভারতের এক বড় শুভ দিন আসিয়াছিল। যে পরাধীন বাঙ্গালী নিজেকে নিতান্ত অক্ষম ও দুর্ব্বল মনে করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতেছিল, সহসা সে নিজের মধ্যে একটা বিপুল শক্তির আভাস পাইয়া জাগিয়া উঠিল। নবীন আশায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, উদগ্র উন্মাদনায় সে আত্মহারা হইল। এক কথায়, বাঙ্গালী নিজের দেশ ও জাতিকে ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। বিধাতা যে তাহার চোখে এই প্রেমের অঞ্জন পরাইয়া দিলেন তাহা শুধু তাহাকে ভাবের আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিবার জন্য নহে; অবসাদ-ব্যাধি হইতে তাহাকে যে আংশিকভাবে মুক্ত করিলেন, তাহা শুধু তাহাকে সম্পর্কশূন্য স্বাস্থ্যসুখের অধিকারী করিবার জন্য নহে। সম্মুখে তিনি তাহাকে কর্ত্তব্যের দীর্ঘ পথ দেখাইয়া দিলেন। শত শত বৎসরের নিশ্চলতায় জাতির জীবন-নদীতে যে সকল কুসংস্কার-শৈবাল জন্মিয়াছিল তাহা উৎপাটিত করিতে হইবে, পরাধীনতার দূষিত বায়ুতে সমাজশরীরে যে সকল উৎকট ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, জাতীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্যের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া আত্মসম্মানের উদ্বোধন করিতে হইবে, এবং মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ অধিকার, যাহার অভাবে জাতি কখনও প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই স্বাধীনতার

দাবী অকুণ্ঠিতচিত্তে করিতে হইবে। বিধাতার এই অভিপ্রায় বাঙ্গালী তখনই মাথায় তুলিয়া লইল। এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যাসাগর সমাজ ও সাহিত্যের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন, রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল ওজস্বিনী ভাষায় রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে দুন্দুভি-দামামা নিনাদিত হইল আর এক মহবৎ আদর্শের মোহন-বেণু বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর সে বড় আনন্দের, বড় বিষাদের দিন,—যখন রঙ্গলাল গাহিয়া উঠিলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?' যখন হেমচন্দ্র মেঘমন্দ্র-স্বরে জাতিকে আহ্বান করিয়া গাহিলেন, 'আর ঘুমায়োনা, দেখ চক্ষু মেলি' আর বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ সেবা-ব্রতের দীক্ষামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' জাতির কর্ণে ঢালিয়া দিলেন। বড় আনন্দের দিন, কারণ বাঙ্গালী তখন জাতীয় সার্থকতার সন্ধান পইয়াছে; আবার বড় বিষাদের দিন, কারণ তাহার দুর্গতির গভীরতা যে কত বেশী তাহাও সে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

জাতীয় জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। হেম-নবীনের কার্য্য তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সাহিত্য-সূর্য্য বঙ্কিমচন্দ্র অস্তপারের চিন্তায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অভিনিবিষ্ট, বিহারীলাল বাঙ্গলার গীতি-কাব্য-কুঞ্জে নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ সবেমাত্র সেই সুরে গলা সাধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলীয়মান যুগের আশা, ভয়, হর্ষ, বিষাদ প্রথম আবেগের উদ্দামভাব ত্যাগ করিয়া গীতিকাব্যের মৃদুললিত ঝঙ্কারে আত্ম-প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই সময়ে তরুণ যুবক দ্বিজেন্দ্রলাল জাতির সেই আনন্দ ও বেদনায় পূত অস্ফুট হৃদয়-কুসুমে গ্রথিত এবং আন্তরিকতার স্নিগ্ধ শিশিরে সিক্ত একখানি ক্ষুদ্র মালিকা আনিয়া 'জননী বঙ্গভাষা'র 'অমল-চরণ-কমলে' নিবেদন করিলেন। এই অস্ফুট-কোরক-গ্রথিত সঙ্গীত-মালিকা 'আর্য্যগাথা'য় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন সূচিত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

শূন্য গৃহ।

—:*:—

শূন্য এ গৃহ আজ !
দুয়ারে আজিকে পড়েনিক জল, জলেনি এ গৃহে সাঁজ।
তোমার কেশের গন্ধতৈলে এখনো এ গৃহ ভরা ;
জাগিছে তৈল সিঁদুরে তোমার দেওয়াল চিত্রকরা।
সিঁদুর, টিপের কৌটা আরশী ঐ খোলা আছে পড়ি,
চুলের দড়িটি, চিরুণী তোমার ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
তবপদ রেখা আঁকা,
এ গৃহ-মাঝারে সবেতেই হেরি তুমি রহিয়াছ মাখা।

আজি তুমি গৃহে নাই !
তবু পায়ের শব্দ শুনিলে অমনি চমকি ফিরিয়া চাই।
ভূষা-শিঞ্জন কানে শুনি' যেন চারিদিকে তোমা খুঁজি,
মনে হয়, সবি ছড়ান হেরিয়া এখনি আসিবে বুঝি।
শূন্য শয়ন পড়ি কাঁদে ঐ পদাঘাতে, যেন দূরে,
কিছুই আমার খুঁজি নাহি পাই সব গেছে যেন উড়ে।
কেমনে বলগো রই,
তোমার চরণ-চিহ্নেতে ভরা, এই গৃহে তোমা বই !

আজি আমি গৃহহারা !
পথে পথে ঘুরি পথে পথে ক্ষ্যাপা, তোমা লাগি হই সারা।
নিশীথে শয়নে নাহিক নিদ্রা, বেশভূষা অতিদীন,
কাজে একটুও লাগেনাক মন, বিশ্রাম-সুখহীন।
ভিখারী আজিকে ফিরিয়া যেতেছে ঘন ঘন নিরাশায়,
আজিকে গৃহের পশু-পাখীগুলি কেহ না আহার পায়।
গৃহের লক্ষ্মী মম,
তোমা বিনা আজ হয়েছে আমার এ গৃহ শ্মশানসম।

শ্রীকালিদাস রায়।

———

সমাহৃতি।

১। ললিতকলা।

১। শিল্পের মূলসূত্র, আত্মপ্রকাশ। যে শিল্প আপনাকে সব-চেয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারে; তাহা আধুনিক। যে শিল্প পারে না, তাহা গতকালিক। তাহা বর্জ্জনীয়। —টলষ্টয়।

(What is art ?)

২। মানবের চিন্তা এবং হৃদয়-বৃত্তির সুন্দর প্রকাশের ভিতরেই শিল্পের স্বভাব নিহিত। শিল্পের যতই মৌলিকতা থাক্ না কেন, তাহার জন্ম কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে। শিল্পের কার্য্যকারিতা এবং জীবন, কিংবা তাহার স্বাস্থ্য আর বল আর আনন্দ,—এগুলি সব ধ্রুবের মহাবাণী বহন করে, প্রকৃতির আত্মাকে আত্মমধ্যে অনুভব করে এবং বিচিত্র বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করে।

এইজন্য, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির প্রকৃতি এবং ভাবার ধারা শিল্পকে আত্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে প্রকাশক্ষমতা দেয়। কিন্তু যে ধর্ম্মানুরাগী নয়, সে কোনরূপ শিল্প সৃষ্টি করিতে একান্ত অপারগ। —হাড্‌সন।

(Shakespeare, his mind, art and characters.)

৩। জগৎ, নিদর্শনদ্বারা চালিত। এই দৃশ্যমান বিশ্বকে আমরা তাঁহার বিরাট নিদর্শনরূপে গ্রহণ করি। একখানা উজ্জ্বল কার্পাসের বস্ত্রে কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নাই। কিন্তু সৈন্যগণ তাহাকে পতাকা বলে এবং সেই নিদর্শনের সম্মান-রক্ষার্থ অনায়াসে আপনাদের প্রাণদান করে।

এমনই সত্য শিল্পমাত্রই নিদর্শনমূলক। —কার্লাইল।

(Sartor Resartus)

৪। শিল্পী যদি কেবল বাহ্যরূপ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি কিছুমাত্র প্রশংসাভাগী হইবেন না। তিনি কি দেখিবেন ? আত্মার সারূপ্য।

(The Literary Digest)

শিল্পী, আদর্শের আদেশ-নত মন,—তিনি অন্তঃপ্রকৃতির অনুনেতা। যাহারা এটুকু বোঝে না,—তাহারা প্রকৃতির উপরে বলপ্রকাশ করে এবং তাহাদের কার্য্য কেবল প্রাণশূন্য কৃত্রিমতাকে প্রসব করে।

(The Outlook)

সাধারণ নিদর্শনের সাহায্যে শিল্পকে স্বেচ্ছামত পরিস্ফুট করিতে পারা যায়। ভাস্কর্য্যের ভিতরে শিল্প এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে যে, দর্শক-মাত্র যেন বুঝিতে পারে, ইহা চিদাত্মার মূর্ত্ত বিকাশ, শিল্পীক্ষোদিত বাহ্যরূপ এখানে প্রচ্ছাদনীমাত্র। —রোডিন্।

(The Contemporary Review)

৫। প্রকৃতিকে নিখুঁত ভাবে নকল করা শিল্পীর কর্ত্তব্য নয়। যিনি প্রকৃতির নকলনবীশ, তিনি কোন উচ্চ বিষয়ের জন্ম দিতে পারেন না। ললিতকলার প্রধান উদ্দেশ্য,—তা' সে ছবিই হোক্ আর কবিতাই হোক—ভিতরের কথা জানা। তাহার ভিত্তি হৃদ্‌মধ্যে। —স্যার জস্যুয়া রেণল্ডস্।

(Discourses on Painting)

৬। চিত্রকরের চিত্র দেখিয়া, যদি কেহ বলেন 'ছবির মানুষটি এমন জীবন্ত যে, দেখিলে রক্তমাংসের দেহ বলিয়া ভ্রম হয়'—তাহা হইলে, তেমন প্রশংসায় কোন চিত্রকারী আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিবেন না। আসল ফুল যেমন মন ভুলায়, নকল ফুল কি তা পারে? তাতে শিশু ভোলে। (অতএব, নকল করা শিল্পীর প্রধান অভিপ্রায় নয়।) —কোলরিজ্।

(Prose and Table Talk)

৭। যাহার কাছে প্রকৃতি আপন গুপ্তকথা খুলিয়া বলেন, তিনি প্রকৃতির ব্যাখ্যাকারী শিল্পকে লাভ করিবার জন্য অদমনীয় বাসনার বশবর্ত্তী হন।

শিল্পীকে উপদেশ দেওয়া হয় যে,—যাও, প্রকৃতিকে অধ্যয়ন কর। কিন্তু, উচ্চকে সাধারণক্ষেত্র হইতে কিংবা সৌন্দর্য্যকে আকারহীনতার ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনা কি বড় যে সে কথা? —গেটে

(Criticism, Reflection and Maxims of Goethe)

৮। কি কবি আর কি চিত্রকর,—কেহই আপনার আদর্শকে খর্ব্ব করেন না; পরন্তু, তাহাকে আপনার অনুভূতি দিয়া পূর্ণ করেন এবং তৎসহ তাহাতে সামর্থ্য ও বাস্তবতা দেন। ইহাতে দর্শক বা পাঠককে সুধু যে সন্তুষ্ট করা হয়, তা নয়; বেশীর ভাগ তাহাদিগকে আশার অতিরিক্ত আরও কিছু প্রদান করেন। আমাদের হাতে প্রকৃতির নিত্য-দেখা রূপের ছবিটি দেওয়া প্রশংসার কথা বটে, আমাদের হাতে প্রকৃতির সেই ছবিটি দেওয়া—

আমরা কখনও দেখি নাই, অথচ দেখিবার প্রত্যাশা রাখি,—আরও অধিক প্রশংসার কথা। যিনি চির-পুরাতন পৃথিবীকে আপন অনুভূতিতে আবৃত করিয়া আমাদের দেখান, যিনি প্রকৃতি যেমন আছে, ঠিক তেমনটি দেখান না, তাঁহার শিল্পই চরম শিল্প। —হ্যাজ্‌লিট

(Essays)

৯। কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলাবিদ্যাবলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে "স্বাভাবিক" "স্বাভাবিক" বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(নাট্যমন্দির)

১০। সে যুগের শিল্পীরা সুধু যে নিপুণ কারিগর ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা সাধক ছিলেন। * * সেদিনও নেপালের ধর্ম্মরাজগণ যে হাতে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেছেন, সেই হাতেই তুলিও ধরিয়া গেলেন। সত্য শিল্পে যে নিয়মের বন্ধন, দস্তুরের সঙ্কীর্ণতা না থাকাই শ্রেয় একথা কি রাস্কিন, কি হ্যাভেল, কি আর কেহ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল আমরাই হায় রে Perspective, হায় রে Anatomy, কোথায় Realistisc করিয়া মরিতেছি! —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ভারতী)

১১। অশিল্পী বর্ব্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে। —বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(গ্রন্থাবলী)

১২। সংসারের সৌন্দর্য্য দুই সাধারণ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) স্বভাব-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য এবং (২) সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্ট সৌন্দর্য্য। স্বভাবের রূপ ও আকারগত সৌন্দর্য্য বাহ্যপ্রকৃতিতে বিদ্যমান; * * * সাহিত্যের ও শিল্পের সৌন্দর্য্যও স্বাভাবিক ও স্বভাবের অন্তর্ভূত,—সম্পূর্ণরূপে স্বভাব-সম্মত ও স্বভাব-সঙ্গত; কিন্তু ঠিক স্বভাবসদৃশ নয়, কিঞ্চিৎ স্বভাবাতি-

রিক্ত। স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া অস্বাভাবিক নহে। স্বভাবে যাহা সম্ভবে, অথচ সত্য হয়ত' যাহার রক্তে মাংসে অস্তিত্ব নাই; তাহাই স্বভাবাতিরিক্ত।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

(জন্মভূমি ১২৯৯)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পিতৃ-স্নেহ।

—:০:—

১

ফয়জুন্নিসা-বিবি ছেলেদের চিরভীতিপ্রদ "ছেলেধরা" সাজিয়া অর্থাৎ "বুরখা" পরিয়া কোথায় গিয়াছিলেন, এখন ঘরে ফিরিতেছেন; তাঁহার বাড়ী খিদিরপুরে। পথে একজায়গায় দেখিলেন, ভিড় হইয়াছে। বেশী ভিড় দেখিলে, বুড়ী ফয়জুন্নিসা বড় এগোন না; এই ভিড়টি ছোট রকমের; ৮।১০ জন লোক কাহাকে যেন ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবির স্বজাতীয় এক গালপাট্টাধারী লাল-পাগ্ড়ীও আসর সরগরম করিতেছে।

তাই ফয়জুন্নিসা ভিড়ের সন্নিকট হইয়া গলা তুলিয়া ভিড়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন,—একটি মুসলমান বালক মাথা নীচু করিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার কপালের একপাশ ফুলিয়া ঢিবি হইয়া রহিয়াছে, খানিকটা শুষ্ক রক্তও সেখানে দেখা যাইতেছে। পাহারাওয়ালা তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছে, সে তাহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর শ্রুতিযোগ্য উচ্চ স্বরে দিতেছে না। ইহা দেখিয়া বুড়ী ফয়জুন্নিসার বালকের প্রতি মমতা জন্মিল; তাহার মুখের সহিত বহুকাল পূর্ব্বদৃষ্ট কোন্ এক চেনা মানুষের মুখের সবিশেষ সাদৃশ্যও ছিল।

বুড়ী অগ্রসর হইয়া পাহারাওয়ালার উদ্দেশে কহিল, "কৌন্ হ্যায় ইয়ে ছোক্‌রা পাহারাওয়ালা সা'ব, ক্যা হুয়া ইস্‌কা, কিস্‌কা লাড়্‌কা?"

পাহারাওয়ালা বিরক্তিসহকারে উত্তর দিল, "ওহি বাত তো হম্‌ভিস্‌সে ইস্‌কো পুছ্‌তে হেঁ—কা বোল্‌তা হ্যায় হামারী লোগো সমঝ্‌তে নেহি।"

বুড়ী ফয়জুন্নিসা তখন সেই বালককে স্নেহপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুম্ কৌন্ হ্যায় বাচ্চা—শিরমে কিস্‌তরেসে চোট্ লাগা ?"

বালক বুড়ীর মুখের দিকে উঁচু নজরে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া তাহার ভরসা জন্মিল। বুড়ী মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। বালক বুড়ীর কথায় উত্তর দিল। সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই,—তাহাদের বাড়ী মেছুয়াবাজারে, তাহার "বাপ্‌জান" গুণ্ডা, বড় বদ্‌রাগী, বড় "দারু পিয়ে"। মদ খাইয়া তাহাকে বড় মারিয়াছে—সে "বেহোঁশ" হইয়া পড়িয়াছিল; "হোঁশ" হইলে, সে "কোঠি" ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে—আর "কোঠিতে" ফিরিয়া যাইতে চাহে না—এবার তাহার বাবা তাহাকে পাইলে আর "জিন্দা" (জীবিত) রাখিবে না।

ফয়জুন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

বালক। গুলজার আলী।

ফয়। তুমি কি আমার সঙ্গে যাইতে চাও !

গুল্। হাঁ—বড্ড "ভুক" লেগেছে। কিন্তু পায়ে বড় "দরদ", আর আমি হাঁট্‌তে পা'রছি না।

ব্যাপার বুঝিয়া লোকেরা ভিড় ভাঙ্গিয়া সকলে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালাও "উপরি"র কোন সুযোগ নাই দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় হইল। বিবি ফয়জুন্নিসা গুলজারকে লইয়া প্রথমে এক "কাবাব রোটী"র দোকানে ঢুকিলেন, সেখানে তাহাকে পেট পূরিয়া উক্ত খাদ্য ভোজন করাইলেন। পরে একখানা "থার্ড ক্লাস" ঠিকাগাড়ী সস্তায় ভাড়া করিয়া তাহাকে তন্মধ্যে উঠাইলেন, আপনিও উঠিয়া বসিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে এক জায়গায় আসিয়া বালকের জন্য একখানি পাঞ্জাবী ও আর এক জায়গায় আসিয়া দুইখানি কোরা নয়ানসুকের ছয়হাতি ধুতি কিনিলেন। বালকের বয়স ৮।৯ বৎসর, তাহার পরিধেয় বসনখানা শতধা ছিন্ন।

ফয়জুন্নিসা খিদিরপুরের একপ্রান্তে থাকেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে "বাড়ীওয়ালা" বলিয়া ডাকে। তাঁহার নাম তাহারা অবগত নহে। বাড়ীখানি

ফয়জুন্নিসার নিজের। তাহাতে তিনি কয়েক জন দরিদ্র ভাড়াটিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদেরই সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিজের কেহ নাই। ভাড়াটিয়াগুলির নিকট হইতে ভাড়া বাবৎ তিনি ৩।৪ টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা গরীব ও ছা'পোষা লোক, তিনি তাহাদের উপরে জুলুম করেন না। তাঁহার কিছু টাকা "ব্যাংকে" জমা আছে, তাহার সুদ আসে। তাহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হয়। ফয়জুন্নিসা যখন বাড়ীতে পঁহুছিলেন, তখন গুলজার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহাকে জাগাইলেন না। লতিবের মা বলিয়া ফয়জুন্নিসার একজন দাসী আছে, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একে 'গদীতে' করিয়া লইয়া আয়।"

তাহা শুনিয়া দাসীর মুখভঙ্গী যেরূপ সুন্দর হইল, তাহা "বিশেষ দ্রষ্টব্য!"

২

আতা হোসেন—গুল্‌জারের 'বাপ্‌জান'—এককালে "আপসর আদমী" ছিল; কিন্তু এখন সে ইতরের একশেষ হইয়াছে। আগে সে "পরব-উরবে"র দিন "থোড়া বহুৎ দারু-উরু পিইয়া" একটু-আধটু "মৌজ" করিত, এখন "দারু" তাহাকে খাইতে বসিয়াছে। "হরদম্" মদ খায়, কখন সাদা চোকে থাকিতে চায় না।

বেলা দুইটা কি আড়াইটা হইবে। এখন সে বড়ই বিষণ্ণ মনে মেছুয়াবাজারের নিকটবর্ত্তী একটা শুঁড়ীখানায় বসিয়া রহিয়াছে। দুই দিন অবধি সে যেন একটু দমিয়া গিয়াছে—শুম্ মারিয়া আছে। এই দুই দিন তাহার পেটে কিছুই পড়ে নাই, মদও না। অনেকেই তাহার এই ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে পারিতেছে না; কিন্তু সে পাড়ার লোকেরা তাহাকে খুব করিয়াই জানে—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে। আতা হোসেন দয়া-মায়ার ধার ধারে না, দুই টাকা মদ খাইতে পাইলে, যাহার সহিত তাহার কোনই শত্রুতা নাই, তাহারও উপর ছোরা চালাইতে কোনই কুণ্ঠা-বোধ করে না। গুণ্ডামিই এখন তাহার পেশা।

সে বসিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার "দোস্ত" আবদুল গফুর সেখানে দেখা দিলেন। ইনিও বড় "কেও-কেডা" নন, ইঁহার একটি গাঁঠ-কাটার

আড্ডা আছে। আবদুল, আতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আতা চমকিয়া উঠিল।

আব্। কেয়া জি দোস্ত, খোয়াব দেখ্‌তে হো? সালামালেকম্!

আতা। বাত কুছ্ হ্যায়? নেহিত, ইয়ার, আপ্‌না ফিকিরমে রহো; আজ হাম্‌সে বাতচিৎ নেহি ক'রো। দো রোজ সে একদানা চানাভি মুমে নেহি ডালা। ভবিয়ৎ খারাব, দিল্ খারাব, মিজাজ খারাব—সব খারাব। আজ দো রোজ হুয়া, গোস্‌সা কা মারে, গুল্‌জার কো লাথ্ মারকে মার্ ডালা। মেরা বচ্চা! আব্‌হি হম্‌কো মৎ চিড়াও।"

আব্। গুল্‌জার কো মার্ ডালা—কাহে, বিচারা কা কসুর কিয়া থা?

আতা। বাৎ বোলা, শুনা নেহি, মার দিয়া এক লাথ। গির পড়া, শির সে খুন্ বহ্ জানে লাগা, হম্ ইত্‌না খিয়াল নেহি কিয়া, কাম্‌মে চলা গিয়া। সাঁঝকা বখৎ ঘরমে নৌটকে দেখে—লাড্‌কা কাঁহা গায়েব হো গিয়া—মেরা বচ্চা!

আব্। আরে জানে দো দোস্ত্, যো গিয়া, সো গিয়া—জহান্নম্‌মে গিয়া, তুম্‌রা পয়সা বাঁচ গিয়া। হিঁয়ি বৈঠা রহ, ময় আব্‌হি আতেঁ হেঁ।

কিছুক্ষণ পরে আব্‌দুল গফুর, "কাবাব রুটী" ইত্যাদি লইয়া আসিল। শুঁড়ীখানা হইতে এক বোতল মদও কিনিল। তাহার পর আতা হোসেনকে অনুরোধ করিল, "দু'দিন থেকে 'ভুখা' আছ, খাও। তোমার সঙ্গে আমার একটা 'সল্লা' আছে, সে কথা খালি পেটে সাদা চোখে ভাল লাগ্‌বে না।" আতা পুত্রশোকে কাতর, সহজে খাইতে চাহিল না; রাগিয়া গিয়া আবদুলকে অনেক "ছোটা বড়া বাত" বলিতে লাগিল। আব্‌দুল রাগিল না; তাহাকে বড় ফুস্‌লাইতে লাগিল। শেষে আতা তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কিছু খাইল।

তখন উভয়ে মদ খাইতে খাইতে ফুস্‌ফুস্ করিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

৩

ফয়জুন্নিসা গুল্‌জারকে পুত্রাধিক ভালবাসেন। তাহার সকল ভারই তিনি লইয়াছেন। তাহাকে "মস্‌জেদের মাদারসায়" পড়িতে পাঠান।

গুল্‌জারের বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ, সে খুব মন দিয়া পড়িতেছে। তাহার চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে—তাহার অঙ্গের গৌর বর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার 'হাড়ে মাস' লাগিয়াছে।

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটা—গুল্‌জার "মাদারসা" হইতে বাড়ী ফিরিল। তাহার মুখে ভীতি-চিহ্ন, সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহা দেখিয়া ফয়জুন্নিসা উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'য়েছে, মেয়া বচ্চা, অমন ক'রে কাঁপ্‌চিস্ কেন ?"

গুল্। ফুফু, আর আমি মাদারসায় প'ড়্‌তে যাব না।

ফয়। কেন, বচ্চা, মৌলভী সাহাব তোকে বুঝি বড্ড মারে ? আচ্ছা—

গুল্। না, তা নয়, ফুফু। আজ পথে বাপ্‌জানকে দেখ্‌লুম—আমাকে ধ'রে নিয়ে যা'বে। ভাগ্যিস্ আমাকে দেখ্‌তে পায় নি, তা'হলে আজই ধ'রে নিয়ে যেত।

ফয়। তোর বাপ্‌জান ? বলিস্ কি, রে বচ্চা ? আচ্ছা, আসুক সে, তোর কিসের 'ডর্' ; আমি 'জান' দোব, তবু তোকে ছা'ড়্‌ব না ; আমি দেখ্‌ব তা'র কত বড় 'হিম্মৎ' !

গুলজারের ভয়-ভাব কতকটা কমিয়া গেল। বৃদ্ধা তাহাকে স্নানাহার করাইয়া আপনার পাশে শোওয়াইয়া দ্বিপ্রহরে একটু বিশ্রাম করিলেন। বিকাল-বেলা আপনি সঙ্গে করিয়া তাহাকে মাদারসায় লইয়া গেলেন ; আবার তাহার ছুটি হইলে, বেলা ছয়টার সময়ে তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

* * * * *

রাত তখন বারটা হইবে। বুড়ী পাশের ঘরে, অঘোরে ঘুমাইতেছেন। গুলজার তাহার নিজের ঘরে শুইয়া আছে। আজ তাহার, কি জানি কেন, ঘুম আসিতেছে না,—বিছানায় শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। তাহার ঘরের দরজায় লতিবের মা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা—তাহার নাসিকায় ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর আলাপ হইতেছে।

এমন সময়ে গুল্‌জারের ঘরের দক্ষিণ দিকের একটা জানালা খুলিয়া গেল। কে একজন জোর করিয়া জানালার দুইটা লোহার গরাদে টানিয়া

ফাঁক করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। তাহার পর একটী "চোরা বাত্তি" ঘুরাইয়া ঘরটি আলোকিত করিয়া ফেলিল। গুল্‌জার ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। গুল্‌জার লোকটির মুখপ্রতি চাহিল, লোকটিও গুল্‌জারের মুখপ্রতি চাহিল, উভয়েই স্তম্ভিত হইল। আগন্তুক আতা হোসেন!

বাহিরে যে এক জন দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, কি, দোস্ত, হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি? শীগ্‌গির শীগ্‌গির "কাম্ সার।"

আতা চুপি চুপি বলিল, এ ঘরে একটা ছেলে জেগে রয়েছে। যে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, সে আব্‌দুল। সে বলিল,—"ছেলে? তা' হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি" নিকেশ ক'রে ফেল না।"

আতা হোসেন তাহার কথায় কাণ দিল না। গুল্‌জারকে বুকে টানিয়া লইল, তাহার চোক দু'টি জলে পূরিয়া আসিল।

গুলজার বলিল, 'বাপ্‌জান, তুমি আমাকে খুন ক'র না—আমার "কসুর" মাফ্‌ কর।"

আতা হোসেন বলিল,—"ভয় নেই, বচ্ছা, আমি তোমাকে খুন ক'র্‌তে আসিনি, এ কা'র বাড়ীতে আছ?"

গুল্। ফয়জুন্নিসা বিবির। বিবি বড় মেহেরবান।

আতা। ফয়—ফয়জুন্নিসা? সে কে?

এমন সময়ে আব্‌দুল বাহির হইল বলিল—"কি রে ছোঁড়াটার সঙ্গে কি ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কচ্ছিস্? কথা-বার্ত্তার দরকার কি, টুঁটি টিপে ধর্ না।"

আতা। দোস্ত, আমার দ্বারা এ কাজ হ'বে না। এ আমার এক "জান-পছান" লোকের বাড়ী। আর এ ছোক্‌রা আমার গুল্‌জার।

আব্। আরে! ও হারামী ছোক্‌রা আবার এখেনে কোথ্‌থেকে এল? যাগকে, মরুক গে; এ আবার তোর কোন্ 'জান-পছান' লোকের বাড়ী? মিছে ছুতো ক'রে 'বখত বরবাদ' কচ্ছিস্। আমার সঙ্গে যা কড়ার আছে, তা' ক'রবি কি না?

আতা। না, এ বাড়ীতে আমি সে কাজ পা'রব না।

আব। বটে, আমার সঙ্গে ‘বেইমানী’? তবে ‘জহান্নমে’ যাও। হারামজাদ্, শূয়ার!

এই বলিয়া আব্দুল আতা হোসেনের মস্তকে একটা শাবল নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। আতা হোসেন চীৎকার করিয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়া গেল। তাহার মাথা ফাটিয়া দু'ফাঁক হইয়া গেল। হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া লতিবের মা আঁউ মাউ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বুড়ী ফয়জুন্নিসা একটা হারিকেন লণ্ঠন লইয়া অন্য ঘর হইতে “কা হুয়া, কা হুয়া” করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। গুল্জার কাঁদিতেছিল। ফয়জুন্নিসা আলোক হস্তে গুল্জারের ঘরে ঢুকিলেন। কাণ্ড দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “এ ইয়ে আল্লা, কা হায়ি রে, বাপ্। মেরা ঘর্‌মে ইয়ে রাহাজানি কৌন্ কিয়া। গুলজার এ কৌন হায় রে, বাপ্?

“মেরা বাপ্জান।”

“তেরা বাপ্জান!”

ফয়জুন্নিসা আলোকরশ্মি আহতের মুখে ফেলিলেন। আহত ব্যক্তি কহিল, —“ফয়জুন্নিসা মেরা বিবি, খোদা তুম্‌কো বাঁচাকে রাখ্‌খে। ময় বড়া গুনা-গার। কসুর মাফ্। গুল্জার—মেরা জান—”

আর তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; তাহার চোক উল্টাইয়া গেল।

ফয়জুন্নিসা আতা হোসেনের প্রথম পক্ষের “বিবি”; বিনা দোষে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে “তালাক্” দিয়াছিল। তিনি কিন্তু আর দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই, কেন না আতা হোসেনকে তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। গুলজারের মুখে যখন তিনি শুনেন যে, তাহার বাপজানের নাম আতা হোসেন, তখন তিনি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার সে বিহ্বলতা দুর হয়। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার সে “আপ্‌সর শৌহর” (ভদ্র স্বামী) কখন গুল্জারের ন্যায় বালকের পিতা হইতে পারেন না। আমরা বলিয়াছি, ফয়জুন্নিসা বুড়ী। কিন্তু তাঁহার বয়স ৪০।৪২ বৎসর, তবে তাঁহার চুলগুলি কেন জানি না, একেবারে পাকিয়া গিয়াছিল।

* * * *

ফয়জুন্নিসা তবে গুলজারের "কুফু নহে, "সভেলা মাই"। গুলজার ফয়জুন্নিসারই কাছে মানুষ হইতে লাগিল।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

ভরা নদী।

—:*:—

আজিকে অবোধ হিয়া প্রবোধ না মানে,
পাগলের পারা ধায় সাগরের পানে।
গরজি' উরমি ছোটে আথাল পাথাল,
তৃণসম ভেসে' যায় বিষয়-জাঞ্জাল।
ওই দূরে—ওই কাছে ভাবিছে সাগর,
এখনি বাঁধিবে তারে বাহুর ভিতর।
চরণের গতি-ভরে ভেঙ্গে' পড়ে তীর,
আছাড়ি পিছাড়ি ধায় তটিনী অধীর।
লতা কাঁদে গলা ধরি', তরু লোটে পায়,
না মানে কূলের মানা, ফিরিয়া না চায়।
আজিকে এসেছে তার মরা গাঙ্গে বান্,
ভাদরের ভরা নদী করে আনচান্।
আবিষ্টের মত ধায় আপনা পাশরি',—
সে আবেগ ধরিবে কি প্রেম-সিন্ধু হরি?

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

বর।

—:*:—

মৃত পুত্র কোলে করি বসি গৃহকোণে।
বৃদ্ধা মাতা ধ্যান-মগ্ন হসিত বদন,
"ভগবন্। কতদিন কত রত্ন ধনে
কত প্রিয় বস্তু দিয়ে পূজেছি চরণ।
কই কোন বর মোরে করনি প্রদান!
হৃদি-বৃন্ত হ'তে আজি তুলি পুষ্প এই
বড় প্রিয় বস্তু মম তব পদে দেই—
বর ভিন্ন ছাড়িব না আজি ভগবান!"
অকস্মাৎ চাহি দেখে কুটীরের পরে—
লক্ষ অগ্নিশিখা আসে ছুটি' ভয়াবহ
চারিদিক হ'তে ধায় দাউ দাউ করে'
দগ্ধ করিবারে বৃদ্ধা মৃত পুত্র সহ।
"ভগবান্ পূর্ণ মোর অনন্ত বাসনা
সার্থক আমার আজি চির-আরাধনা!"

শ্রীসুকৃতী দেবী।

লক্ষ্ণৌ।

—:*:—

দিল্লী, আগ্রা, আর লক্ষ্ণৌ,—এ তিনটি সহর এক ছাঁদে গড়া। এমন কি, কেবল গুটিকয়েক শিল্পগৌরবের কথা ছাড়িয়া দিলে, ইহার একটীকে দেখিলে, তিনটিকে দেখা হয়। সেই সুপ্রশস্ত ধূলাভরা রাজপথ, সেই এক আদর্শের বাড়ীঘর, বাজারহাট, সেই একধাঁজের পোষাক-পরা লোকজন!

কিন্তু সহর-হিসাবে দিল্লী ও আগ্রা, লক্ষ্ণৌয়ের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। ইহার লোকসংখ্যা আগে ৯,০০,০০০ লক্ষ ছিল। এখন, ভাগ্যবিবর্তন ও সিপাহী বিদ্রোহের দরুণ লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

এত বাগানও বুঝি আর কোথাও নাই। ছাদের উপরে উঠিয়া চাহিয়া দেখ, কেবল বাগান আর বাগান,—সারা সহরই যেন বাগান। দেখিলেই বুঝা যায়, বিলাসিতা এখানে চরমে উঠিয়াছিল। আর বাস্তবিক, নবাবদের সময়ে, এই লক্ষ্ণৌ ভারতের প্যারিস ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার রাজধানী। রামের অযোধ্যা এবং কুরু-পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ, ভারতের কবিগাথায় এই দুটিস্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উভয় স্থানই বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। রামায়ণী যুগে এই আধুনিক লক্ষ্ণৌ সহরের কাছেই প্রাচীন অযোধ্যার তোরণ ছিল; কিন্তু এখন তাহা কালের যাদুতে অদৃশ্য।

১২৪০ খৃঃ অব্দ হইতে আমরা অযোধ্যার সুবাদারের নাম জানিতে পারি। কিন্তু ১৫৯০ খৃঃ অব্দের আগে অযোধ্যার শাসক যথার্থ সুবাদারের উপাধি পান নাই। আকবর সা'র দ্বাদশ সুবার মধ্যে লক্ষ্ণৌ অন্যতম। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে সাদত্ খাঁন, লক্ষ্ণৌয়ের সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে নাদির সা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মহম্মদ সা, তখন দিল্লীর সিংহাসনে। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সাদত্ খাঁন, সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন—কিন্তু আর ফিরিলেন না। তাঁহার জামাতা, মনসুর আলি খাঁন্, সফ্‌দরজঙ্গ ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে বসিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে তিনি সম্রাটের উজীর হইলেন। এই সময় হইতে অযোধ্যার সুবাদারী পদ উজীর

গেল এবং এখানকার শাসক, নবাব-উজীর উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সফ্‌দরজঙ্গ, ফইজাবাদ সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দৌলা তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। সুজাউদ্দৌলা, বঙ্গের ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। লক্ষ্ণৌয়ের সকল নবাবের ভিতরে তিনি আপনার নাম, ক্ষমতা ও রাজ্য সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন। তখন দিল্লীর বাদশাহের শক্তিসূর্য্য অস্ত-গমনোন্মুখ; সুতরাং এ দিকে তাঁহার সুযোগও যথেষ্ট মিলিয়াছিল। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে সুজার মৃত্যু হয়; তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলা সিংহাসনে বসিলেন। আসফ, লক্ষ্ণৌ সহরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। পুত্রহীন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পোষ্যপুত্র ওয়াজির আলি সা ছয়মাসের জন্য রাজত্ব করেন। কিন্তু সিংহাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজাসনচ্যুত হন। তিনি বেনারসে নির্ব্বাসিত হন এবং সেখানে মিঃ চেরীকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যা করেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে আসফ-উদ্দৌলার ভ্রাতা সাদত্ আলি খাঁন সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি ষোড়শবৎসর রাজত্ব করেন। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবগণের ভিতরে তাঁহার মত সুশাসক এবং জ্ঞানী নবাব আর দেখিতে পাই না। কেশরবাগ ও দিলখোসবাগের মধ্যবর্ত্তী অধিকাংশ প্রধান প্রাসাদাবলী তাঁহারই নির্ম্মিত।

১৮১৪ খৃঃ অব্দে সাদতের পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে নবাব উপাধি উঠিয়া যায়—শাসকগণ রাজ-খেতাবেরও অধিকারী হন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে নাসিরউদ্দীন হায়দার সিংহাসনে বসিলেন। নাসির স্বীয় রাজত্বকালে সুনাম কিনিতে পারেন নাই। আমোদপ্রমোদেই তাঁহার দিনযাপন হইত। মতি মহল এবং তরওয়ালি কুটীর অধিকাংশ তাঁহার নির্ম্মিত। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় নাসিরের মৃত্যু হইলে তদীয় খুল্লতাত নসিউদ্দৌলা সিংহাসন পাইলেন। পাদশা বেগম—সম্ভবতঃ নসিরের উপপত্নী মুন্নাজান নামে এক জারজ সন্তানকে রাজ্যাধিকারী করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়।

মসিউদ্দৌলা মহম্মদ আলি সা নামগ্রহণপূর্ব্বক মাত্র চারিবৎসরব্যাপী রাজত্ব করেন। হোসেনাবাদ ইমামবাড়ী তাঁহারই নির্ম্মিত। তাঁহার পরে আজিদ আলি সা রাজা হন। তিনি নিজের কবরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতেই রাজত্বকাল অতিবাহিত করেন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র ওয়াজিদ আলিসা সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। কেশরবাগ নামে নন্দনকাননতুল্য উদ্যান তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন—কিন্তু কেশরবাগের মর্ম্মর-বিরচিত দুগ্ধশুভ্র শীতল জলাধারের পার্শ্বে নধরশ্যাম শষ্পের গালিচায় অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সুরা এবং কামিনীসম্ভোগেই তাঁহার অবসর যাপিত হইত—সে চোখে অন্য কিছু পড়িবার যো ছিল না। ইনি লক্ষ্ণৌয়ের শেষ রাজা। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকেও পদচ্যুত করেন। (Brief History of Lucknow.) ইহাই লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ আর কি! লক্ষ্ণৌয়ের নবাবীর স্বপ্ন অনেক দিন টুটিয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও নবাব এখানে অলিতে গলিতে! সবাই নবাব—এমন কি কোচম্যান্ নবাব দেখিয়াও তুমি চমকিয়া উঠিও না। আমার ত নবাবে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছিল যথেষ্ট। লক্ষ্ণৌ ঠুংরি ভারতপ্রসিদ্ধ এবং গোলাম নবী ওর্‌ফে শোরী মিঞার সুর ও চাল ভাঙ্গিয়াই আমাদের নিধুর টপ্পা। ঠুংরি বা টপ্পা শ্রেণীর সুর বিলাসিতা নহিলে জন্মে না। অনেক যায়গায় বিলাসের আধিক্য সঙ্গীতের উন্নতিসাধন করে। সঙ্গীতের পবিত্রতা অস্বীকার করি না—কিন্তু সঙ্গীত যে বিলাসিতার উপকরণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। হয় ত' লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীতের উন্নতিরকারণ তাহাই।

লক্ষ্ণৌয়ের প্রধান দর্শনীয় স্থান এই কয়টী। ১। কেশরবাগ। ২। ছত্রমঞ্জিল। ৩। ইমামবাড়ী ও মস্‌জিদ্। ৪। হোসেনাবাদ ইমামবাড়ী। ৫। সেকেন্দরবাগ। ৬। দিলখুসা। ৭। সা নজুফের কবর। কেশর পসিন্দ্। ৯। মার্টিন কুঠি। ১০। রেসিডেন্সি। ১১। তস্‌বিরখানা ১২। বাদ্যঘর। আরও কয়েকটী অতি সুন্দর কবরবাড়ী আছে। তাহাদের নাম আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। স্থান অল্প; বিশেষ করিয়া সকলের

কথা বলা চলিবে না। অতএব, আমি প্রধান কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র দিতে চেষ্টা করিব।

কেশর বাগ। এখন ইহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের কিছুই নাই; ব্যবসায়ী ইংরাজের হাতে পড়িয়া তাহার শোভন মর্ম্মরের অনেক কারুকার্য্য স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা আছে তাহাও অতুল; তেমন যে দেখিব, এ আশা ছিল না।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই উদ্যান-নির্ম্মাণ আরব্ধ হইয়া ১৮৫০ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। নির্ম্মাণব্যয় কল্পনাতীত—৮০ লক্ষ টাকা! একটী তোরণ আছে, তার নাম "লক্ষ তোরণ।" কেবল সেই তোরণেই লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়া ছিল। টাকা যেন টাকা নয়—খোলামকুচি! শুনিয়াছি, এখানে রূপার গাছে সোনার ফুল সাজান ছিল!

চারিদিকে দুর্ব্বা-শয্যা বিছানো। মাঝে মাঝে মার্ব্বেলের বিশ্রামাসন, শোভন উৎস, কুঞ্জবিতান, জলাধার! এক যায়গায় তলপর্য্যন্ত পাথরে বাঁধা দীর্ঘ কিন্তু ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তাহার এপার হইতে ওপারে যাইবার জন্য একটী সুপরিকল্পিত-কুসুমিত-লতাখোদিত মর্ম্মর-সেতু।

হোলির সময়ে নাকি ওয়াজিদ্ আলি আপন বেগমদের লইয়া এই উদ্যানে ফাগোৎসবে মত্ত হইতেন।

ওয়াজিদ আলির কবিত্বেরও অভাব ছিল না। গায়কদের কণ্ঠে আজও তাঁহার নিজের হাতে বাঁধা অনেক গান শোনা যায়। বাগানের একধারে সুনির্ম্মিত নাচঘর। প্রকাণ্ড কক্ষ। এখানে গানের মজ্‌লিশ্ বসিত। নানাযন্ত্র হইতে নানা মধুর সুর উঠিত—সেই সঙ্গে নৃত্যছন্দে তরুণী তম্বঙ্গীগণের লীলাবঙ্কিম রত্নবিখচিত ভূষণোজ্জ্বল কমতনু তালে তালে দুলিয়া উঠিত, এবং সে কিন্নরকণ্ঠের মানসহারিণী রাগিণীর রেশটুকু লইয়া আকুল সমীর বাহিরে ছুটিয়া যাইত; রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে পথিকেরা হঠাৎ সে গানের অনুরণন শুনিয়া মুরলীগুঞ্জনমুগ্ধ মৃগবৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হয়ত ভাবিত—"প্রাচীর-ব্যবধানে স্বর্গ রহিয়াছে—হায়! তবু আমার সম্মুখে তার দ্বার বন্ধ!"

ছত্রমঞ্জিল। নসিরুদ্দীন হায়দার আপন অন্তঃপুরচারিণীগণের জন্য এই

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। গোমতী নদীর ধারেই এই প্রাসাদ—সুন্দর অবস্থান। শুনিলাম, আগে ইহার শীর্ষে একটী কনক ছত্র ছিল। তাহা হইতেই নামকরণ হইয়াছে। নদীর দিকে এখনও জেনারেল আউট্রামের কামান-নিঃসৃত গোলার চিহ্ন বিদ্যমান। যে প্রাসাদে আগে নবাব ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষের প্রবেশ-নিষেধ ছিল, আজ সেখানে ডেপুটী কমিশনারের অফিস বসিয়াছে। কালমাহাত্ম্য!

ইমামবাড়ী ও মসজীদ। আসফউদ্দৌলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। নবাব, এই ভারতবিখ্যাত কীর্ত্তি-স্থাপনের জন্য চারিদিক হইতে শিল্পীদলকে আহ্বান করেন এবং যাঁহার পরিকল্পনা উৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার-প্রদানের অঙ্গীকার করেন। প্রতিযোগিতায় জয়ী হন কায়ফিতুদ্দৌলা। আসফউদ্দৌলার কবর, ইহার ভিতরে আছে। এই মসজীদ নির্ম্মাণকালে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নবাব, তাঁহার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণকে ইমামবাড়ীর কাজে নিযুক্ত করেন। ফলে, পারিশ্রমিকের আয়ে বহুসহস্র দরিদ্রের প্রাণরক্ষা হয়।

এই ইমামবাড়ী দৈর্ঘ্যে ১৬৭ ফিট এবং চওড়ায় ৫২ ফিট। প্রকাণ্ড বাড়ী—শিল্পকার্য্যও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহার উপরে বেগমদের বসিবার যায়গা আছে। বাড়ীর উপরের অংশটিই সমধিক চিত্তরঞ্জক। উচ্চতাও বড় সামান্য নয়। সম্মুখে বিশাল অঙ্গন। একদিকে, একটী চমৎকার ও বৃহৎ মসজীদ। অপর দিকে একটী পাতালগৃহ। প্রখর সূর্য্যোত্তাপকালে নবাব এই স্নিগ্ধ স্থানে বসিয়া, বেগমদের সহিত হাস্যপরিহাসে সময় কাটাইতেন।

পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অনেক ফিট নীচে এই পাতালগৃহ—প্রাসাদ বলিলেই ঠিক হয়—অবস্থিত। চারিদিকে খিলান-করা স্তম্ভ—চকমিলানো ঘর। নামিবার জন্য সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী আছে। সর্ব্বনিম্নতলে একটী ইঁদারা, আগে সুগন্ধ সলিলপূর্ণ থাকিত। সেখানে দাঁড়াইয়া গ্রীষ্মকালেও আমাদের বেশ শীত করিতে লাগিল। নির্ম্মাণকৌশলে, পাতালগৃহও আলোকোজ্জ্বল।

হোসেনাবাদ ইমামবাড়ী। সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয়। যদিও ইহা তাজমহল অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মশিল্পে তাজের কাছে দাঁড়াইতেও

পারে না—তথাপি এই প্রাসাদের মূল পরিকল্পনা তাজ অপেক্ষা বড় বেশী হীন নয়। দূর হইতে ইহাকে দেখিতে ঠিক যেন একখানি ছবি। দেখিলে, চিরকাল ধরিয়া চাহিয়া থাকিতেই ইচ্ছা করে। ছোটখাটো খুঁটিনাটিগুলির উপরেও শিল্পী দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া যান নাই। সবই ভাল—কেবল ইহার উদ্যান এবং সম্মুখস্থ সরোবর দেখিলেই বোঝা যায়, তাহা তাজমহলের ব্যর্থ অনুকরণ। তাজের মত বিশাল সৌধের সম্মুখে যে আদর্শের উদ্যান ও সরোবর বেশ মানানসই—হোসেনাবাদের ইমামবাড়ীর মত ক্ষুদ্র সৌধে কখনই তাহা ঠিক খাপ খাইতে পারে না।

সেকেন্দ্রাবাগ। ওয়াজিদ আলি সা কর্ত্তৃক তাঁহার বেগমের জন্য সেকেন্দ্রামহল নির্ম্মিত। ইহার প্রসিদ্ধি সৌন্দর্য্যের জন্য নয়। এখানে লর্ড ক্লাইভ্ দুই সহস্র বিদ্রোহী সিপাহীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসার নিবৃত্তিসাধন করেন। হতভাগ্যদের মৃতদেহ এই উদ্যানতলেই সমাধিশয়নে আছে।

দিলখোসা। সাদত আলি খাঁর পল্লীভবন এবং শিকারের জন্য রক্ষিত জঙ্গল।

তস্‌বিরখানা। এখানে লক্ষ্ণৌয়ের সমস্ত নবাবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র আছে। প্রত্যেকের মুখের ভাব, শিল্পী এমন চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, তাঁহাদের সমগ্র চরিত্র যেন চিত্রাঙ্কিত আননে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। কাহারও রাজবেশ এবং কাহারও বা যোদ্ধার বেশ। ওয়াজিদ আলিসাকে দেখিলাম। দিব্য গৌরবর্ণ—স্থূলদেহ। মুখশ্রী ভাল—কিন্তু স্থূলতাজন্য যেন ঈষৎ সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, হাতে একটী ফুল। যেন মূর্ত্তিমান বিলাস।

যাদুঘর। বাড়ীটি দেখিবার মত। ভিতরেও দেখিবার জিনিষ অনেক। প্রাচীন চিত্র, লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্প প্রভৃতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রাচীন স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যেরও অনেক মূর্ত্তি এবং শিলালিপি প্রভৃতি আছে। ২২৩ খৃষ্টাব্দের সমুদ্র গুপ্তের অশ্বমেধের অশ্বমূর্ত্তি নেপালের তরাই হইতে আনীত হইয়া এখানে রক্ষিত হইয়াছে। বেনারসের রাজ-ঘাটের বৌদ্ধ চৈত্যের অনেক ধ্বংসাবশেষও দেখিলাম।

মার্টিন কুঠী। লক্ষ্ণৌয়ের কোন নবাব মার্টিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন

"তুমি এমন কিছু আমাকে দেখাইতে পারিবে, যার দাম এক কোটী টাকা হইবে?" সাহেব স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। কিছু দিন পরে এই বাড়ীটি তৈয়ারি করাইয়া নবাবকে দেখাইলেন। নবাব, সন্তুষ্ট হইলেন। সৌধ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বটে। মৃত্তিকার নিম্নতলে মার্টিন সাহেবের কবর। এখন এখানে সাহেবদের বিদ্যালয় বসিয়াছে।

রেসিডেন্সি। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সৌধ দেখিবার জন্য বাল্যকাল হইতে আমার একান্ত আগ্রহ ছিল। লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া যিনি রেসিডেন্সি দেখেন নাই, তাঁহার লক্ষ্ণৌয়ে আসাই মিথ্যা। আসফউদ্দৌলার দৌলতখানার একটী বাড়ীতে ইংরাজ রেসিডেণ্টের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আগে এখানে সৈন্য থাকিত না। কিন্তু কর্ণেল বেলির অবস্থানকালে, এখানে সৈন্য থাকিবার ব্যবস্থা হয় এবং রেসিডেন্সির তোরণ-সমীপে সাদত্ আলি একটী বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন। তার নাম হইল, "বেলি-গার্ড-গেট্।" এ নাম আজ সারাজগৎ জানে। (Siege of Lucknow.)

এই রেসিডেন্সিতে একদিন যে বীরত্বের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে ভাষা মূক হইয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। লক্ষ্ণৌ সহর সেই বিদ্রোহ-দাবাগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল।

চিন্‌হাটের যুদ্ধের পরে, পরাজিত ইংরাজ সেনা রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলিবামাত্র লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজগণ আত্মরক্ষার জন্য রেসিডেন্সির ভিতরে প্রবিষ্ট হন এবং তন্মধ্যে বালক ও রমণীর সংখ্যাও বড় অল্প ছিল। তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বিদ্রোহিগণের করতলগত হইল।

অতঃপর, অবরোধ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের সংখ্যা অগণ্য ছিল আর ইংরাজ সৈন্য মুষ্টিমেয়। বিশেষ সেই কয়েক শত সৈন্যের মধ্যে অনেকেই রণব্যবসায়ী নন। প্রাণের দায়, বড় দায়। সেই দায়ে তাঁহারা অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।

রেসিডেন্সি যে যুদ্ধের পক্ষে সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত স্থান—তা নয়। বিদ্রোহী-দের ভিতরে শৃঙ্খলা এবং বিজ্ঞ সেনাপতি থাকিলে রেসিডেন্সির চিহ্ন সেই

সময়েই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইত। একপক্ষ বিশৃঙ্খল এবং অপরপক্ষ সুশৃঙ্খল ও 'মরিয়া'! এমন অবস্থায় শেষোক্তের জয় অনিবার্য্য।

প্রায় তিন মাস ধরিয়া গজকচ্ছপের এই অসম যুদ্ধ চলে। আবদ্ধ ইংরাজগণের কষ্টের অবধি ছিল না। সার হেনরি লরেন্স সেনানায়ক—শত্রু-হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। আরও অনেক—কেহ বা হত এবং কেহবা আহত হইলেন। সঞ্চিত খাদ্য ক্রমে ফুরাইয়া আসিল; যা' ছিল—তাও অর্দ্ধাহারের পক্ষে প্রচুর নয়। সঙ্গে আবার ভয়কাতর রমণী, বালক ও শিশুর দল! তদুপরি আশ্রয়স্থান দুর্ভেদ্য এবং নিরাপদ নয়। অন্যদিকে, বিদ্রোহীরা নিয়মিত পানাহারে পরিতৃপ্ত এবং নিত্য নূতন সৈন্যদলে পুষ্ট হইতেছে। এমন অবস্থায় কিরূপে যে ইংরাজেরা শেষ বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং তাঁহাদের অসীম বীরত্বের শত প্রশংসা করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না।

অবরোধকালে, ইংরাজদের দৈনিক আহার ছিল, কিছু আটা, কিছু মাসকলাই এবং একদিন অন্তর ছোট একটুকরা অস্থিসর্ব্বস্ব মাংসমাত্র। অবশ্য, পরে ইহারও অভাব হইয়াছিল। এখানে আহার্য্য দ্রব্যের একটা মূল্যতালিকা দিতেছি :—

আটা———একসের———১৲ টাকা
ঘি———————"————১০৲ "
চিনি—————"————১৬৲ "
একটী শূকর———————৯০৲ "
তামাকের একখানি পাতা——২৲ "
এক ডজন ব্রাণ্ডী———১৫০৲ হইতে ১৮০৲ টাকা
" " বিয়ার———৭০৲ টাকা

এ সকল জিনিষ দুর্গের ভিতরেই পাওয়া যাইত। আটা, ঘি, চিনি প্রভৃতি এখনকার তুলনায় তখনকার বাজারে মাটীর দরে বিকাইত। সুতরাং এক টাকায় একসের আটা তখনকার পক্ষে খুবই চড়া দর ছিল, সন্দেহ নাই।

এখানে আমরা একজন অবরুদ্ধা মহিলার ডায়ারি হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

লক্ষ্ণৌ

৩০শে জুন, ১৮৫৭

মঙ্গলবার

"চিনহাটের যুদ্ধের পরে দেখা গেল, আমাদের তিন শত সৈন্যের ভিতরে দুই শত মারা গিয়াছে।

৯ টার সময়ে অবরোধ এবং বিপক্ষের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেলী-গার্ড-গেটের উপরে শত্রুসেনা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

প্রথম কামানের আওয়াজ শুনিবামাত্র স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ দুর্গমধ্যে মৃৎগর্ভস্থ একটী ঘরের ভিতরে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। এই অন্ধকার, অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেতে ঘরটীর নাম টাইখানা।

এই ঘরের ভিতরে আমরা সমস্ত দিন, একান্ত দীনভাবে এবং উৎকণ্ঠার সহিত বসিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে আমরা নিরাপদে আছি কিনা, তাহা দেখিবার এবং বাহিরে কথা বলিবার জন্য এক এক জন ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিতেছিলেন,—আমরা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছিলাম না—ভয়ে আমাদের বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল।

২রা জুলাই। বৃহস্পতিবার। সার হেনরী লরেন্স বিছানায় ছিলেন এবং কাপ্তেন উইলসন কতকগুলি কাগজ পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিলেন— অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের গোলায় তিনি আহত হইলেন। তাঁহার পদখানি উরুর তল হইতে প্রায় বিচ্ছিন্নবৎ হইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীর উপরে তুলিয়া আনা হইল। * * * যাতনায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল—তবু তিনি জ্ঞান হারান নাই। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সম্বন্ধে আপনার শেষ ইচ্ছাগুলি জানাইবার জন্য দিব্য শান্ত ভাবে তিনি প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া বাক্যালাপ করিলেন।

(৪ঠা জুলাই, শনিবারে এই বীরের মৃত্যু হয়)

২৬শে সেপ্টেম্বর। শনিবার। গত কল্য, আমাদের দীর্ঘ আশার দীপ— "সাহায্য" আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আনন্দ-ক্ষণের স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারিব না। এ আনন্দ অদমনীয়।

আমরা কল্পনাও করি নাই, যে, আমাদের বন্ধুগণ আমাদের এত কাছে।

* * সহসা অতি নিকটে আমরা আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, তার পরেই এক উচ্চ জয়নাদ, ক্ষণপরে ব্যাগপাইপের সুর এবং তৎপরে রাস্তার উপরে সৈনিকগণের দ্রুতধাবন। আমাদের মুক্তিদাতারা বারান্দা ভরিয়া ফেলিলেন এবং আমরা পরস্পর, পরস্পরের কর-নিপীড়ন করিতে করিতে ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলাম, "ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" * * *

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে কর্কশশ্মশ্রু বিরাটদেহ সৈন্যগণ আমাদের কোল হইতে শিশুগুলিকে কাড়িয়া লইয়া, সাশ্রুনেত্রে তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।"

(A Lady's Diary of the Seige of Lucknow.)

আমরা, কেবল অতীতের কাহিনী লইয়া গর্ব্ব করিতে জানি, আর অতীতের তর্পণ করিতে জানে, এই ইংরাজজাতি। ভারতের অতীত কীর্ত্তির অবশেষ রক্ষা করিতে কয় জন ভারতবর্ষীয় অগ্রসর হইয়াছে? ইংরাজের যত্ন ও পরিশ্রমে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি—ইংরাজেরই বিপুল অর্থে অদ্যাবধি তাহা সুরক্ষিত। জানি না, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য! কিন্তু, তবু গর্ব্ব!

অতএব, অতীতপ্রিয় ইংরাজজাতি যে রেসিডেন্সির ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন না, তাহা জানা কথা। বাস্তবিক, বিদ্রোহের অবসানকালে এই সৌধ যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই আছে। সেই অগ্নি-বর্ষণের ফলে, ছাদশূন্য গৃহ, চূড়াশূন্য স্তম্ভ, দ্বারশূন্য প্রবেশপথ। কোন স্থানের ইট খসিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ধ্বংসভগ্ন প্রাসাদস্তূপ পড়িয়া আছে; এমন কি ভিত্তিগাত্রে বিপক্ষনিক্ষিপ্ত অসংখ্য গোলাগুলির দাগগুলি পর্য্যন্ত এখনও ঠিক স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। দেখিলেই বোঝা যায়, এখানে একদিন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল; তাহার অভিনেতারা আজ কোথায়, কেহ তাহা জানিতে পারে না,—শুধু জানিতে পারে তাহাদের অতুল ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব সাহস, অদ্ভুত শক্তি এবং অসীম বীরত্বের জলন্ত কাহিনী! এবং তাহার সুপ্রকট প্রমাণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বুঝিতে পারে যে, কেন ইংরাজ স্বাধীন আর আমরা অধীন—ইংরাজ রাজা, আর আমরা প্রজা।

এক জন ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক—যথেষ্ট বৃদ্ধ—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া সমস্ত ঘরগুলি দেখাইলেন। তাঁহার মুখে আরও শুনিলাম যে,তিনি রেসিডেন্সির অবরোধকালে ইহারই ভিতরে থাকিয়া স্বহস্তে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে কোলরিজের Ancient Marinerএর "Long grey beard and glittering eye"এর কথা উদিত হইল।

রেসিডেন্সির ভিতরে যুদ্ধকালে উভয়পক্ষ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত পুরাতন গোলাগুলি এবং কামান প্রভৃতি এখনও রক্ষিত আছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অপূর্ব্ব শারদোৎসব।

(শরৎ-প্রভাতে দূর হইতে হিমালয়-দর্শনে)

দূরপরিসর অভ্রশিখর ধূম্রধূসর কায়,—
ও কি দেখা যায় আকাশের গায় উর্ম্মিরেখার প্রায়?
নাই আর নিশি, রক্তিম দিশি রবির প্রথম চুমে,
লাজারুণ হাসি-প্রবাহের রাশি ছড়ায়ে পড়িছে ভূমে।
চটুল সমীর কুসুম-রাজির সুবাস হরণ ক'রে
দিগ্‌বালা গায় হরষে মাখায় যেন কত লীলা ভরে।
সে পুলক-মাঝে অপরূপ সাজে উদিয়াছে ঊষারাণী,
হিঙ্গুলসার অঙ্গ তাঁহার, মঙ্গলময় পাণি।
পূর্ব্ব আশার খুলি হেমদ্বার উল্লাসে দেবী ধীরে
জ্যোতির্ম্মুকুট-ধৃত করপুট স্থাপিলা ও কা'র শিরে?
সে মুকুটে কত মণি-মরকত দিক্ উজলিয়া ভায়;
রাজরাজেশ্বর কে পুরুষবর, যার ধন দেখি তায়?
কত অতুলন রঙ্গীন বসন পরিয়া নীরদচয়,
নির্ব্বাক শত ভৃত্যের মত পার্শ্বে সমুখে রয়!
আজি এ প্রভাত-কিরণ-প্রপাত অভিষেক করে কার?

নন্দিতা বন-সুন্দরীগণ বন্দনা কার গায় ?
এ কি অভিনব শারদোৎসব গগনে ও ধরাতলে।
প্রকৃতি কাহারে নানা উপচারে পূজে মহা কুতুহলে ?
চিনেছি কে তুমি (তোমারে প্রণমি), ভীম সুন্দর সাজে
ওহে নগরাজ, দেখা'তেছ আজ বিশ্বের মহারাজে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী। *

প্রাচীন ভারতে যে সকল ঐশ্বর্য্যময় নগর বৈদেশিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সপ্তগ্রাম বা সাঁতগাও তন্মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন কালে বঙ্গের এই অংশকে রাঢ় বলিত। সাধারণঃ গঙ্গার মোহনা হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত স্থান রাঢ় দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বঙ্গে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। সপ্তগ্রাম সে সময়ে ধনরত্নপূর্ণ নগর ছিল। পর্ত্তুগীজেরা এই নগরকে পোর্টো পিকেনো (Porto Piqueno) বলিত ; ইহার অর্থ "ক্ষুদ্র স্বর্গ"। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের পাদ-মূল-বাহিনী স্বরস্বতী স্বল্পসলিলা, মন্দস্রোতা হইতে আরম্ভ হয় ; বলা বাহুল্য, তদবধি সপ্তগ্রামে গমনাগমন দুর্গম হইয়া উঠে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সিজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামে গমন করেন, তিনি সপ্তগ্রামসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—আমি উড়িষ্যা হইতে পিকেনো বন্দরাভিমুখে যাত্রা করি। এই পিকেনো (সপ্তগ্রাম) উড়িষ্যা হইতে ১৭০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই সপ্তগ্রাম বন্দরে আমি তণ্ডুল, বসন, লাক্ষা, শর্করা প্রভৃতি বোঝাই-করা ত্রিশ, পঁয়ত্রিশখানা জাহাজ দেখি। এই সহর পূর্ব্বে পাঠানদিগের দ্বারা শাসিত হইত, এখন ইহা মোগল শাসনাধীন। আমি এই সহরে চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলাম। †

---

* Bengal past and present নামক মাসিক পত্রিকায় Saptagram and Tribeni নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

† Cæsar Federick's travels Vol. III, P. 198—269.

রাল্‌ফ ফিচ্‌ও (Ralf Fitch) ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। তিনি সপ্তগ্রাম-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমি লবণ, আফিম, সীসা, বনাত বোঝাই একশত আশীখানা জাহাজ লইয়া যমুনা দিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হই।

রেভারেণ্ড জে, লং কলিকাতা রিভিউ (Ca'cutta Review) পত্রে "On the banks of the Bhigarathi" নামক প্রবন্ধের একস্থলে সপ্তগ্রাম-সম্বন্ধে Di Barrowএর একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। Di Barrow বলেন,—"সাঁতগাঁও একটী বিখ্যাত ও বৃহৎ সহর। অবশ্য পোতাদির গমনাগমনের তেমন সুবিধা নাই বলিয়া সহরটী চাঁটগায়ের (চট্টগ্রাম) মত জনপূর্ণ নহে।"

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সৈন্য হুগলিতে পর্ত্তুগীজ দুর্গ অবরোধ করে, তদবধি সাঁতগাঁওয়ের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। সাঁতগাঁও হইতে কার্য্যালয়াদি হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন সুবাদার রাজা মানসিংহ আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। বর্ষাকাল হেতু তিনি কিয়দ্দিন জাহানাবাদে (আরামবাগে) অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আফ্‌গানেরা উড়িষ্যা হইতে আসিয়া সাতগাঁও লুণ্ঠন করেন। সম্রাট্‌ আকবরের সময়ে সাঁতগাওকে "বালঘকথানা" বলা হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুঁচুড়ায় যে সকল ওলন্দাজ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা সপ্তগ্রামে পল্লীভবন নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা তখন তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে হাঁটিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া পল্লী-বাস-সুখ সম্ভোগ করিতেন।

কালের কুটিল চক্রাবর্ত্তনের ফলে এখন সপ্তগ্রামের পূর্ব্বগৌরব খর্ব্ব হইয়াছে। সপ্তগ্রাম, সরস্বতীর দক্ষিণ পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। এখনও সেই সরস্বতীর অস্তিত্ব আছে সত্য, কিন্তু আর তাহার সেই বিস্তীর্ণ জলরাশি, গম্ভীর জলোচ্ছ্বাস নাই !

সপ্তগ্রামের বক্ষ ভেদ করিয়া এখন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অগ্রসর হইয়াছে। এই রাস্তার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে একটী উচ্চ জমি আছে। এই জমি চূর্ণ ইষ্টকখণ্ডে পরিপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাকে "কেল্লা" বলিয়া মনে করে। ইহার

আরোও কিছু পূর্ব্বাংশে কয়েকটি সরোবর আছে, তন্মধ্যে একটির নাম "জাহাঙ্গীর" সরোবর। রাস্তার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সরস্বতী-বক্ষঃস্থ সেতুর নিকটে একটী মস্‌জিদ আছে। অধ্যাপক ব্লকম্যান এই মস্‌জিদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"এই মস্‌জিদ ও ইহার সন্নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটী সমাধি-মন্দির নিম্ন বঙ্গের কেবল মাত্র ধ্বংশাবশেষ। এই মস্‌জিদ্ সৈয়দ মামালুদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি সৈয়দ ফকরুদ্দীনের পুত্র। মস্‌জিদের খোদিত লিপি-পাঠে জানা যায়, তিনি পারশ্য দেশের তামুল সহর হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন।"

ত্রিবেণী।

ত্রিবেণী হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র—বিশুদ্ধ তীর্থ। এই সহর সরস্বতীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে সরস্বতীর সহিত হুগলী বা ভাগীরথীর পুণ্য সম্মিলন হইয়াছে। তিনটী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিতা বলিয়া এই সহরের নাম ত্রিবেণী। তন্মধ্যে তুইটী নদী দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণতঃ যমুনাকে লোকে তৃতীয় নদী বলিয়া অনুমান করেন। ইউরোপীয়েরা কিন্তু কাঁচড়াপাড়ার খালকে তৃতীয় নদী বলেন।

ত্রিবেণীতে মকর সংক্রান্তি, ও মাঘ মাসের প্রথম দিবসে মহা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়! এই সকল উৎসবের সময় অসংখ্য যাত্রীর কোলাহলে ত্রিবেণী মুখরিতা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর মন্দিরে হিন্দু তীর্থ-যাত্রী দ্বিধাশূন্য হইয়া ভক্তি-উদ্বেলিত-চিত্তে গমন করে।

জাফর খাঁর মস্‌জিদ্-সম্বন্ধে কথিত আছে যে, জাফর খাঁ পাণ্ডুয়া জয় করেন। রাজা বুদিয়ার সহিত যুদ্ধে জাফর খাঁ নিহত হন। জাফর খাঁয়ের তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী হুগলীর হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কারণে বোধ হয়, হিন্দুরা ত্রিবেণীর অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের ন্যায় সমান শ্রদ্ধাসহকারে জাফর খাঁর সমাধি-মন্দির দর্শন করেন। জাফর খাঁ মুসলমান হইলেও গঙ্গার উপাসনা করিতেন।

বিষুব সংক্রান্তি, বারুণী, দশহরা, কার্ত্তিক পূজা ও সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণের সময় লক্ষ লক্ষ লোক ত্রিবেণীতে স্নান করেন।

ত্রিবেণী ঘাট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। কথিত আছে, মুকুন্দ দেব ইহা নির্ম্মাণ করেন। তিনি উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তাঁহার রাজ্যের শেষ সীমা সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত।

সৎকার করাইবার জন্য বহুদূর হইতে মৃতদেহ ত্রিবেণীতে আনীত হইয়া থাকে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, ত্রিবেণীতে সৎকারের জন্য কোন বাঁধান ঘাট বা নিমতলার ন্যায় কোন শ্মশান নাই। দেশের পুণ্যাত্মা ধনি-বৃন্দ এ বিষয়ে উদাসীন কেন?

ত্রিবেণী এক সময়ে বঙ্গের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। গুপ্তিপাড়া, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর এবং ত্রিবেণী এই চারিটী স্থান এক সময়ে বঙ্গের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান ছিল।

মিঃ জে, লং কলিকাতা রিভিউ পত্রে লিখিয়াছেন,—"ত্রিবেণী পূর্ব্বে বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। প্লিনি (Pliny) বলেন যে, জাহাজ সকল ত্রিবেণী হইয়া পরে পাটনায় যাইত। ত্রিবেণী সহরে ত্রিশের অধিক সংস্কৃত টোল ছিল। স্যর উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক,—সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীবাসী ছিলেন। তর্ক পঞ্চানন মহাশয় লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে হিন্দু আইন (Hindu laws) প্রণয়নের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

রঙ্গালয়-প্রসঙ্গ। *

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নাট্যশালা-স্থাপনার পূর্ব্বে সাধারণের মনে অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাল ধারণা ছিল না। এমন কি, সময়ে সময়ে অভিনেতাগণকে লাঞ্ছিত ও একঘরে হইতে হইত। এই সময়ে শ্রীযুত অমৃতলাল ও তাঁহার

* বিগত ২০শে মে তারিখের "ষ্টেটসম্যান" সংবাদপত্রে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের স্থাপনা, উন্নতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের যে মতামত সংগৃহীত হইয়াছিল, তদবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত।

কতিপয় সহচর সর্ব্বপ্রথম সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থে অভিনয় প্রদর্শন করিতেন। কলিকাতায় গড়ের মাঠে তখন লিউইস্ নামক জনৈক সাহেব অভিনয় প্রদর্শন করিতেন। অমৃতলাল ও তাঁহার সহচরগণ সেই অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং কতদিনে আমাদিগের দেশে আমাদিগের রঙ্গালয়ে ঐরূপ অভিনয় প্রদর্শিত হইবে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত থাকিতেন।

প্রথম রঙ্গালয়। উপায়ের চিন্তা করিতে করিতে উপায় আপনিই উদ্ভূত হইল। তাঁহারা বন্ধুবর্গের নিকট চাঁদা তুলিয়া ও সাধারণের নিকট টিকিট বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে প্রথম প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যখন অধিক পরিমাণে টাকা সঞ্চিত হইল, তখন তাঁহারা চিৎপুর রোডের উপর বাড়ী ও তৎসংলগ্ন খানিকটা খালি জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু তখনও ঐ বাড়ীতে রঙ্গালয়ে পরিণত করিবার ও রঙ্গালয়ের উপযোগী। অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিবার অন্নের সংস্থান ছিল না। তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না। শ্রীযুত অমৃতলাল ও তাঁহার সহচরগণ স্বহস্তে দৃশ্যপট অঙ্কন হইতে ছুতারের কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তই করিতেন। ক্রমশঃ ঐ স্থানে রঙ্গ-ভবন (Stage) নির্ম্মিত হইল এবং তাহার উপরে শামিয়ানা টাঙ্গান হইল। ইহাই বঙ্গের প্রথম রঙ্গালয় এবং ইহা ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম স্থাপিত হয়। সাধারণ লোকে তখন রঙ্গালয়ের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তবুও ঐ রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিবার জন্য প্রতি অভিনয়-রজনীতে দলে দলে লোক ছুটিত। এই রঙ্গালয়ে শ্রোতৃগণের বসিবার আসন এত কম ছিল যে, কোন অভিনয় রজনীতেই ৫০০৲ টাকার অধিক আয় হইত না। প্রতি শনি-বারে অভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী এবং স্যার উইলিয়ম হণ্টার প্রমুখ ইংরাজগণ এই সকল অভিনয় দেখিতে আসিতেন এবং অভিনেতাগণকে নানারূপ আশ্বাস-বাক্যে উৎসাহিত করিতেন।

রঙ্গালয়ের বিস্তৃতি। বর্ষাকালে অভিনয় বন্ধ হওয়ায় অভিনেতৃগণ ঢাকা নগরে আপনাদিগের অভিনয় প্রদর্শন করিতে যান। ঢাকা নগরে অভিনেতাগণ বিশেষ কৃতকার্য্য হন এবং তাহাতে তাঁহাদিগের উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তৎপর বৎসরে—কলিকাতায় "বেঙ্গল থিয়েটর"ও "গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটর"

নামে দুইটী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। প্রথমটীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র ঘোষ ও দ্বিতীয়টীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত অমৃতলাল বসু ও তাঁহার সহচরগণ। বর্ত্তমানে যেখানে "মিনার্ভা থিয়েটার" বিদ্যমান, ঐখানে শ্রীযুত অমৃতলালের "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার" প্রথম খোলা হয়। এই রঙ্গালয়ে ১০০ লোকের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ রঙ্গমঞ্চে ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত ছিল না, কারণ তাঁহারা কেহই অভিনয় দেখিতে যাইতেন না এবং ৷৹ আনার অধিক মূল্যের আসন অতি অল্পই ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত অমৃতলাল বলেন, "তৎকালে এমন কি রায় বাহাদুর এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণও ৷৹ আনা মূল্যের আসন অধিকার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের দেশের লোক আমোদ-প্রমোদের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে শিখিতেছে।

প্রথম অভিনেত্রী-নিয়োগ।—যে সময় ১৮৭৩ সালে "বেঙ্গল থিয়েটর" প্রথম স্থাপিত হয়, সেই সময়েই রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী-নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রঙ্গালয়ে প্রকাশ্যভাবে যখন অভিনেত্রীগণ প্রথম অভিনয় করেন, তখন দেশব্যাপী আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের জন্য শ্রীযুত অমৃতলাল ও তাঁহার সহচরগণ "গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরে" ঐ সময়ে পুরুষগণের দ্বারাই রমণীগণের অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে থাকেন ' কিন্তু যখন জনসাধারণের মনে অভিনেত্রীগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূর হইল এবং তাঁহারা অভিনেত্রীগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেন, তখন আর অভিনেত্রী-নিয়োগে "গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরে"র কোন আপত্তি রহিল না। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে প্রথমে এই রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীগণের দ্বারা অভিনয়কার্য্য চালিত হয়। অভিনেত্রী-নিয়োগের পূর্ব্বে রঙ্গালয়ে কেবলমাত্র নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইত। কিন্তু অভিনেত্রী-নিয়োগের পর হইতে গীতিনাট্যও অভিনীত হইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীযুত অমৃতলাল স্বয়ং নাটক লিখিয়া তাহার অভিনয় করিতেন।

<u>৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ</u>। এই ১৮৭৪ খৃঃ অব্দেই সুকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আপিসের কেরাণীগিরি ছাড়িয়া অভিনয়-বিদ্যাকেই নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজে নাটক লিখিয়া তাহা রঙ্গালয়ে অভিনীত করাইতেন এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রঙ্গালয়সমূহের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়।

ষ্টার থিয়েটর। ক্রমশঃ রঙ্গালয়সমূহ সাধারণের মনোরঞ্জক হইয়া উঠিল এবং সাধারণের নিকট সম্মান পাইতে লাগিল। বর্ত্তমানে যেখানে "কোহিনূর থিয়েটর" বিদ্যমান আছে, ঐখানে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে গুরুমুক রায় নামক জনৈক মাড়োয়ারী যুবক "ষ্টার থিয়েটার" নামক রঙ্গালয় স্থাপিত করেন। কিন্তু রঙ্গ-ভবন-নির্ম্মাণের পরেই তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার এইরূপে অর্থব্যয়ে আপত্তি করায় তিনি ঐ রঙ্গ-ভবন বিক্রয় করেন এবং শ্রীযুত অমৃতলাল ও তাঁহার অপর তিন অংশীদার উহা ক্রয় করিয়া লয়েন। 'ষ্টার থিয়েটারে'র বর্ত্তমান রঙ্গ-ভবন ১৮৮৮খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয় এবং উত্তর কলিকাতার মধ্যে "ষ্টার থিয়েটারে"র রঙ্গ-ভবনই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী আদর্শে গঠিত হয়। অন্যান্য পুরাতন সাবেক ধরণের রঙ্গালয়গুলিও নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থলে আধুনিক প্রণালীর রঙ্গালয় নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতা নগরে চারিটী রঙ্গালয় আছে এবং প্রত্যেকটীতে ১০০০ হইতে ২০০০ লোক বসিবার বন্দোবস্ত আছে।

বর্ত্তমান অবস্থা। যখন চারিটী রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়া অভিনয় প্রদর্শিত হইতে লাগিল, তখন নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, এবং দর্শক সকলেরই অভাব হইয়া উঠিল এবং সেই কারণে প্রতিযোগিতা বাড়িয়া গেল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে সমস্ত-রাত্রিব্যাপী অভিনয় প্রদর্শনের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং দর্শকবৃন্দ যে উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারেন না, ঐ প্রতিযোগিতাই বোধ হয় তাহার কারণ। রাত্রি ৮॥০টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত অভিনয়ের কথা শুনিলে যে কোন ইউরোপীয় চমকিত হইবেন, কিন্তু বাঙ্গালীর তাহাই রীতি হইয়াছে। তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে যে অভিনয় শেষ হইয়া যায়, তাহাতে বাঙ্গালীর মন উঠে না। যখন দর্শকগণ অভিনয় দর্শন করিতে যান তখন তাঁহারা সমস্ত রাত্রিই অভিনয় দর্শন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই যেন যান। যদি কোন রঙ্গালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ পূর্ব্বের নিয়মমত রাত্রি ১টার সময় অভিনয় বন্ধ করেন, তাহা হইলে অচিরে তাঁহার সমুদয় দর্শক অন্য রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিতে চলিয়া যাইবেন এবং উক্ত রঙ্গালয়ের অভিনেতাগণকে শূন্য আসনের সম্মুখে অভিনয় করিতে হইবে। শ্রীযুত অমৃতলাল বলেন, "পূর্ব্বে এমন এক সময় গিয়াছে যখন লোকে একটী মাত্র নাটকের অভিনয় দেখিয়াই

সন্তুষ্ট হইত ; কিন্তু আজকাল তাহারা এক রাত্রিতে দুইখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক ও একটী গীতিনাট্য চায় এবং পূর্ব্বে লোকে একটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কিম্বা ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইত, কিন্তু আজকাল তাহারা কেবলমাত্র আবেগপূর্ণ নাটক চাহে। একদল দর্শক বলে, 'আমরা ॥• আনা পয়সা দিয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আবেগপূর্ণ অভিনয় প্রদর্শন কর' এবং এরূপ দর্শকের সংখ্যাই অধিক ; কাজেই আমাদিগকে তাহাদিগের মন জোগাইয়া চলিতে হয়। রঙ্গালয় যাহাতে রাত্রি ১টার সময় বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা যখন হয়, আমি তখন উহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলাম এবং যখন আমি ষ্টার থিয়েটরে ছিলাম, তখনও আমরা বহুকাল ধরিয়া ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী রাত্রি ১টার সময়ে অভিনয় বন্ধ করিতাম। কিন্তু দেশকালপাত্র-বিবেচনায় আমরাও আর ঐ নিয়ম পালন করিতে পারি নাই। তবে কোন কোন রঙ্গালয় যেমন সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই অভিনয় প্রদর্শন করে, আমরা সেরূপ করিতে পারিতাম না। রঙ্গালয়-সম্বন্ধে বিধি এই যে; রাত্রি ১টা হইতে ২টার মধ্যে অভিনয় কার্য্য বন্ধ হইলে ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা জরিমানা হইবে এবং ২টার পরে বন্ধ হইলে ২০৲ টাকা জরিমানা হইবে। আমরাও জরিমানা হিসাবে যে টাকা খরচ হইত তাহা নিত্য নৈমিত্তিক খরচের সামিল বলিয়া ধরিয়া রাখিতাম।

এইরূপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিনয় প্রচলনের কারণ এই যে, দেশের লোক তাহাদের টাকার পরিবর্ত্তে অনেক অধিক জিনিষ চাহে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রতিযোগিতার ফলে যখন একবার তাহারা সমস্ত রাত্রি অভিনয় দর্শনের স্বাদ পাইল, তখন আর ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপী অভিনয়ে তাহাদের মন উঠিল না। তাহারা রঙ্গালয়ে আসিবে, অভিনয়-কালে ঢুলিবে, বিরক্তি বোধ করিবে, কতক্ষণে অভিনয় শেষ হইয়া যাইবে তাহার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, কিন্তু তবুও অভিনয় শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। আর এক দল লোক আছেন, যাঁহাদের জন্য আমাদিগকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিনয় করিতে হয়। ইঁহারা শ্রীরামপুর, বারাকপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অভিনয় দর্শন করিতে আসেন। রাত্রি ১টা বা ২টার সময় অভিনয় বন্ধ হইলে তাঁহাদিগকে সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগ করিতে হইবে,

কিন্তু তাঁহাদিগের জন্যও বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। পূর্ব্বে অভিনয় রাত্রি ১টার সময় বন্ধ হইলে আমরা রঙ্গালয়েই তাঁহাদিগের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিতাম এবং এখনও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি। সেকালে রাত্রি ২॥০ টার সময় অভিনয় বন্ধের কথা শুনিলে আমরা চমকিয়া উঠিতাম, কিন্তু এক্ষণে সকাল ৬॥০টার সময় অভিনয় বন্ধ হওয়ার কথা শুনিলেও আর আশ্চর্য্যান্বিত হইল না।"

অভিনেতা-অভিনেত্রীর বেতন। ইহাদের বেতন সম্প্রতি বেশ বাড়িয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সাধারণ অভিনেতা বা অভিনেত্রী মাসিক ২৫৲ টাকা বেতন পাইত। কিন্তু এখন তাহাদিগের বেতন ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। উচ্চ দরের অভিনেত্রীগণ প্রতি মাসে ২৫০৲. ২০০৲, ১৫০৲ টাকা বেতন পান।

রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বলেন, "দিন দিন দেশের রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তাহারা কি যে চায় তাহা সকল সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু আমার বোধ হয় এই পরিবর্ত্তনের গতি উন্নতির দিকে এবং বর্ত্তমানে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নাটকের প্রয়োজন হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাগলামীপূর্ণ নাটকও ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সামাজিক বিষয় লইয়া উৎকৃষ্ট নাটক ও নক্সা লিখিলে তাহা প্রভূত পরিমাণে মঙ্গলময় হইবে।

"অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাট্যকলা-কৌশল উন্নতি লাভ করিতেছে। বিশেষতঃ অভিনেত্রীগণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শিক্ষালাভ করিতেছেন। রঙ্গালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতেছেন এবং কালক্রমে আরও শিক্ষিত লোক প্রবেশ করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। যদিও এখন সাধারণের মনে রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়া করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ-সম্বন্ধে বিভীষিকা আছে, তথাপি ঐরূপ ধারণা সকল ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

"দেশের লোকের মধ্যে অভিনয়-দর্শনের স্পৃহা বাড়িতেছে এবং উত্তরোত্তর তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অন্তঃপুরবাসিনীগণের অভিনয়-দর্শনের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা দলে দলে অভিনয় দেখিতে যান। ইহা হইতে দেশের কিরূপ উন্নতি হইতেছে এবং রঙ্গালয়গুলি কিরূপভাবে পরিচালিত হয়, তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়।"

শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল।

পুরাতনী।

——:•:——

[ষষ্ঠীচরণের পত্র হইতে]

তোমার চিঠি পড়িয়া বড় খুসী হইলাম। * * আমাদের এককালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এককালে বড় বড় বীর সকল জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে ইহার কোন ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া ধূলা ঝাড়িয়া সভাস্থলে পুঁতুলনাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন, সে বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা ত স্মৃতি নহে, প্রাণ মনে করিয়া রাখাই স্মৃতি। কিন্তু প্রাণ মনে রাখিতে হইলেই তাহার উপযোগী বাতাস চাই, তাহার উপযোগী খাদ্য চাই। • * * মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীষ্ম দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা ত সকল মানুষ! অনেকটা মানুষের মত! ঠিক মানুষের মত খাওয়া দাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই—দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই! কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, সে জাতির মহত্ত্বকে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরী মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না, সেখানে সঙ্কল্প কার্য্য হইয়া উঠে, কার্য্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়। সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। সে জাতির সৌন্দর্য্য ফুলের মত ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মত পক্কতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস, আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে—আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জ্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উদয় হইবে কি করিয়া? বিদ্যুৎ-প্রয়োগে মৃতদেহ জীবিতের মত কেবল অঙ্গভঙ্গ করে মাত্র। আমাদের দেশে সেই বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। • • • • অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজীর উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজি ফেষানে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি; কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য, অভিমান, অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাস। দৃঢ়তা নাই, উদ্যম নাই, কারণ সকলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই।

১২৮৭ সাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—:•:—

পুস্তক-পরিচয়।

—:•—

আদ্যের গম্ভীরা।—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

বাঙ্গালা দেশে ইদানীং ইতিহাস-চর্চ্চার যে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, একথা আর অস্বীকার করা চলে না। কেবল এক একটা জেলা বা প্রদেশের ইতিহাস নহে—বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাস-রচনারও সূত্রপাত হইয়াছে। "আদ্যের গম্ভীরা"ও এই শ্রেণীর ইতিহাস। গ্রন্থকার শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালায় ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাস রচনার এক নূতন পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। সুতরাং তিনি সাহিত্যসেবীমাত্রেরই প্রশংসার অধিকারী। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত রচনা করিয়া স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের যে কৃতিত্ব, "আদ্যের গম্ভীরা"-রচনায় পালিত মহাশয়ের কৃতিত্ব তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে।

মালদহের গম্ভীরা উৎসব দেশপ্রসিদ্ধ। গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—"গম্ভীরার ভাবলহরীই আমাকে মালদহের প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। গম্ভীরার ইতিহাস খুঁজিতে গিয়াই গৌড় ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন দৃশ্যগুলি একে একে আমার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। গম্ভীরা আমার নিকট যতই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আমি ততই গৌড় পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন কাহিনীর গান শুনিতে পাইয়াছি। সেই গীতের স্বরলিপির অনুসন্ধানে বহু প্রাচীন পুঁথিও আমার হস্তগত হইয়াছে।" শুধু তাহাই নহে, গ্রন্থকার "প্রায় কুড়ি বৎসর কাল মালদহের নদী-জঙ্গল, দীঘি-দুর্গ ভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লীসমাজের কাহিনী" শুনিয়াছেন এবং তাহাদিগের "বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ" করিয়াছেন। সুতরাং "আদ্যের গম্ভীরা"-রচনায় গ্রন্থকারকে অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। "আদ্যের গম্ভীরা" ফাঁকা ইতিহাস নহে; সরকারী গেজেটিয়ারের অনুবাদ নহে। ইহা গ্রন্থকারের দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রাচীন পুঁথি, প্রবাদ ও জনশ্রুতির সংগ্রহ ও অনুশীলনের ফল।

প্রসিদ্ধ তিব্বত পর্য্যাটক রায় বাহাদুর শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দাস, সি-আই-ই মহাশয় এই গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকার একাংশে তিনি "আদ্যের গম্ভীরা" সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি লিখিয়াছেন,—"গম্ভীরার ইতিহাসালোচনায় গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় হিন্দুসমাজ যুগে যুগে তাহার স্বকীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কখনও হিন্দুর জাতীয় জীবন সমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া পারম্পর্য্য ও প্রকৃত অস্তিত্ব হারায় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভৌগোলিক অবস্থানুসারে এবং ব্যক্তিবর্গের ধারণাশক্তি অনুসারে বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একই যুগে যাহা বৌদ্ধ. অন্য যুগে তাহা শৈব, আর এক অবস্থায় তাহা বৈষ্ণব,—ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃতি। কত নিম্নশ্রেণী, নূতন নূতন জাতি এই উপায়ে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া শিক্ষিত, সভ্য ও ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।" * * * "বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার পল্লীজীবন যতই ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পদ্ধতিতে আলোচিত হইতে থাকিবে, ততই আমাদের জাতীয় গৌরবের একটা নূতন দিক অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত হইবে।"

উপরে রায় বাহাদুর শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র যে 'ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পদ্ধতি'র সাহায্যে ইতিবৃত্ত-সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থে সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথির ও প্রাচীন কবিদিগের রচনা হইতে গ্রন্থকার অভিনব উপায়ে তথ্যাবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালার সেকালের সমাজ ও ধর্ম্মের অনেক কথা, তিব্বত ও সিংহল প্রভৃতি দুরদেশে বাঙ্গালীর প্রভাবের কথা "আদ্যের গম্ভীরা"য় যে অনুশীলিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের হৃদয় অতীত গৌরবে প্রকৃতই স্ফীত হইতে উঠে। এই অতীতের গৌরবই আমাদের আশা-ভরসা। এই আশা-ভরসায় বুক বাঁধিয়াই ত আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। হরিদাসবাবু নব "জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা'য় আমাদের বদ্ধ দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন; তিনি দেশবাসীর অজস্র ধন্যবাদ ভাজন। যাঁহাদের চক্ষু আছে যাঁহারা চক্ষুষ্মান, তাঁহারা এক এক খণ্ড "আদ্যের গম্ভীরা" ক্রয় করিয়া মাতৃভাষায় এই নীরব সেবকের সম্বর্দ্ধনা করুন।

রঙ্গচিত্র।



কী আপদ! 'ওল্ড ফুল্' 'কি' গিয়েও যায় না!



করচরণনখরাঘাতেন রাম"শ্লীলীকরণে"
ভুশুণ্ডি পরমানন্দম্।

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস।

গ্রন্থপরিচয়।

আজিকার ঐতিহাসিক আলোচনার দিনে ভারতবর্ষ যে কয়টি মৌলিক গবেষণাকারী প্রত্নতাত্ত্বিকের গর্ব্ব করিতে পারে, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার-কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন; তাঁহার চেষ্টাও বহুলাংশে সফল হইয়াছে। তিনি অন্ধ্রভৃত্যদিগের যে বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে ভারত-ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও যাদবদিগের বৃত্তান্তও তিনি অল্প মনোহারিত্বের সহিত বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার 'আর্লি হিষ্ট্রী অব্ দি দেক্কান ডাউন টু দি মহমেডান কংকোয়েষ্ট' নামক ইতিহাস একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। গ্রন্থখানি বম্বে গেজেটের জন্য লিখিত হইয়াছিল, পরে পৃথক্ ভাবে মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থখানি দেক্কানের ইতিহাস হইলেও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস নহে। অধ্যাপকবর দেক্কান শব্দ অতি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র বলিতে যে প্রদেশখণ্ড বুঝায়, গ্রন্থ-ধৃত দেক্কান শব্দ কেবল সেই স্থানটুকুই নির্দ্দেশ করে। সুতরাং দেক্কানের প্রাচীন ইতিহাসকে অনায়াসেই মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস বলা চলে। আর বিশেষতঃ দেক্কান অপেক্ষা মহারাষ্ট্র শব্দের সহিত আমরা অধিক পরিচিত বলিয়া গ্রন্থখানিকে শেষোক্ত নামেই অভিহিত করিয়াছি।

গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় নহে। উহাতে ষোলটি পরিচ্ছেদ ও চারিটি পরিশিষ্ট আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার দেক্কান শব্দের উৎপত্তি ও তাহা

কোন্ স্থানের নির্দ্দেশক, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—দেকান ও দক্ষিণাপথ একার্থবোধক শব্দ। পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের অন্তবর্ত্তী সংকীর্ণ প্রদেশাংশ ব্যতিরিক্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ (বা তদ্ভাষা প্রচলিত দেশখণ্ড) ও দক্ষিণাপথ একই স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেকান বা মহারাষ্ট্রে প্রথম আর্য্য উপনিবেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন দণ্ডকারণ্যই আধুনিক মহারাষ্ট্র। আর্য্যেরা উত্তর ভারতের ন্যায় মহারাষ্ট্রেও আপনাদের সভ্যতা ও ভাষার সম্যক্ প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের পূর্ব্ব বা দক্ষিণস্থিত দেশগুলিতে তাঁহারা সেরূপভাবে জয়ী হইতে পারেন নাই। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই সুগঠিত লোকসমাজ ও রাজ্য-সমূহ বিদ্যমান ছিল। তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আর্য্যদিগকে তাহাদের ভাষা শিখিতে ও সভ্যতার কতকাংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কি উত্তর ভারতে, কি দণ্ডকারণ্যে তাঁহাদিগকে সেরূপ সুগঠিত রাজ্যের বা লোকসংহতির সংস্পর্শে আসিতে হয় নাই। সে সব স্থল তখন রাক্ষস বা বন্যজাতিদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

আর্য্যেরা প্রথম কোন্ সময়ে মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহার বিচার হইয়াছে। বিচারে এই মীমাংসিত হইয়াছে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যেরা দক্ষিণ ভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন না। ঐ শতাব্দীতে তাঁহারা প্রথমে বিদর্ভ বা বেরারে এবং আরও কিছু পরে গোদাবরীতটস্থিত দণ্ডকারণ্য বা মহারাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫০ অব্দের পূর্ব্বেই তাঁহারা তঞ্জোর ও মদুরা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশখণ্ডের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট-জন্মের আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র রট্টজাতিদিগের অধীনে সুগঠিত রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই রট্টজাতির নাম হইতেই দেশের নাম মহারাষ্ট্র হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম কয় শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস কিরূপ ছিল, তাহা ঠিক্ জানা যায় না। আর্য্যেরা মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহা অশোকের লিপি হইতে জানা যায়। তখন উহা রট্টদিগের অধীনে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা

ভোগ করিতেছিল। সহ্যাদ্রির শিরোদেশস্থিত গুহামন্দিরগুলির উৎকীর্ণ লিপি হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ও খৃষ্টোত্তর প্রথম কয় শতাব্দীর কতক ইতিহাস পাওয়া যায়। লিপিগুলিতে আমরা যে যে রাজার নাম পাই, তাহা এই—

(১) শিমুক শাতবাহন
(২) কৃষ্ণরাজ
(৩) শাতকর্ণি
(৪) ক্ষহরাট নহপান ও তাঁহার জামাতা উষবদাত
(৫) গোতমীপুত্র শাতকর্ণি
(৬) বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি
(৭) গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি
(৮) মঢরীপুত্র শাকসেন।

লিপি-পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, গোতমীপুত্র শাতকর্ণি ক্ষত্রিয়দের গর্ব্ব খর্ব্ব, শক, যবন ও পল্হব-শক্তি নষ্ট এবং খগারাট বংশের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া শাতবাহন বংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন

এই সব রাজা কোন্ বংশীয় ছিলেন, পঞ্চম পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে। ক্ষহরাট নহপান যে দেশীয় নাম নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গোতমীপুত্র শাতকর্ণি যে শক, যবন ও পল্হব শক্তি নষ্ট করিয়াছিলেন. তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সে সময়ে মহারাষ্ট্র ঐ সকল বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়াছিল। যবনেরাই বক্ট্রীয় গ্রীক। ক্ষহরাট নহপান গ্রীক নামের মত শুনায় না। উহা নিশ্চয়ই হয় শক, নয় পল্হব নাম। গোতমীপুত্র যে খগারাট বা খখারাট বংশের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বংশই ক্ষহরাট বা খহরাট বংশ। ইহাতে বুঝা যায় যে. পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয় রাজ শাতকর্ণির পরে ও গোতমীপুত্র শাতকর্ণির পূর্ব্বে শক বা পল্হব জাতি মহারাষ্ট্রে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। গোতমীপুত্র তাহাদের ধ্বংস সাধন করিয়া শাতবাহন বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। পূর্ব্বোক্ত অপর সকল রাজা এই শাতবাহন-বংশীয় ছিলেন।

পুরাণগুলিতে দেখা যায় যে, সিপরক সিন্ধুক বা শিশুক নামধারী কোন ব্যক্তি কাণ বংশ ধ্বংশ করিয়া অন্ধ্রভৃত্য বংশ স্থাপন করেন। গ্রন্থকার বিচার

করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সিপরক প্রভৃতি নাম সিমুক নামেরই অপভ্রংশ এবং শাতবাহন বংশই পুরাণের অন্ধ্রভৃত্য বংশ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব-কাল-নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার মতে শিমুক খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৭৩ হইতে ৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তৎপরে কৃষ্ণ ৫০ হইতে ৪০ অব্দ এবং শাতকর্ণি ৪০ হইতে খৃষ্টোত্তর ১৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। এই সকল রাজা মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গণ আপনাদের অধিকারে আনিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশ শেষে তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয় ও ক্ষহরাট নহপানের অধিকারভুক্ত হয়। নহপান সত্রপ হইলেও উজ্জয়িনী ও কাঠিআবাড়ের সত্রপ বংশ হইতে ভিন্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত স্থানদ্বয়ের সত্রপের ন্যায় কোন প্রতাপশালী মহারাষ্ট্র-বিজয়ী শক রাজার সত্রপ বা অধীন-রাজ ছিলেন। মহারাষ্ট্র কতদিন তাঁহার বা তাঁহার বংশের অধীন ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে অনুমান হয় তিপান্ন বৎসরের অধিক হইবে না। যাহা হউক, গোতমীপুত্র শাতকর্ণি ও তৎপুত্র পুলুমায়ি খৃষ্টোত্তর প্রায় ১৩০ অব্দে ক্ষহরাট বংশ ধ্বংশ করিয়া মহারাষ্ট্র পুনরধিকার করেন। শাতকর্ণি পুত্রকে মহারাষ্ট্রের রাজতক্তে বসাইয়া নিজে ১৩৩ অব্দে তৈলঙ্গণের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্ধ্র-ভৃত্যদিগের উত্থানে হিংসাপর হইয়া উজ্জয়িনীর সত্রপ চষ্টন মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাভূত হইয়া পলাইয়া যান। শাতকর্ণি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ক্রমে অবন্তী, অনুপ ও সুরাষ্ট্র জয় করেন ও চষ্টন-পুত্র জয়দামনকে রাজ্যচ্যুত করেন। কিছুকাল চষ্টনের সমগ্ররাজ্য অন্ধ্রভৃত্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু জয়দামন-পুত্র রুদ্রদামন একদল অনুচর সংগ্রহ করিয়া শাতকর্ণিকে তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন ও নিজে মহাক্ষত্রপ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি ক্রমে শাতকর্ণির রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধ্রভৃত্য রাজের উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হন নাই। শাতকর্ণি ১৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তৎপরে পুলুমায়ি, যজ্ঞশ্রীকে মহারাষ্ট্র দান করিয়া, তৈলঙ্গণের রাজতক্তে আরোহণ করেন। ১৫৮ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা শিবশ্রী তৈলঙ্গণের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। শিবশ্রীর পরে শিবস্কন্দ ১৬৫ হইতে ১৭২ অব্দ পর্য্যন্ত

রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যজ্ঞশ্রী মহারাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া তৈলঙ্গণের অধীশ্বর হয়েন। তৎপরে বিজয় (২০২—২০৮), চন্দ্রশ্রী (২০৮—২১১) ও পুলোমবি (২১১—২১৮ অব্দ) তৈলঙ্গণে রাজত্ব করেন। মাঢরীপুত্র নামে এক ব্যক্তি যজ্ঞশ্রীর পরে মহারাষ্ট্রের রাজতক্তে বসেন। ১৮০ অব্দেও যে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা কান্‌হেরি-লিপি হইতে জানা যায়। সম্ভবতঃ তিনি অন্ধ্রভৃত্যদিগের জারজ শাখাভুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, খৃষ্টোত্তর ২১৮ অব্দ পর্য্যন্ত অন্ধ্রভৃত্যেরা রাজত্ব করেন।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অন্ধ্রভৃত্য বা শাতবাহন রাজাদিগের সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি কৌতুককর প্রবাদের উল্লেখ আছে এবং শকনৃপকাল, শককাল বা শকাব্দ কিরূপে শালিবাহনাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে ও শক শব্দ কিরূপে অব্দ অর্থে পরিণত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্ধ্রভৃত্যদিগের রাজত্ব-কালে যে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং প্রাকৃত ভাষাগুলি, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রী যে লিখিত ভাষা হইয়া উঠে, তাহাও এই পরিচ্ছেদে প্রমাণ করা হইয়াছে।

অন্ধ্রভৃত্যদিগের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইঁহাদের রাজত্বের প্রারম্ভে যবন, শক ও পল্হব প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি দ্বারা মহারাষ্ট্র বারবার আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই শক জাতি বহুদিন দ্বেষভাব পোষণ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহারা ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ও এদেশীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে এদেশবাসী হইয়া যায়।

অন্ধ্রভৃত্যদিগের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়ই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল এবং রাজন্যগণ উভয় ধর্ম্মেরই প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিতেন। উভয় ধর্ম্মবাদীদের মধ্যে যে কখন বিবাদ হইত, এমন কোন প্রমাণ কোন উৎকীর্ণ লিপিতেই পাওয়া যায় না।

এ সময়ে বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য উভয়ই বিশেষরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তন্তুবায়, ধান্যকশ্রেণী, গান্ধিক প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এক একটা সংহতি (Trade guilds) ছিল। সে সব সংহতি বেশ সুগঠিত ও সুফলপ্রদ ছিল। লোকে সে সব সংহতিতে টাকা জমা রাখিত ও বংশানু-

ক্রমে সুদ গ্রহণ করিত। এইরূপ সংহতি ও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ দেশের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন চিরজাগরূক রাখিয়াছিল। নিগমসভা নামে একরূপ কর্ম্মকেন্দ্র ছিল, তাহা অনেকটা আজিকালিকার মিউনিসিপালিটির মত কায করিত। সে সময়ে সুদের হার শতকরা পাঁচ হইতে সাড়ে সাত টাকা মাত্র ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, মাঝে মাঝে দেশমধ্যে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইলেও কখনও অরাজকতা বিরাজ করিত না এবং বাণিজ্য-সংহতি ও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎই দেশের শাসন-শৃঙ্খলা-রক্ষণে বিশেষ সাহায্য করিত।

সে সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল। এজন্যই এক প্রদেশের লোকে অপর প্রদেশে যাইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিত ও অতিথিশালা, দেবমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঙা কাপড়ের মূল্য।

—:o:—

(১)

"ওমা আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো,—আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো।"

চারিদিকে পূজার ঢাকের শব্দ উঠিয়াছে, পাশের বাড়ীতে প্রতিমার গায়ে রং পড়িতেছে, গ্রামের ছোট বড় ছেলে মেয়ে রং বেরংএর নূতন কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে ছুটিয়াছে; আর চারি বৎসরের বালক সতীশ মাতার অঞ্চল টানিতে টানিতে বলিতেছে, "ওমা আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো—আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো।"

মা বলিলেন, "ছি বাবা, আমি রাঙা কাপড় কোথায় পাব? তুমি যে লক্ষ্মী ছেলে।"

ছেলে সে কথা শুনিল না; ক্রন্দনের সুরে বলিল, "কেন, ওদের্ বলা রাঙা কাপল্ পলেছে, মিনা পলেছে, সুদা পলেছে, তুই আমাকেও আঙা কাপল্ দে।"

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তারা যে বড় লোক, আমরা যে গরীব বাবা।"

ছেলে মাথা সরাইয়া লইয়া বলিল, "তা হোক, তুই আমার কাপড় দে।"

মা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কত ভুলাইলেন, সময়ে সময়ে নিজেই যাহা বুঝিতে পারেন না, এমন অনেক উপদেশপূর্ণ কথায় চারি বৎসরের শিশুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছেলে সে সকল কথার কিছুই বুঝিল না, ভবিষ্যতে লভ্য শত প্রলোভনেও 'আঙা কাপলের' বায়না ছাড়িল না। শেষে মা ভয় দেখাইলেন, ধমক্ দিলেন, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, "আমায় আঙা কাপল্ দে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকের উপর সবলে হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। মার আর সহ্য হইল না; "হতভাগা ছেলে" বলিয়া তিনি পুত্রের নবনীত-সুকোমল পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন। ছেলে যাতনায় "ও মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। খানিক কাঁদিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, মার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। মাতার দরপ্রবাহিত অশ্রুধারা তাহার আঘাত-রক্তিম পৃষ্ঠদেশ সিক্ত করিতে লাগিল।

ছেলেকে শোয়াইয়া মা পাশে শুইলেন। ফুলিতে ফুলিতে ছেলে ঘুমাইয়া পড়িল। সুপ্তাবস্থায়ও তাহার কচি কচি ঠোঁট দুইটী থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মাতা সেই স্ফীত রক্তিম অধরে একটী চুম্বন করিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "কোথায় তুমি, একবার এস, তোমার সোণার সতু আজ একখানা নূতন কাপড়ের ভিখারী। আমি যে আর তাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারি না।"

ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল; সে অশ্রুপ্রবাহে নিদ্রিত সতুর কুঞ্চিত কেশরাজি সিক্ত হইতে থাকিল।

(২)

শ্রীনাথ সরকার ও গোপীনাথ সরকার দুই ভাই। শ্রীনাথ অপেক্ষা গোপীনাথ ছয় বৎসরের ছোট। গোপীনাথের বয়স যখন একাদশ বৎসর, তখন তাহাদের পিতা ও মাতা কয়েক মাসের ব্যবধানে ইহলোক ত্যাগ করিল। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক বা অভিভাবিকা ছিল না।

সুতরাং গোপীনাথকে পাঠশালা ত্যাগ করিয়া গৃহমার্জ্জন, রন্ধন, প্রভৃতি গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। শ্রীনাথ তাস খেলিয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। পিতা কিছু জমিজমা রাখিয়া গিয়াছিল, তদ্দারা কষ্টে স্বষ্টে দুইটা পেট চলিতে পারে।

এই ভাবে দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। একদিন গোপীনাথ, শ্রীনাথকে ধরিয়া বসিল; বলিল, "দাদা, এমন ক'রে বেড়ালে ক'দিন চল্‌বে? একটা কিছু কাজ কর্ম্ম কর।"

শ্রীনাথ বলিল, "কি কাজ কর্‌ব, চাকরী? জানিস্ তো, আমি লেখা-পড়ার ধারও ধারি না।"

গোপীনাথ বলিল, "চাকরী কেন? একখানা দোকান করি এস।"

শ্রীনাথ। দোকান? টাকা কোথায়?

গোপী। জমি দুবিঘে বেচ না।

শ্রীনাথ। তা যেন হ'ল, কিন্তু দোকান চালাবে কে?

গোপী। কেন, তুমি চালাবে।

হাসিতে হাসিতে শ্রীনাথ বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে। আমার ভাই ওসব বুদ্ধি মোটেই আসে না।"

গোপী। তা' না হয় আমিই চালাব, তুমি সংসার দেখ্‌বে।

শ্রীনাথ। তা' দেখ্‌তে পারি, কিন্তু ঐ রান্না আর মাসন মাজার কাজটা আমা হ'তে হবে না।

গোপী। তা না হয় আমা হ'তেই হবে! তুমি এক আধবার দোকানে গিয়ে বস্‌তে পার্‌বে না?

শ্রীনাথ। তা খুব পার্‌ব।

তাহাই হইল। আড়াই বিঘা জমি তিনশত টাকায় বিক্রয় করিয়া গোপীনাথ বাজারে দাদার নামে একখান মুদিখানার দোকান খুলিল।

গোপীনাথ রাত্রি থাকিতে উঠিয়া গৃহমার্জ্জনাদি প্রাভাতিক কার্য্য শেষ করিয়া প্রভাতে দোকানে গিয়া বসিত। মধ্যাহ্নে শ্রীনাথ গিয়া একবার দোকানে বসিত, গোপীনাথ আসিয়া রাঁধাবাড়া করিত। সে সময়ে খরিদ-দারের বড় একটা ভিড় থাকিত না, সুতরাং শ্রীনাথকে বিশেষ বেগ পাইতে

হইত না। গোপীনাথ নিজে খাইয়া দাদার ভাত চাপা দিয়া দোকানে যাইত, শ্রীনাথ আসিয়া ভাত খাইয়া তাস খেলিতে যাইত। রাত্রিতে গোপীনাথ দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়া রন্ধনাদি করিত।

গোপীনাথের ব্যবসায়-বুদ্ধি যেমন প্রখর, তেমনই তাহার হৃদয় সাধুতায় পূর্ণ। সুতরাং তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে দোকানখানি বেশ একটু উন্নতি লাভ করিল। গোপীনাথ তখন শ্রীনাথকে বলিল, "দাদা, মেয়ে মানুষ না থাক্‌লে বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে, তুমি একটা বিয়ে কর।"

শ্রীনাথ বলিল, "না ভাই, সে আবার এক মহা ঝঞ্ঝাট ; আমরা দু'ভায়ে বেশ আছি। একটা পরের মেয়ে এলে তাকে আবার দেখ্‌বে কে ?"

"আমি দেখ্‌ব" বলিয়া গোপীনাথ দাদার বিবাহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, এবং দুই তিন মাসের মধ্যেই দুইশত টাকা কন্যাপণ দিয়া একটী নয় বৎসরের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বালিকাকে বধূরূপে ঘরে আনিল।

গোপীনাথের আবার একটা কাজ বাড়িল। নূতন বউটীকে দেখাশুনা, তাহাকে খাওয়ান, নাওয়ান প্রভৃতি কার্য্যেই দিবসের অনেকটা সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল, সুতরাং দোকানে যাওয়া তাহার বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। শ্রীনাথই দোকান চালাইত, গোপীনাথ নববধূ সৌদামিনীর পরিচর্য্যা করিত, পাকা গৃহিনীর মত তাহাকে সংসারের কাজ, গৃহিণীপণা সব শিখাইত। তাহার যত্নে সৌদামিনীর দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাহার অর্দ্ধোদরব্যাপী প্লীহাটী ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া আসিল, উদরের স্ফীতি কমিল, পঞ্জরের অস্থিমালা, ও হস্তপদের নীলশিরা ঢাকা পড়িল। ক্রমে প্লীহাজীর্ণা শীর্ণকায়া সৌদামিনী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী ও দ্বাদশবর্ষীয়া হইয়া গৃহিনীর উচ্চ পদ অধিকার করিয়া বসিল। গোপীনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া আবার দোকানে ফিরিয়া আসিল।

(৩)

দোকানে গিয়া গোপীনাথ দেখিল, দোকানের অবস্থা শোচনীয়। ঘরে মাল নাই, বাক্সে টাকা নাই, খাতায় রীতিমত জমাখরচ নাই। অনেক টাকা বিলাত পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই আদায়ের সম্ভাবনা নাই।

গোপীনাথ দাদাকে বলিল, "একি, এমন হইল কেন ?"

শ্রীনাথ বলিল, "আমি তো আগেই বলেছি, ভাই, আমা হ'তে এ কাজ চল্‌বে না।"

গোপী। এখন উপায় ?

শ্রীনাথ। উপায় তুমিই জান।

গোপীনাথ অনেক ভাবিয়া বলিল, "দোকান রাখ্‌তেই হ'বে। বোয়ের গয়নাগুলা এনে দাও।"

শ্রীনাথ বলিল, "আমার কর্ম্ম নয়, তুমি নিজে দেখ।"

"আমিই দেখ্‌ছি" বলিয়া গোপীনাথ ঘরে গিয়া সৌদামিনীর নিকট তাহার গহনা চাহিল। সৌদামিনী গহনা চাহিবার প্রয়োজন কি জানিয়া লইয়া গহনা দিতে অসম্মত হইল। গোপীনাথ অনেক বুঝাইল, অনেক অনুনয় করিল, শেষে ধমক্ পর্য্যন্ত দিল, কিন্তু সৌদামিনী গহনা দিল না। গোপীনাথ দেখিল, সৌদামিনী এখন আর সেই নয় বৎসরের বালিকা নয়, সে এখন এই গৃহের গৃহিণী, কর্ত্রী। গোপীনাথ বিষণ্ণচিত্তে তথা হইতে ফিরিল। কিন্তু এই বিষণ্ণতার মধ্যেও যেন একটু আনন্দ কোথা হইতে উঁকি দিতেছিল। এ আনন্দ বুঝি চেষ্টার সাফল্যজনিত। যে ক্ষুদ্র বিশুষ্কপ্রায় লতাটীকে জলসিঞ্চনে প্রাণপণযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছি, বসন্তসমীরস্পর্শে তাহার সগর্ব্ব আন্দোলন দেখিলে বুঝি এমনই একটা আনন্দের আবির্ভাব হয়; যে মাতৃহারা সদ্য অণ্ড-নির্গত কপোতশিশুটীকে আপনার মুখে করিয়া ভক্ষ্য দিয়া বাঁচাইয়াছি, বড় করিয়াছি, তাহাকে স্ফীতকণ্ঠে গর্জ্জন করিতে শুনিলে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাও বুঝি তাহাই।

গোপীনাথ ধারকর্জ্জ করিয়া বহুকষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া, দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। প্রত্যুষে বাহির হইয়া যাইত, মধ্যাহ্নে একবার মাত্র খাইতে আসিত; কোন দিন তাহাও আসিত না- একেবারে রাত্রিতে দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়া খাইত। শ্রীনাথ এজন্য সময়ে সময়ে ভৎর্সনা করিত, অসুখের ভয় দেখাইত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোপীনাথ তাহাতে কাণ দিত না। দোকানের উন্নতিই তাহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়াছিল।

"সাধিলেই সিদ্ধি," গোপীনাথ এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিল। চারিবৎসর পরে তাহার ছয় শত টাকা মূলধন ছয়সহস্রে পরিণত হইল, এবং সেই ক্ষুদ্র মুদিখানাটী এক বৃহৎ আড়তের আকার ধারণ করিল। শ্রীনাথ ধূম-ধামের সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বধূ যামিনীকে ঘরে আনিল।

যামিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিল। সৌদামিনী ব্যতীত সকলেই তাহার প্রশংসা করিত।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীনাথের অনেক সাংসারিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। পুরাতন বাড়ীখানি নব সুসজ্জিত গৃহে শোভিত হইল, খিড়কী পুকুরের সংস্কার হইল; তাহার চারি পাড়ে কলা বাগান ও ফুলবাগান উদরপরায়ণ বানরকুঞ্জের কিচিমিচি ধ্বনিতে এবং কুসুমলোলুপ কুসুমপ্রফুল্ল বালিকা-বৃন্দের কলহাস্যে মুখরিত হইতে লাগিল; গৃহদেবতা শ্রীধরের পতনোন্মুখ মৃণ্ময় গৃহখানি সুধাধবলিত ইষ্টকালয়ে পরিণত হইল; আর সৌদামিনী একটী পুত্র ও একটী কন্যা এবং যামিনী একটী পুত্র উপহার দিয়া সংসারো-দ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিল। কিছু জমি-জমাও কেনা হইল। কিন্তু সে সকলই সৌদামিনীর নামে। শ্রীনাথ ভ্রাতাকে বুঝাইল, 'কারবারের কথা বলা যায় না। ঈশ্বর না করুন, যদি তেমনই ঘটে, তবে মহাজনে সব বেচে কিনে নিতে পারবে না।"

গোপীনাথ ইহাতে কোন আপত্তি করিল না; মনে মনে ভাবিল, দাদার বুদ্ধিটা চিরকালই কেমন এক রকম। মহাজনকে ফাঁকী দেবার চেষ্টা কর্‌লে কারবার চল্‌বে কেন?

গোপীনাথ বুঝিতে পারে নাই যে, এই বুদ্ধিটা শ্রীনাথের নিজস্ব নহে। সৌদামিনী ইদানীং আপনার বুদ্ধির অধিকাংশই শ্রীনাথকে ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রীনাথ আপনার হৃদয়ের সরলতাটুকু বন্ধক দিয়া পত্নীর নিকট এই ঋণ গ্রহণ করিতেছিল।

(৪)

সৌদামিনী হস্তধৃত হারছড়াটী দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "আমি বাজি রেখে বল্‌ছি, হার কিন্‌তে ঠাকুরপোর কাছ থেকে তুমি এক পয়সাও

শ্রীনাথ বলিল, "আর বাজি রাখ্‌তে হবে না; আমি এখনই এক কথায় টাকা এনে দিচ্ছি।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া সৌদামিনী বলিল, "এমনই লক্ষ্মণ ভাই বটে।"

শ্রীনাথ। তুমি গোপীনাথকে চেন।

সৌদা। আমি অনেক দিন চিনেছি, এবার তুমিও চিন্‌বে। এতো আর ছোট বোয়ের গয়না কেনা নয়?

"ভাল, দেখা যাবে" বলিয়া শ্রীনাথ প্রস্থান করিলেন।

সৌদামিনীর কথাই ঠিক হইল; গোপীনাথ এ সময়ে হার কিনিবার জন্য টাকা দিতে রাজি হইল না। বলিল,—"সাম্‌নে চৈত্রের আখেরী কিস্তী; মহাজনের পাই পয়সা পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিতে হবে। এখন তিন শত টাকা দিতে পারা যায় না।"

শ্রীনাথ দেখিল, সৌদামিনীর কথাই সত্য; গোপীনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে। রাগে ফুলিয়া শ্রীনাথ বলিল, "উত্তম, আজ হ'তে আমি নিজে কারবার দেখ্‌ব, আমাকে হিসাব-পত্র কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দাও।"

গোপীনাথ একবার জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া চাবি ফেলিয়া দিল।

সৌদামিনীর মনোরথ সিদ্ধ হইল। দুই তিন মাসের মধ্যেই বাড়ী-ঘর ভাগ হইয়া গেল, উঠানের মাঝখানে প্রাচীর উঠিল। কারবারের ভাগ হইল না। শ্রীনাথ বলিল, ভাগ হ'লে কারবার নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমার নামেই কারবার থাক্, তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু পাবে।"

গোপীনাথ তাহাতেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "আর জমি-জমা?"

শ্রীনাথ। পৈতৃক জমির ভাগ পাবে।

গোপী। নূতন খরিদা জমি?

শ্রীনাথ। যার নামে আছে সেই পাবে। পার, নালিশ ক'রে আদায় কর।

গোপীনাথ সহাস্যে বলিল, "দাদা, এই তিন কড়ার বিষয়ের জন্যে তোমার নামে নালিশ করব?"

গ্রামের অনেকেই গোপীনাথকে পরামর্শ দিল, "নালিশ ক'রে কারবার

চুলচেরা ভাগ ক'রে লও।" গোপীনাথ উত্তর করিল, "কারবারের জন্ত আমার বুকের অনেক রক্ত ঢেলেছি, সে রক্তে উকীল-মোক্তারদের পেট ভরাতে পারব না।"

যামিনী বলিল, "এতটা বিষয় এক কথায় ছেড়ে দিলে?"

ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "রাধা গয়লাকে ত ছেড়ে দিই নাই, বড় ভাইকে দিয়েছি। ভেব না, বরাতে থাকে, আবার হ'বে। কি বল সতু?"

সতু ওরফে সতীশ পিতার গলা জড়াইয়া খল্ খল্ হাসিয়া উঠিল।

গোপীনাথ মুখে যতটা প্রসন্নতা দেখাইতে চেষ্টা করিত, অন্তরে ততটা প্রসন্নতা আসিত না। এতদিনের পরিশ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। ইহার উপর বর্ত্তমান অন্নচিন্তা। পত্নী-পুত্রকে যে কি খাওয়াইবে, তাহার উপায় নাই। পৈতৃক তিন বিঘা সাড়ে সাত কাঠা জমির অর্দ্ধাংশ মাত্র ভাগে পাইয়াছে।

গোপীনাথ চিন্তাসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কখন ভাবিত, যাক্ না সেই আমি ত আছি; আবার খাটিব, আবার উন্নতি করিব। কিন্তু আর সে শক্তি কোথায়? সে অদম্য উৎসাহ কৈ? জগতের অবিশ্বাস ও ও অকৃতজ্ঞতা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যে আঘাত করিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে গোপীনাথ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইল। বিনা চিকিৎসায়, দুর্ভাবনায় রোগ ক্রমে কঠিন আকার ধারণ করিল। ক্রমে তাহা জ্বরাতিসারে পরিণত হইল। যামিনী আপনার গহনাপত্র বন্ধক দিয়া, বেচিয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিন মাস রোগ-যন্ত্রণা-ভোগের পর, পত্নী-পুত্রকে এক প্রকার পথে বসাইয়া গোপীনাথ প্রতারণাপূর্ণ অকৃতজ্ঞ সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। যামিনী শিশুপুত্র লইয়া দুঃখ ও দারিদ্র্যের সাগরে ভাসিল।

(৫)

শরতের স্বর্ণাভ প্রভাতরশ্মি শ্যাম বৃক্ষাগ্র রঞ্জিত করিয়া, দূর্ব্বাশিরে নীহারের মুক্তাবিন্দু দোলাইয়া, চারিদিকে উৎসবের নবীন আলোক

ছড়াইয়া দিতেছিল। ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া পল্লীর দ্বারে গাহিয়া বেড়াইতেছিল,—

গিরি মনে আছে এই বাসনা।
এবার জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে
গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা॥

গানের তালে তালে জননীহৃদয়ের আশা, আনন্দ, স্নেহ, প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া মধুর শারদ প্রভাতকে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল।

শ্রীনাথ এ বৎসর নূতন পূজা আনিয়াছে। বেশ ধূমধামের সহিত পূজার আয়োজন হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা চিত্রিত হইতেছে। ঠাকুর দেখিবার জন্য এক পাল ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে; তাহাদের হাস্য কোলাহলে বহির্বাটী মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এক পাশে একটী পাঁচবৎসরের বালক ছিন্ন মলিন বাসে কটিদেশ আবৃত করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে গোপীনাথের পুত্র সতীশ।

শ্রীনাথ চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে বালকদলের আনন্দ উৎসব দেখিতেছিল, আর অনেক নামজাদা ঘরের ছেলেকে ঠাকুর দেখিবার জন্য তাহার প্রাঙ্গণে সমাগত দেখিয়া মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল! এমন সময় শ্রীনাথের দ্বিতীয় পুত্র বলাই নব বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়া সতীশের পাশে দাঁড়াইল, এবং আপনার নূতন কাপড় দেখাইয়া বলিল, “সতু, তোর নোতুন কাপড় নেই।”

সতীশ আপনার মলিন বস্ত্রের একপ্রান্ত তুলিয়া বলিল, “এই যে আমাল কাপল।”

বলাই বলিল, “ওতো ছেঁড়া; এই দেখ্ আমার নোতুন কাপড়।”

সতীশের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে একবার আপনার ছিন্ন মলিন বস্ত্রের দিকে, আরবার বলায়ের নব বস্ত্রের দিকে চাহিয়া নীরবে রহিল। বলাই তখন করতালি দিয়া বলিল, “দুও, তোর নোতুন কাপড় নেই।” সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বালকবৃন্দ করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “দুও, দুও!”

সতীশের চোখ দুইটী জলে ভরিয়া আসিল। একবার কাতর দৃষ্টিতে

জ্যেঠতাতের মুখের দিকে চাহিল। শ্রীনাথ দেখিল, বালকের সে দৃষ্টি কি করুণ, কি আকুলতাপূর্ণ! সে দৃষ্টি তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া একটা তীব্র আঘাত করিল।

সতীশ এই বিদ্রূপপ্রিয় বালকদলের মধ্যে আপনাকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞান করিয়া, দুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে চলিয়া গেল। বলায়ের সহিত বালকগণ 'দুও দুও' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রীনাথ ভ্রুকুটি করিয়া রোষ-কটাক্ষে বলায়ের দিকে চাহিল। বলাই ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। বালকগণও নিস্তব্ধ হইল।

(৬)

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় যখন বাহিরে অধিবাসের বাজনা বাজিতেছিল, তখন শ্রীনাথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসিলেন, "ছোট বৌমা কেন এসেছিল ?"

সৌদামিনী ভাঁড়ার ঘরে চাবি দিতে দিতে বলিল, "কেন আবার ? এসে-ছিলেন একটু দুধ চাইতে। আমার ঘরে যেন সাতটা গাই বিইয়েছে।"

শ্রীনাথ। তা' দুধ দিলে না কি ?

সৌদা। কোথা পাব যে দেব? যা দুধ হয়,আমারই ছেলের খেতে কুলায় না।

শ্রীনাথ। তা' আমি জানি। কিন্তু এমন সময়ে দুধ চাইতে এল কেন ?

সৌদা। বলে—ছেলেটার জ্বর হয়েছে। তা' জ্বর হয়েছে ত বাজারে কি দুধ নাই ? পোড়া লোকের জ্বালায় গেলাম।

শ্রীনাথ। সতীশের জ্বর হয়েছে ? কবে জ্বর হ'ল ?

সৌদামিনী মুখ ঘুরাইয়া বলি, "অত খবর রাখ্‌বার আমার সময় নাই। ছেলেগুলো এখনও খেতে পায় নি।"

সৌদামিনী সৌদামিনী-বেগে অন্তর্হিত হইল।

অদূরে ক্ষান্তর মা বসিয়া ডাউল বাছিতেছিল। সে বলিল, "শুনছি ছেলেটার বড্ড ভারি ব্যারাম ; বিকার হয়েছে, কেবল আবোল-তাবোল বক্‌ছে। হারু কবরেজ এসেছিল, ব'লে গেছে, বাঁচে কি না সন্দেহ।"

শ্রীনাথ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কথাগুলা শুনিল ; তারপর কাহাকেও কিছু

বলিয়া ধীরপদে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত বিল্বমূলে বসিয়া উদাত্তস্বরে দেবীর আবাহন-মন্ত্র পাঠ করিতেছেন,—

"আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে।"

শ্রীনাথ সেখানে দাঁড়াইল না; ধীরে ধীরে গোপীনাথের বাড়ীতে প্রবেশ করিল; ধীরে কম্পিতপদে স্পন্দিতবক্ষে শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, কি করুণ দৃশ্য!

ছিন্ন মলিন শয্যা; তদুপরি ছিন্ন শতদলবৎ সতীশের ক্ষীণ দেহ-লতা বিলুণ্ঠিত। শীর্ষদেশে রুক্ষকুন্তলা শতছিন্নবাসা যামিনী দাবানলস্পৃষ্টা লতিকার মত পুত্রের রোগক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্ষীণ দীপশিখা নাচিয়া নাচিয়া ছায়ালোকে গৃহমধ্যে মৃত্যুবিভীষিকা বিস্তার করিতেছে। সতীশের চৈতন্য নাই; সে কখন বিকারের ঘোরে আপনার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছে, কখন অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে, কখন বিছানার চারিদিকে গড়াগড়ি দিতেছে। যামিনী তাহাকে শয্যার যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া, তাহার শীর্ণ অধরে অধর সংলগ্ন করিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছে—"সতু, সতু, বাপ আমার!" সতু মাতার সে আকুল কণ্ঠের করুণ আহ্বান শুনিতেছে না; সে রক্ত চক্ষু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, শীর্ণ অঙ্গুলি উপর দিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আঙা কাপল,—আমি আঙা কাপল্ নেব।"

যামিনী অশ্রুধারায় পুত্রের মস্তক সিক্ত করিয়া বলিল, "সতু, আমার সোণার যাদু, আমি সর্ব্বস্ব বেচে তোকে রাঙা কাপড় পরাব।"

সতু চীৎকার করিয়া বলিল, "আঙা কাপল, আঙা কাপল; ও মাগো, আমি আঙা কাপল পল্‌ব।"

শ্রীনাথ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধীরে কক্ষের বাহিরে আসিল।

সেই রাত্রিতে ডাক্তার আসিল, ঔষধ চলিল, কিন্তু সতীশের রোগ কমিল না, তাহার "আঙা কাপলের" প্রলাপ-চীৎকার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

সপ্তমী পূজা শেষে সকলে দেবীর পদে অঞ্জলি দিল, কিন্তু শ্রীনাথ দিল না। সে তখন কোথা হইতে একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া বাড়ীতে আসিল; এবং ঘরে ঢুকিয়া বাক্স খুলিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

সৌদামিনী ঘরে আসিয়া বলিল, "ওমা, তোমার এখনও নাওয়া হয় নি, কি ঘেন্না!"

শ্রীনাথ কোন উত্তর না করিয়া বাক্স হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিল। সৌদামিনী বলিল, "টাকা এখন কি হবে?"

শ্রীনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "ডাক্তার খরচ"

সৌদা। আর কাগজ গুলা?

শ্রীনাথ। বিক্রয় কবালা।

সৌদামিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না। সে অগ্রসর হইয়া কাগজ ও নোটের একপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছে? আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি ও বাঁচ্‌বে না। টাকাগুলা কেন জলে ফেল্‌ছ?"

সৌদামিনীকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া শ্রীনাথ ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। সৌদামিনী পড়িয়া গেল; বাক্সের কোণ লাগিয়া তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শ্রীনাথ সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না।

শ্রীনাথ ছুটিয়া গিয়া সতীশের রোগশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন রোগীর নিঃশ্বাস বড় জোরে বহিতেছে, কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; সেই ক্ষীণ কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে সতীশ এক একবার বলিতেছে—আাঙা কাপল!

উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া শ্রীনাথ ডাকিল, "সতু, সতু!"

সতীশ কষ্টে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল; ভগ্ন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আাঙা কাপল!"

শ্রীনাথ বলিল, "এই তোর রাঙা কাপড়ের দাম! আজ হ'তে সব বিষয় তোর।"

শ্রীনাথ সতীশের হাতে কাগজগুলি দিতে গেল, কিন্তু সতীশ আর সে কাগজ লইল না। পুত্রহারা জননীর আর্ত্ত চীৎকারে পূজার আনন্দ-কোলাহল—উচ্চ বাদ্যধ্বনি বিলীন হইয়া গেল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

আর্য্যগাথা ও Lyrics of Ind.

—:○:—

১২৮৯ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। কবির বয়স তখন উনবিংশ বৎসরমাত্র। 'ভারতী' ও 'নব্যভারতে' ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল, এবং কবির নিজের কথায় ইহা সাধারণের নিকট 'আশাতীত আদর পাইয়াছিল।' কিন্তু যে সঙ্গীতের স্রোতে তিনি জাতিকে ভাসাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার এই ক্ষীণ আরম্ভ-প্রবাহে প্রতিভার উন্মেষরেখা তখনও তেমন স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় নাই।

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিলাতে যান। তথায় তিনি Lyrics of Ind নামে একখানি ইংরাজী কবিতাপুস্তক প্রকাশিত করেন। সুদূর প্রবাসে মাতৃভূমির জন্য তাঁহার কবি-হৃদয় কিরূপ কাঁদিয়াছিল তাহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা হইতেই প্রতীয়মান হয়। আমরা ইহার শেষ দুই শ্লোকের অবিকৃত অনুবাদ নিম্নে দিলাম:—

যদিও আঁধার দুঃখের মাঝে নিপতিত আজি তুমি,
তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে পারি গো জনমভূমি?
তুমি যে একদা, হে মোর ভারত, আছিলে জগতরাণী;
ওগো সুন্দরি ভারত আমার প্রিয় নিকেতনখানি!
যদিও সে তব গৌরব যশ সকলই পেয়েছে লয়,
কিছু নাই আর এখন তাহার, নামটুকু শুধু রয়,
তবুও সে তব লাজ-কুহেলিকা ভেদিয়া দেখি যে ভাসে
কি-এক সুষমা, রবির কিরণ—এখনো নয়নে আসে।

বিংশ বৎসর পরে যে দীপ্ত স্বদেশপ্রেম 'আমার দেশ'-সঙ্গীতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এই ইংরাজী কবিতাতেই কি তাহার স্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইতেছে না?

Lyrics of Indএর অনেকগুলি কবিতাই অতি সুন্দর। দেশী ও

বিলাতী অনেক সংবাদপত্রে ইহা প্রশংসিত হইয়াছিল। কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি তখন হইতেই কত প্রখর হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা তাঁহার Divine Right শীর্ষক কবিতা হইতে কয়েক ছত্রের অনুবাদ করিয়া দিলাম ঃ—

আমি জ্যোছনা চুমি, গোলাপ-গায়ে যখন সে তায় জড়িয়ে থাকে,
আমি পান করি গান চাতক পাখীর ভোর বেলা সে যখন ডাকে ;
আমি বিভোর হ'য়ে তারায় ভরা আকাশ পানে চেয়ে রই,
আর সাঁঝগগনে মেঘের খেলা প্রাণের ভিতর ভরিয়া লই।

তিনি ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিলেন কেন তাহার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ Lyrics of Indএর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যের ভাবসমন্বয়-চেষ্টাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।* এই উদ্দেশ্য তাঁহার এই ইংরাজী কাব্যে যতটা সফল না হউক, উত্তরকালে রচিত কতকগুলি সঙ্গীতের সুরলয়-সংযোগকালে যে তিনি বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

ইহার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ 'আর্য্য-গাথা' প্রথমভাগ প্রকাশিত হইবার দশবৎসর পরে 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল এখন বিবাহিত। 'স্বপ্নময়, কুহুময় প্রেমে' এখন তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। কবি এই 'দুখময় ধরা'কে 'সুখভরা' দেখিতেছেন। তিনি গাহিতেছেন ঃ—

আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ মলয় বাতাস; ফুটেছে আজ মধুর আলো।

'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয়ভাগ কবির এই হৃদয়ভরা প্রেমে উচ্ছ্বসিত। একটি গানে প্রেমিক কবি এইরূপে প্রিয়াকে সম্বোধন করিতেছেন—

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটীররাণী।

আর একটি গানে তিনি প্রেয়সীকে বলিতেছেন,—

তুমি পূজা ভকতি সে, তুমি দেবী, তুমি রাণী।

এই নারী-প্রেমই যে কালক্রমে স্বদেশ-প্রেমের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ—

---

* It is the aim of the author to establish a marriage and an intellectual commerce between their poetries.

এই অমর বাণীতে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

কবিহৃদয়ে যখন যে ভাবের বন্যা আসে, তখন দিশাহারা কবি তাহারই প্লাবনে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া অতুল আনন্দ লাভ করেন। আর সেই আনন্দের প্রকাশ-চেষ্টায় যে জীবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু এই স্রোতের মধ্যে যে অন্যান্য ভাবধারাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া মিলিত হয় না, তাহা নহে। ক্রমে হয়ত একটা কোন আকস্মিক ঘটনা-সংঘাতে হৃদয়ের সেই প্রথম প্রবাহ এই ক্ষীণপ্রায় প্রতীয়মান ধারাবিশেষের পথে প্রবাহিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে এখন যে প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল তাহা যেন তাঁহাকে অপর সকল কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু 'আর্য্যগাথা'র প্রেম-কবিতাতেও এমন ভাব দেখিতে পাই যাহা পরে দেশের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, এই সময়েই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত চিন্তা ও শক্তিকে দেশের দিকে ছুটাইয়া দিয়াছিল। এই আঘাতজনিত প্রথম উত্তেজনা হাসির গানে, ব্যঙ্গ কাব্যে ও প্রহসন-রচনায় প্রকটিত।

একঘরে।

এই আঘাতটি সমাজ হইতে তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলালকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিল। হিন্দুর সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার উপর জাতিচ্যুতির অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুদূর বিলাতে যিনি দেশের মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলেন, এবং আবেগভরা প্রাণ ও প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া যিনি মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয় স্বদেশ-বাসিগণকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে সেই প্রিয় দেশভ্রাতৃগণই তাহাদের সমাজে তাঁহাকে স্থান দিল না, তখন তিনি ক্ষোভে, দুঃখে ও ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। এই মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া তিনি 'একঘরে' লিখিলেন। ইহার ভাষা যে কিরূপ তীব্র ও হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ কিরূপ ভীষণ তাহা পুস্তকের শেষ কয়েক ছত্র

হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তিনি লিখিতেছেন—

"হিন্দুসমাজ পচিতেছে—

পৃথিবীর লজ্জা, মনুষ্যজাতির আবর্জ্জনা, পরাজিত, প্রতাড়িত পদাহত হিন্দুজাতি—আজ পচিতেছে।

জীর্ণ, শীর্ণ, ভাঁড় (Pantomime) হিন্দু জাতি আজ পচিতেছে।

শঠতার ভাণ্ডার, মিথ্যাকথার ওস্তাদ, লুকোচুরীর সর্দ্দার, ভীরুতার সেনাপতি হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে—

এ মিথ্যা, এ প্রতারণা এ ভাঁড়ামি, এ নির্ম্মমতা, এ নির্ব্বিবেকতা সে পচার দুর্গন্ধ ও দুষিত বায়ু।"

বাঙ্গালীদ্বেষী মেকলেও কি বাঙ্গালীকে এত গালি দিতে পারিয়াছিল?

কিন্তু সমাজের উপর তিনি যে তখন এত গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন,"তাহা বিদ্বেষে নহে, শত্রুভাবে নহে; ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যে ক্রোধ, অন্যায়-ব্যবহারী পিতার প্রতি পুত্রের যে ক্রোধ সেই ক্রোধে" গালি দিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ ভণ্ডামিতে পূর্ণ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু এই সকল পাপী, দুরাচারদিগকে সমাজ শাসন করে না। আর কে কাহাকে শাস্তি দিবে? সমাজের সকলেই যে এই রকম। ইহারা বিলেতফের্ত্তাদিগকে একঘরে করিবে, কিন্তু নিজেরা "রুদ্ধ কবাটে মুরগীর ঝোল খাইয়া বাহিরে আসিয়া অমায়িকভাবে মিছা কথা কহিয়া পুণ্যসঞ্চয়" করিবে। সমাজের এই ভণ্ড-শিরোমণি ও চূড়ামণি-গণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—'জানি মহাশয়, এই ত আপনাদের সমাজ,—টাকা বা টিকী থাকিলে মিছা কথা কহিলে বা গোঁফ কামাইলে সাত খুন মাফ। মহাশয়, আমার দুরদৃষ্ট যে টাকা নাই। টিকী নাই, চন্দনের ফোঁটা নাই, কোশাকুশী নাই, ও গোঁফ আছে।'

আত্মাভিমান-ক্ষুণ্ণ দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁহার প্রতি সমাজের দুর্ব্ব্যবহারে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়াই সমাজকে এইরূপ অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিয়া-ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উদার ও নির্ব্বিকারভাবে সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা বোধ হয় তখন তাঁহার ছিল না, কিম্বা থাকিলেও এই ঘোর অনিষ্টকর সামাজিক সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া তিনি যুক্তিসঙ্গত

বলিয়া মনে করেন নাই। সে যাহা হউক, স্বদেশ-হিতৈষণার দীপ্ত বহ্নি তাঁহার মনে কিরূপ প্রবলভাবে জ্বলিতেছিল তাহার প্রমাণও এই পুস্তকেই পাওয়া যায়। কাহাদের একঘরে করিলে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে? এ সম্বন্ধে তিনি কি বলিতেছেন শুনুন:—'একঘরে করিতে চাহেন, আসুন আজ যে সব বিষয় সমাজের অমঙ্গলের হেতু, তাহাদিগকে একঘরে করি। আসুন আজ বলি যে শঠতা করিবে, মিছা কথা কহিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে স্ত্রী ছাড়িয়া বেশ্যাবৃত্তি করিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে পঞ্চমবর্ষীয়া শিশুর বিবাহ দিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে যুবতী বিধবার স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে তাহাকে একঘরে করিব। যে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে খোসামোদের তৈলে শ্বেত পা মর্দ্দন করিবে তাহাকে একঘরে করিব। আসুন যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে, তাহাদিগকে একঘরে করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন দেশের মঙ্গল হইবে, জাতির জীবন হইবে। সে 'একঘরে'র অর্থ অধর্ম্মের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ; সে একঘরের অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ; জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না; কারণ তাহার অর্থ জাতির মান্য, দেশের ভক্তি। সে একঘরের অর্থ, বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম।'

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'একঘরে' লইয়া যে এত কথা বলা হইল তাহার কারণ আছে। এই সামাজিক ব্যাপারটি তাঁহার জীবনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির প্রবল শত্রু হইয়া পড়েন, এবং যে নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা তাঁহার ব্যঙ্গ ও প্রহসনের প্রধান গুণ তাহাও এই পুস্তকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আর একটি কারণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মূল্যবান। এই পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষ প্রয়োগ দ্বারা হাস্যরসের অবতারণা করিবার ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি:—

(১) 'পেয়াদা শ্বশুরালয়ে যাইব বলিলে যেমন তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে, কেহ তাঁর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে প্রেয়সী বলিয়া ডাকিলে অপরের যে যাতনা হয়, হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার তেমনি শরীরে বেদনা হয়।'

(২) 'আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব ;—মাথা মুড়াইব (তেড়ী ভাঙ্গিয়া যায় ক্ষতি নাই); ঘোল ঢালিব ; গরুর antiseptic চন্দনামৃত ভক্ষণ করিব ;—প্রাণে মারিবেন না।'

(৩) 'আর একবার চাদর কোলে করিয়া, ঊর্দ্ধজানু হইয়া বসিয়া, কমনীয় খুরীতে পরমান্ন খাইয়া, মনোরম ঘটে জলপান করিয়া, চটিজুতা হারাইয়া, সঘর্ম্ম কলেবরে, শুষ্ক হস্তে ততোধিক শুষ্ক মুখে (কারণ হারায়িত চটি) ক্রোশান্তরে গিয়া পানাপুকুরে মুখহস্ত ধৌত করিব।'

কল্কি-অবতার।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, একটা প্রবল আঘাতজনিত তীব্র বেদনা মানুষের চেতনাকে এরূপ ভাবে জাগাইয়া দেয় যে, সে তখন পৃথিবীর সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এক-ঘরে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যায় অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া প্রথমে সমাজের উপর সমগ্র গালি বর্ষণ করিলেন বটে ; কিন্তু পরক্ষণেই যেন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাঁহার দৃষ্টি মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও উদার হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে, একদিকে যেমন হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ দোষ প্রবেশ করিয়াছে, অপরদিকে তেমনই আবার তাঁহাদের বিলেতফের্ত্তাদের মধ্যে অন্য প্রকারের এমন অনেক দোষ আসিয়াছে যাহা অমার্জ্জনীয়। এই জ্ঞানোন্মেষের ফল,—তাহার প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার'। এখানে তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। "বিলেতফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু" এই 'পঞ্চ সম্প্রদায়ে'র সকলের পৃষ্ঠেই তীব্র কশাঘাত পড়িয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার নিকট বিলাত-ফের্ত্তাদের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন ঃ—

'বিলেতফের্ত্তানামক আর এক সম্প্রদায় হইবে ; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন সব বিষয়ে সাহেবদিগের ষোলখানা মাত্রায়

অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাটকোট পরিয়া আত্মবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বুল-চর্ব্বণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায় সমস্ত দেশীয় রীতিনীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে; এবং কেবল কুলি সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গালা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী শ্ল্যাং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজী সুরে শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে। হুইস্কি খাইবে এবং পদদ্বয় যত দুর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।'

কয়েক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল যে 'আমরা বিলেতফের্ত্তা ক ভাই' নামক হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিরই রূপান্তর-মাত্র নহে কি? বস্তুতঃ, 'একঘরে'র পর তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কখনও একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্কীর্ণতা ও ভণ্ডামি যেমন তাঁহার অসহ্য ছিল, তেমনই আবার 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি প্রহসনে বিলেতফের্ত্তা ও নব্যহিন্দুগণকেও হাস্যস্পদ করিতে বিরত হন নাই। 'কল্কি-অবতারে'র দরবারে যখন সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ বিচারার্থ সমবেত, তখন তিনি সকলের বক্তব্য শুনিয়া এইরূপ রায় দিলেন:—

বিলেত ফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত হঁাদা।
যেন সব বানর, মর্কট, বিড়াল, কুকুর, গাধা।
বানর যেন লব্ধরম্ভা—দিয়া লক্ষ যোজন
পেয়েছেন যা—গাছে চড়ে করিছেন ভোজন।
মর্কটটী লক্ষ দিতে অসমর্থ ভাবে—
কচ্চেন কিচিমিচি—অর্থ—'আচ্ছা দেখা যাবে—
লক্ষ দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি,
কিন্তু ও সব আমরাও কতক পারি—আমরাও জানি।'
কুকুর নীচে বৃথা কচ্ছে'ন ভেউ ভেক্ ভেক্—,
ও'রা দাঁত খিচোন, অর্থ—'কেন:কর দেক্?'
বিড়াল এদিক্ ওদিক্ ঘুরে কর্চ্চেন 'মেউ মেউ'
আর অর্থ 'মাছ ত কই দিলেনাক কেউ।'
গর্দ্দভ ঘাস খেতে খেতে কাণ তুলে চাচ্চেন;

অর্থ ব্যাপারখানাটির কি ? আবার ঘাস খাচ্চেন।
সমাজটা ত এই রকম দাঁড়িয়েছে ভাই ;
কারুর সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ নাই।
সকলেই সমান নিজের আহারটি খোঁজেন,
আর ভাল আহারটি কি;—তাও বেশ বোঝেন।
তথাপি এ দিনরাত সদাই খিচির খিচির;
ঘুস্ ঘুস্, ফিস্ ফিস্ এবং কিচির মিচির ;
আমার রায় তোমরা এখন ও সব গিয়ে ভুলে;
একবার কোলাকুলি কর প্রাণ খুলে।'

এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে অমৃতলাল, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যঙ্গকারিগণের প্রভেদ। আমাদের সুপ্রাচীন, 'সনাতন' হিন্দু সমাজটি যাহাতে অটুট থাকে, নূতন ভাবের আক্রমণে যাহাতে তাহা একটুও বিপর্য্যস্ত না হয়, অমৃতলাল-প্রমুখ লেখকগণ তাহারাই চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। তাই তাঁহারা ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরতদিগকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের বাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন ; কিন্তু একান্ত রক্ষণশীল হিন্দুর উৎকট গোঁড়ামি তাঁহাদের চক্ষে পড়ে নাই। ইঁহারা যে হিন্দু সমাজের উপকার করেন নাই তাহা নহে; কিন্তু যে উদারতা থাকিলে ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য সমাজব্যাধি-প্রতিকারকল্পে বিশেষ ফলপ্রদ হয়, তাহা তাঁহাদের ছিল না। এই উদারতা যে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গে ছিল তাহা উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতেই প্রমাণিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

——:•——

যৎকিঞ্চিৎ ভ্রমণ।

——:o:——

ষষ্ঠীজাগরবাসরে বিধাতা পুরুষ আমার ললাটে যে ভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, অতি অল্প বয়সেই তাহার সূচনা হয়।

সে অনেক দিনের কথা। তখন ভাগলপুর জেলা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগণ যেমন নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে

থাকে, আমিও তেমনি ভাগলপুরের মোসাক চকের বাসাটি কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে সুরু করিয়া দিলাম। পর্য্যটন গৃহের কক্ষের মধ্যে হইত না বটে, কিন্তু যথাসময়ে সেই নিভৃত নিলয়ের বক্ষেই ফিরিয়া আসিতাম। এ বিশ্বে প্রতি মুহূর্ত্তেই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। আমি ত সৃষ্টিছাড়া নই, সুতরাং বাহিরে গেলেও দৃষ্টিটা সর্ব্বদাই থাকিত বাড়ীর দিকে। আজ যে দুই দফা ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, সে দু'টি এই সময়ের। বলিয়া রাখি, এটা নিখাদ ভ্রমণ, কাহিনী এখানে কিছুই নাই।

প্রথম দফা—বারারি ভ্রমণ। বারারি ভাগলপুর সহর হইতে ক্রোশ খানেক দেড়েক হইতে পারে। বন্ধুবর 'উ' বাবু এই বারারির 'গুফ্ফা'র উল্লেখ সর্ব্বদাই করিতেন। এই গুফ্ফা নাকি ঋষিবিশেষের তপস্যাস্থল ছিল। মতান্তরে ইহা প্রাচীন জলদস্যুদিগের আড্ডা। তাহারা এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে অকুণ্ঠিতভাবে তাহাদের লুণ্ঠনবৃত্তি চালাইত। এটা একটা গোলকধাঁধা। 'উ' বাবু শুনিয়াছেন, এই সুরঙ্গ কোথায় শেষ হইয়াছে দেখিবার জন্য একজন অসম সাহসিক সাহেব উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু এই ভ্রান্তবুদ্ধি ইংরাজ গুফ্ফা হইতে আর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন নাই। গুহার মধ্যে একটা বাঘও নাকি বিঘোরে মারা গিয়াছিল। এহেন গুফ্ফা দেখিবার জন্য একদিন অপরাহ্ণকালে আমরা যাত্রা করিলাম।

শুনিতে পাই, আজকাল বারারির এপারে ওপারে রেল বসিয়াছে। কিন্তু যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এ সুখকর ব্যবস্থা হয় নাই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যথাস্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। সম্মুখেই শীতের গঙ্গা রজত-ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। পশ্চিমাকাশে রক্তসন্ধ্যার স্বর্ণমেঘ—নদীবক্ষে কাঞ্চনবর্ণের প্রতিচ্ছবি। পরপারে বনান্তরাল হইতে গোধূলি বধূ দিনান্তে ঘাটে আসিয়াছে; জলে স্থলে তাহার ছায়াঞ্চল ছড়াইয়া পড়িতেছে। অদূরে দেবালয়ে আরতির কাঁসরঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

নদীতীরে ইতস্ততঃ যে সমুদয় পদার্থ দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে গুফ্ফার কোনই চিহ্ন নাই, অথচ শুনিলাম, আমরা গুহার অতি নিকটেই

উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক, মুহূর্ত্ত মধ্যেই 'উ' বাবু ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, গঙ্গার ঠিক সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড কাঠের দরজা। ইহাই গুফ্‌ফার প্রবেশপথ।

কত না দর্শক এই কপাটের উপর কয়লা ও খড়ির আঁচড় কাটিয়া নিজ নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন! উপরে একটু ছাদ আছে তাই বর্ষার জলে এ সব একেবারে ফর্সা হয় নাই। এক পাশে লেখা ছিল—

"হে দর্শক, দেখ হেথা অতীত মহিমা,
ভারতের ইতিহাসে কীর্ত্তির গরিমা।"

এই গরিমার পরিমাণ দেখিতেই আসিয়াছি ভাবিয়া পুলকিত হইলাম।

'উ' বাবু চট্‌পট একখানি ইট লইয়া দরজার মাঝখানে ঠেলিয়া দিলেন, অমনি দুইখানি পাল্লা দুই দিকে হেলিয়া পড়িল এবং গুফ্‌ফার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সম্মুখভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। সঙ্গী গণেশবাবু গজানন না হইলেও লম্বোদর বটেন। তিনি ভিতরে যাইতে অসম্মত হইলেন। বলিলেন, আমরা ঢুকিয়া পড়িলে কোন দুষ্ট লোক যদি এই ইটখানা সরাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তবে ভিতর হইতে সহস্র চেষ্টা করিলেও রুদ্ধ দ্বার আর মুক্ত হইবে না। ফল—সকলের জীয়ন্তে সমাধি। সত্যই ত! গণেশবাবু এক লাঠিতে দুই সাপ মারিলেন দেখিয়া আমরা তাঁহার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলাম।

'উ' বাবু কতকগুলি মাটির ঢেলা কুড়াইয়া লইলেন। কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, এই অকিঞ্চিৎকর জিনিসগুলি আমাদের জীবনরক্ষার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবে। দক্ষিণে ও বামে মাটির দেওয়ালে দুইটি ছোট ছোট দরজা কাটা আছে। সকলেই 'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ' মন্ত্রের উপাসক; অগত্যা ভৃত্য লাঠির উপর প্রজ্বলিত বাতি লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। 'উ' বাবুর নির্দ্দেশক্রমে আমরা মাথা নীচু করিয়া দক্ষিণের পথে প্রবেশ করিলাম। মুহূর্ত্তকাল পরেই একটি গোলাকার কক্ষে পঁহুছিলাম। মাথার উপর খিলানকরা মাটির ছাদ, দুই দিকে দুইটি পথ ভিত কাটিয়া

চলিয়া গিয়াছে। যে পথে আসিয়াছি, সম্মুখের পথ দুইটি তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। আমরা দক্ষিণের পথেই চলিলাম। ফিরিবার সময় যাহাতে বিপথে গিয়া না পড়ি, তদুদ্দেশ্যে 'উ' বাবু সঞ্চিত লোষ্ট্র হইতে দুইটি লইয়া অগ্রপশ্চাৎ দুই দরজার মুখে রাখিয়া দিলেন। চাণক্য পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ দেখিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু 'উ' বাবুর বুদ্ধিমত্তায় লোষ্ট্রেরও সারবত্তা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইল।

যতই অগ্রসর হইতেছি, মাটির কুঠরীগুলি আয়তনে ততই ক্ষুদ্রতর এবং সম্মুখের পথ সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে। হঠাৎ দুঃসহ গ্রীষ্মবোধ হইল। সম্মুখে যে পথ দেখা গেল, হামাগুড়ি না দিয়া তাহাতে যাইবার উপায় নাই। এইখানেই আমরা রণে ভঙ্গ দিতেছিলাম, কিন্তু 'উ' বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। সরীসৃপের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে মাটি মাখিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র যে কক্ষে উপস্থিত হইলাম, তাহাতে কোন মতে বসিয়া থাকা চলে। কিন্তু ঘরটি একেবারে তুষার-শীতল। বোধ হইল, গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছি; বাহিরে জাহ্নবীজলসংস্পর্শেই ভিতরের হাওয়া এখন ঠাণ্ডা।

ভিত্তিগাত্রে আর কোন পথ দেখা গেল না। 'উ' বাবু গভীর অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলিলেন, পথ ছিল,—কোম্পানি বাহাদুর বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অগত্যা আমরা পাতালপুরীর প্রবেশমুখ হইতেই ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় দফা—গৈবীনাথ দর্শন। তখন উষার স্নিগ্ধ বাতাস ঘুমন্ত ভাগলপুর সহরকে মৃদু মৃদু বীজন করিয়া ফিরিতেছিল। আমরা হন্ হন্ করিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলাম।

ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি, মিনিটে মিনিটে ঘণ্টা বাজিতেছে। কোনটা পয়লা ঘণ্টা, কোনটা দোসরা ঘণ্টা; কোনটা গাড়ী আসিবার, কোনটা গাড়ী ছাড়িবার। এক একবার ঘণ্টা বাজে আর বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠে। মনে হয়, টিকিট বুঝি পাইব না, ট্রেণ বুঝি ফেল্ করিব, স্থানাভাবে বুঝি দাঁড়াইয়া যাইতে হইবে; হায়, এ সাত্ত্বিক দেশে তামসিক রেলগাড়ীর আমদানী কেন হইল!

ট্রেণ সুলতানগঞ্জ ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে

যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুস্থানী যাত্রীরা নামিতে লাগিল। তাহাদের পরিধান জীর্ণ মলিন বসন, কিন্তু প্রত্যেকের হাতে এক একটি উজ্জ্বল লোটা। ভবনদীর কূলে বসিয়া মানুষ চিরদিন সুখদুঃখরাশি আকণ্ঠ পান করিতেছে। এ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার ভৌতিক সাধন—লোটা। ওটা সংসারে নিত্য ব্যবহার্য্য হইলেও পৃথিবীর অনিত্যতাই সূচিত করে। তাই গার্হস্থ্যে যেমন, বানপ্রস্থেও তেমনি লোটা কম্বলসহ সন্ন্যাসীর সম্বল।

গঙ্গার এক বাহুর মধ্যে দ্বীপের উপর অনুচ্চ পাহাড়। তাহারই শিখরে গৈবীনাথের মন্দির। বলা বাহুল্য, যথাকালে একজন পাণ্ডার কবলে পড়িয়াছিলাম। ক্রোশখানেক পদব্রজে আসিয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলাম। "সেই ঘাটে খেয়া দেয় টেঙ্গর পাটনী!" পাণ্ডা হাঁক দিল, "এ—টেঙ্গর হো!" টেঙ্গর উত্তরে "আবছি" বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইল। পাটনীর ব্যাকরণে বর্ত্তমান কালের নাম ভবিষ্যৎ কাল, সুতরাং টেঙ্গর শীঘ্র আসিল না।

সবুরে মেওয়া ফলে। সবুরে আমরা পার হইব, বিচিত্র নয়। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর টেঙ্গরের কৃপা হইল, সে আমাদিগকে পার করিয়া দিল। কষ্টে সৃষ্টে পাহাড়ে উঠিয়া দেবদর্শন করিলাম। পাণ্ডা বলিল, এটা জহ্নু মুনির আশ্রম; কুন্তীনন্দন কর্ণ কর্ত্তৃক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। পুরাতত্ত্বের অনেক উপকরণ আশ্রমে অবশ্য আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কোন পুস্তক পড়িবার অবকাশ অদ্যাপি ঘটে নাই।

অনন্তদেবের আসন সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সম্মুখে গঙ্গার অনন্ত বারিরাশি অনন্ত সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। বর্ষাশেষে নদীর মধ্যে চড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে বালুকারাশি জ্বলিতেছে। সৈকতলগ্ন একখানি জাহাজ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পার্শ্বে গ্রামান্তের নিবাত নিষ্কম্প বনশ্রেণী; পশ্চাতে মেঘলেশশূন্য অসীম উজ্জ্বল আকাশ মাঠের সুদূর প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

মহম্মদপুর নামের উৎপত্তি।

—(:•:)—

যখন মোগল-গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায়, মোগলের বহুবর্ষের সাম্রাজ্যরচনা ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে. মুসলমান-রাজশক্তির উন্নত মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে হিন্দুগৌরব সীতারাম রায়ের বিজয়নিশান সগর্ব্বে বঙ্গভূমির সুনীল আকাশ স্পর্শ করিল। সীতারাম স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বদেশবাসীর প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার উন্নত-বেদিকার উপর এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর বা মামুদপুরে তাঁহার অতুলবৈভবশালী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়; আজ অতীতের সেই গৌরবঋদ্ধ নগরের লাবণ্য-রাশির নিদর্শন কিছুই নাই, কেবল কয়েকটা দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ. দুর্গ, জলাশয় প্রভৃতির চিহ্ন সেই অন্ধকারময় যুগের নীরব ঐতিহাসিকরূপে বিরাজ করিতেছে।

সীতারামের এই প্রাণপ্রিয় রাজধানী মহম্মদপুরের নাম লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ বিদ্যমান আছে। বঙ্গের সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ ইহার মীমাংসা করিয়া দিবেন এই আশায় আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড্ সাহেব তদ্‌রচিত "যশোহর বিবরণী" নামক গ্রন্থে মহম্মদপুর নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সীতারাম যে স্থানে স্বীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ-করিতে অভিলাষ করেন, কথায় মহম্মদ খাঁ নামধেয় একজন মুসলমান ফকির বাস করিতেন। সীতারাম তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ফকির সম্মত হন নাই। * * * * সীতারামের সানুর্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে তিনি গমন করিতে স্বীকৃত হন. কিন্তু গমনকালে তাঁহাকে বলিয়া যান যেন তাঁহারই নামে নগরের নামকরণ হয়, এইজন্য তিনি আপনার নগরের নাম মহম্মদপুর রাখেন।" (১)

---

(১) J. Westland's Report on the District of Jessore—History of Sitaram Ray. pp. 28.

কিন্তু উল্লিখিত জনপ্রবাদেরর কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। মহম্মদপুর সরকার মহম্মদাবাদের অন্তর্গত। মহম্মদাবাদের নাম মোগল-সম্রাট্ আকবর সাহের রাজত্বকালেও বর্ত্তমান ছিল টোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া ১০৬৯৩২৫৩ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। (২) তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে বঙ্গদেশে জিন্নতাবাদ (গৌড়), পূর্ণিয়া, তেজপুর, পিঞ্জারা (দিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (রংপুর), বারবকাবাদ বাজুহা, শ্রীহট্ট, সুবর্ণগ্রাম, ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম, আকবরনগর (ঢাকা), সেরিফাবাদ, মাদারণ, সপ্তগ্রাম, মহম্মদাবাদ (ভূষণা), খলিফিতাবাদ (যশোহর) ও বাকলা নামে ১৯টী সরকার স্থিরীকৃত হয়। (৩)

টোডরমল্লের রাজস্ববিবরণে উল্লিখিত মহম্মদাবাদ নাম কতদিনের তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, মহম্মদাবাদের অন্তর্গত মহম্মদপুর নামই বা কি প্রকারে আসিল তাহাও বিচার্য্য। এই দুইটী নামের মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রখ্যাতনামা লেখক রেণীসাহেবের মতে মহম্মদপুর নাম ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃত নাম মামুদপুর। বাঙ্গালার দ্বাদশ নৃপতি মামুদ শার নামে উক্তস্থানের নামকরণ হইয়াছে।(৪)

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শা সেরিফ মক্কির এক ভ্রাতার নাম মামুদ শা, তিনিই বঙ্গদেশের দ্বাদশ নৃপতি। তাঁহার নামে যশোহরের বিশেষ কোন স্থান মামুদপুর নামে অভিহিত হইয়াছিল তাহাও ভাবিবার বিষয়। আমরা রিয়াজগ্রন্থে দেখিতে পাই, আলাউদ্দিন স্বীয় বাসভূমি তোরমেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত চাঁদপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। হুসেন শাহের জন্মস্থান লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক বুকানন তাঁহার রঙ্গপুর-বিবরণীতে

---

(২) Gladwin's Ayeen Akbary.

(৩) Grant's Analysis of the Finances of Bengal.

(৪) "The ruins of Mohamadpur, called after Mahmud shah, the twelveth king of Bengal, wrongly designated by Mr. Westland Mahammadpur"—Mr. Rainey in the Calcutta Review—CXXV.

লিখিয়াছেন যে হুসেন শাহ রঙ্গপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘোড়াবিভাগের দেবনগরে জন্মগ্রহণ করেন।(৫) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রবন্ধে (সাহিত্য—ফাল্গুন, ১৩০৮) মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়ায় হুসেন শাহের জন্মস্থান এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন।

পরন্তু ঐতিহাসিক ব্লকম্যান সাহেব বলেন, হুসেন সাহের জন্মস্থান খুলনা জিলার অন্তর্গত ভৈরবতীরে অবস্থিত আলাইপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে। ব্লকম্যান্ আলাইপুর শব্দে আলাউদ্দিনের নগর (Alauddin's Town) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। (৬)

হুসেন শা প্রথমতঃ না কি ফতেহাবাদে (ফরিদপুর ও যশোহরের কিয়দংশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং এইস্থানেই ৮৯৯ হিজরীতে তন্নামাঙ্কিত মুদ্রা খোদিত হয় (Marsden's Pl. XXVIII. No. DCCLXXIX) হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শা খালিফতাবাদে (আধুনিক বাগেরহাটে) একটী টঙ্কশালা স্থাপিত করেন এবং এইস্থানেই তদীয় পিতার রাজ্যকালেই ৯২২ হিজরীতে স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করেন। রিয়াজের কাপজী অনুবাদক মৌলানা আবদুল সলাম, এম-এ মহাশয় ব্লকম্যানের মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, যশোহর জিলার কতিপয় পরগণার নামের সহিত হুসেন শা, (তদীয় ভ্রাতা) ইজুসুফ শা, এবং (হুসেন শার পুত্রদ্বয়) হাম্দি শা ও নসরৎ শা এই সকল নাম সংযুক্ত থাকায় ইহাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মহম্মদাবাদ (যশোহরের উত্তরাংশ ও ভূষণা) এবং মহম্মদশার নামে আখ্যাত হইয়াছে। (৭) প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের দ্বাদশ নৃপতির নাম মহম্মদ শা নহে—মামুদ শা (Stewart's History of Bengal দেখুন)। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই রেণীসাহেবের উক্তি বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে এই মামুদশার নাম হইতে মামুদপুর নামের উৎপত্তি হইতে পারে কি না তাহা বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন।

---

(৫) Martin's Eastern India Vol III. PP. 448.

(৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1873—PP. 228-9.

(৭) Abdul Salam's Translation of Riyaz-us-Salatin, PP. 128-9.

আর এক কথা, মহম্মদপুর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাতে মামুদ শার নাম নাই ; কিন্তু মহম্মদপুর ও মামুদপুর উভয় নামই যশোহর-সমাজে শুনিতে পাওয়া যায়। যশোহর জিলায় প্রবাদ আছে, মহম্মদ আলি নামে একজন ফকির সীতারামকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সীতারাম রাজ্যসংস্থাপনে অভিলাষী হইলে, তিনি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, হিন্দুরাজা হইয়া মুসলমান ফকিরের নামে নগরের নামকরণ করিলে মুসলমান প্রজাগণও সন্তুষ্ট হইবে, এইজন্য সীতারাম স্বীয় রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। ১২৯২ সালের 'বালক'পত্রে মাগুরা হইতে একজন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, সীতারাম দিল্লী হইতে সৈন্যসামন্তসহ যশোহরে আগমন করেন। একদিন মধুমতী নদীর উপকূল দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, একজন মুসলমান ফকির তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। সীতারাম তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু ফকির তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করেন, এইসূত্রে সীতারামের সহিত ফকিরের অনুচরবর্গের সহিত একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, তাহাতে সীতারাম পরাজিত হন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারই অনুগ্রহে বঙ্গের ভাবী গৌরবচূড়ামণি ভূষণার বিচারক খোদা কাজির নিকট হইতে কয়েক বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। প্রবাদ, সীতারাম প্রভু মহম্মদ আলির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত মহম্মদপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সকল কিম্বদন্তীর বিশেষ কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া জানি না। সীতারাম রায়ের মৃত্যুর পর যশোহরের জনসমাজে নানাপ্রকার অলীক প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল কাহিনী চলিয়া আসিতেছে, তাহা আর এক্ষণে অবধারণ করা যায় না।

মামুদ শার নাম হইতে মামুদপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে,—আমরা ইহারই পক্ষপাতী। বোধ হয় মুসলমান ভাষানভিজ্ঞ যশোহরবাসিগণ কর্তৃক উচ্চারণ-সমতা-দর্শনে মহম্মদপুর ও মামুদপুর উভয় নামই গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

সাথী।

(পিয়ের লোটির ফরাসী গল্প হইতে)

—:০:—

তোতোহান ও কাকাহান দুইজনে স্বামী ও স্ত্রী। তাহারাই উভয়েই বৃদ্ধ; তাহাদের বয়স যে কত তা' কেহই বলিতে পারে না। এমন কি নাগাসাকির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসীরাও তাহাদের আজন্মকাল বৃদ্ধই দেখিয়া আসিতেছে; তাহাদের যৌবন কেহ কখনও দেখে নাই!

কাকাহান পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তোতোহান অন্ধ। দুইজনে তাহারা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একটী ছোট কাঠের গাড়ী,—সেই গাড়ীর মধ্যে কাকাহান বসিয়া থাকিত; আর যষ্টি হস্তে অন্ধ তোতোহান নাগাসাকির রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীখানি টানিয়া লইয়া যাইত।

সকল জাপানী মেয়ের ন্যায় কাকাহানও ক্ষুদ্রাকৃতি। অনেকদিন এই ক্ষুদ্র গাড়ীখানিতে বসিয়া বসিয়া তাহার জরাজীর্ণ ভগ্নদেহ যেন তাহাতেই লীন হইয়া গিয়াছে। গাড়ীখানি তেমন সুনির্ম্মিত নয়, চাকার উপর সেখানি তেমন ভাল করিয়া বসানও হয় নাই, সুতরাং ভ্রমণকালে কাকাহানকে খুবই ঝাঁকানি খাইতে হইত। তবু তাহার বৃদ্ধ অন্ধ স্বামী কত সাবধানে, কত সন্তর্পণে চলিত,—পাছে তাহার ব্যথা লাগে, পাছে তাহার কষ্ট হয়! কাকাহানের কণ্ঠস্বরে চালিত হইয়া, তোতোহান তাহার চির-অন্ধকার পথ অতিক্রম করিত। তাহার হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে গাড়ী টানিবার দড়ি,—এইরূপে তাহাদের দিনগুলি অতিবাহিত হইত।

সন্ধ্যাবেলা কাহারও বাটীর দ্বারে বসিয়া দুইজনে কতই গল্প করিত, রাত্রিকালে কাকাহান তাহার মাথায় নীল রুমালখানি বাঁধিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে কত সুখের স্বপ্ন দেখিত!

দিন আসে, দিন যায়; তাহাদের কিন্তু অন্নের জন্য সেই একই চেষ্টা, একই কষ্ট, একই দুঃখ! সেই জীবনধারণের ব্যর্থপ্রয়াস, রৌদ্রে জরাজীর্ণতা বিস্তার, চিরদিন সেই একই টানাগাড়ীতে ভ্রমণ; সেই ধীরগতি, সেই ঘড় ঘড় শব্দ, সেই ঝাঁকানি, সেই শ্রান্তি, সেই চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ান, পথে পথে

মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে, উৎসবের দিনে সুদূর পল্লীর কাঠনির্ম্মিত দেবালয়ে,—এইরূপে তাহাদের দিনগুলি কাটিত।

সেই ক্ষুদ্র গাড়ীটীতে শুধু কাকাহান নয়, তাহাদের যা কিছু জিনিষ সমস্তই তাহার মধ্যে থাকিত। ভাত রাখিবার একখানা ভাঙ্গা থালা, একটা মাটীর ভাঁড়; আর একটী কাগজের লণ্ঠন, সেটী তাহারা রোজ সন্ধ্যাবেলায় জ্বালাইত।

* * * * *

একদিন সকালে মাঠের মাঝখানে মৃত্যুর তুহিন শীতল স্পর্শ কাকাহানের দেহের উপর পড়িল।

চারিদিকে ধানগাছের সারি মৃদু বাতাসে তরঙ্গায়িত; ঝিল্লির গানে পৃথিবী পূর্ণ। সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত পত্রপুষ্পশোভিত মধুর বসন্ত প্রভাত।

সেই শান্তিময় শ্যামল স্থানে কাকাহানের গাড়ী থামিয়াছিল। সেইখানেই তাহার শেষ বিশ্রাম। তোতোহান তাহাকে তীর্থদর্শনার্থ ক্বানন দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইতেছিল; পথে এই বিপদ।

কতিপয় কৃষক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা গাড়িটীর চারিদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার মধ্যে বৃদ্ধা তখনও মৃত্যুযন্ত্রণায় তাহার লোলচর্ম্ম জীর্ণহস্ত চালনা করিতেছিল। অনেকেই তাহার শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হইল। তাহারা প্রায় সকলেই স্নেহ করুণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্বাননের উৎসব দেখিতে যাইতেছিল।

বেচারা কাকাহান! তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কতই চেষ্টা! সুগন্ধ পত্র দিয়া তাহার গাত্রমর্দ্দন করা হইল, নদীর শীতল জল তাহার মস্তকে সিঞ্চিত হইল।

তোতোহান এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল; এখন নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। সে যে কি করিবে তা' সে ভাবিয়া পাইল না; তাহার অন্ধ হস্তচালন শুধু অন্যের কাযে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল।

বৃথা চেষ্টা! কাকাহানের পরমায়ু শেষ হইয়াছিল; দয়াশীল নিপ্পনীদের দয়া ও বৃদ্ধের প্রেমের বন্ধন কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

অন্তিম চেষ্টায় একবার সে হাতদুটী ছুঁড়িয়া ফেলিল, তার পর কাকাহানের জীর্ণ দেহ গাড়ীর বাহিরে হেলিয়া পড়িল।

তোতোহান শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল—তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষুদুটী জলে ভাসিয়া গেল।

সেই আবর্জ্জনাপূর্ণ বাক্স দেখিয়া কুলিদেরও ঘৃণা হইল। তাহারা মৃতদেহের সহিত সে সব জঞ্জালও কবরে নিক্ষেপ করিতে চাহিল। সেই গাত্রবস্ত্র, শতছিন্ন কাপড়খানি, ভাঙ্গাথালা ও লণ্ঠন সমস্ত ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল; তাহারা বলিল,—উহাতে মৃত্যুর বীজ আছে।

তখন তোতোহান তাহার চিরজীবনের সাথী, তাহার স্ত্রীর সকল স্মৃতিচিহ্ন লুপ্ত হয় দেখিয়া, শোকে নৈরাশ্যে পাগলের মত হইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্নভাবে সে বাক্সের উপর শুইয়া পড়িল। সে আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—কাহাকেও সে গুলিতে হাত দিতে দিবে না!

আর একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী সেইখানে আসিল, তোতোহানের অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সে বলিল, ফেলিও না, আমিই সব ধুইয়া দিব।

যে সব লোক জড় হইয়াছিল, তাহারা একে একে সেই ঝিল্লিমুখরিত শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে তাহাদের দুইজনকে রাখিয়া, দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেল। এদিকে সেই ভিখারিণী তোতোহানের সমস্ত জিনিষ ধুইয়া, রৌদ্রে বিছাইয়া দিল। সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত গুখান গুছান হইয়া গেল—আবার তোতোহান চলিল!

সে আপনাকে বাক্সে যুতিয়া আবার চলিল,—একটা কিছু টানিয়া লইয়া যাওয়া তাহার এতই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু তাহার সেই চিরজীবনের সাথী আর আজ নাই! তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র গাড়িটী—আরোহীহীন—শূন্য! যে তাহার বন্ধু, যে তাহার মন্ত্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার চক্ষুস্বরূপ ছিল,—সে আজ কোথায়? তাহারই সেই ছিন্ন কাঁথাখানি বুকে করিয়া প্রগাঢ়তর অন্ধকারে তোতোহান আশাহীন লক্ষ্যহীন পথে চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার, পশ্চাতে সেই শূন্য গাড়ী!

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন যশোহরের দ্বীপবিভাগ।

—:o:—

যশোহরের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীনত্বে তাহা বঙ্গদেশের অন্য কোনও স্থান হইতে ন্যূন নহে। যশোহরের প্রাচীনত্বের মূলান্বেষণ করিতে যাইয়া আমরা মহাভারতের যুগে উপনীত হই, তৎকালে এইস্থান প্রায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থানের নামের সহিত সাগর, দ্বীপ প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত থাকায় ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। ভাগীরথীর সন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগ, খুলনা যশোহর প্রভৃতি অঞ্চল যে এক সময়ে জলাকীর্ণ ছিল তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।(১)

মহাভারতে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহর্ষি কপিলের উল্লেখ আছে। খুলনার নিকটবর্ত্তী কপিলমুনি নামক স্থানে এখনও মুনি কপিলের উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর এক মেলা হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন এই স্থানেই ভারতোক্ত কপিল আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।(২) আমরাও একবার [পত্রান্তরে] এই কথার উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে স্বর্গীয় রাসবিহারী বসু মহাশয় এবং তাহার

---

(১) "The names of places near Bhagirathi ending in dwipa, island, danga, upland, daha, abyss, sagar, sea seem to indicate that a large body of water, flowed near them."—The Calcutta Review, 1846.

(২) বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত—১২১ পৃষ্ঠা।

চারিবৎসর পরে যশোহরের ইতিহাসে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতীয় আখ্যানের রূপকাংশ ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই,—মহাভারতের যুগে পৌণ্ড্রক কপিল আর্য্যসভ্যতার প্রদীপ করে লইয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাভারতের সমসময়ে আধুনিক যশোহরের অধিকাংশ স্থল সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, অতএব বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় বঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতা-বিস্তারের কালে আর্য্য-জাতির এক সম্প্রদায় পোতারোহণে আসিয়া সাগরমধ্যবর্ত্তী একটা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বর্ত্তমান কপিলমুনি যে বহু প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বাবু কপিল মুনিকে মহাভারতের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী না হইয়াও তাহা যে একটী প্রাচীন সমৃদ্ধি-শালী নগরের ধ্বংসাবশেষ তাহা নির্দ্দেশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। (৩)

রামায়ণের যুগে বঙ্গদেশে দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে, সুগ্রীব পূর্ব্বদেশগামী বানর সৈন্যগণকে সীতার অন্বেষণে সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপসমূহে যাইতে বলিয়াছিলেন। মহা-ভারতের বনপর্ব্বের ১১৪ অধ্যায়ে কথিত আছে যে, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া কৌশিকীতীর্থে স্নানাদি করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হন এবং তৎপরে কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম সে সময় মালদহের নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহা হইতে জানা যায় যে, রামায়ণে বর্ণিত দ্বীপসমূহ মহাভারতের যুগে দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে গঙ্গামধ্যস্থ বহুদ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপও এই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি-সম্বন্ধে 'দিগ্বিজয় প্রকাশিকা বিবৃতি'তে লিখিত আছে :—

ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা॥

---

(৩) "It is impossible to resist the conviction that Copilmuni and its neighbourhood contain the ruins of a large city whose splendours have long passed away."

J. A. S. B. 1870—Part I. PP. 238-9.

এই চন্দ্রদ্বীপরাজ্য প্রাচীন সমতটের অন্তর্গত। সমতটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় প্রথম সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে এবং তৎপরে হিউয়েন সিয়াঙ্গের সি-য়ু-কি (Si-yu-ki) নামক ভ্রমণবৃত্তান্তে। সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থিত বলিয়া উক্ত স্থান সমতট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সমতটের অবস্থিতি লইয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। কানিংহাম বর্ত্তমান যশোহরকেই সমতট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (৪) প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়াটার্সের মতে সমতট ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্ব ভাগস্থ জেলায় অবস্থিত ছিল। (৫) ফারগুসন্ ধ্বংসাবশিষ্ট যশোহরকে কর্ণ সুবর্ণের অংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই তিনটী মত সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন যশোহর সমতট তথা কর্ণসুবর্ণের অংশ লইয়া গঠিত।

বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভকালে যশোহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপনিচয়ে পূর্ণ ছিল এবং বহুসংখ্যক নদনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, যশোর নাম উর্দ্দু "জসর" শব্দ হইতে আসিয়াছে। উর্দ্দু জসর শব্দের অর্থ সেতু, যশোর বহুনদী পূর্ণ বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছে। (৬) কানিংহামও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—"The name of Jessore, or the "Bridge" shows the nature of the country which is so completely intersected by deep watercourses." (Ancient Geography) যশোর নাম কুলগ্রন্থাদিতে বিস্তর দৃষ্ট হয়, ক্কচিৎ যশোহর নামেরও উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ যশোর শব্দ হইতেই যশোহর শব্দ আসিয়া থাকিবে, নতুবা গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়াছিল বলিয়া যশোহর নাম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ সমুদ্রগর্ভে ছিল, সে সময় বঙ্গ বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ বুঝাইত। কালক্রমে ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ উপবঙ্গের নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন যশোহর এই উপবঙ্গের

---

(৪) Ancient Geography of India Vol I. PP. 502.

(৫) Watters On Yuan Chwang,

(৬) Gladwin's Ayeen-Akbary.

অন্তর্গত একটা স্থান (৭)। এক বিশাল দ্বীপ বিভাগ লইয়াই এই যশোহর গঠিত। বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে বকদ্বীপের উল্লেখ আছে। এই বকদ্বীপ পরে বাগড়ী নামে রূপান্তরিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, আধুনিক যশোহর বকদ্বীপের অংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে।(৮) একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি বকদ্বীপে বাস করিত তাহাদের নাম হইয়াছে বাগ্‌দি। (আর্য্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) যশোহর নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী।

বকদ্বীপ বিভিন্ন দ্বীপের সমষ্টিমাত্র। চন্দ্রদ্বীপও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। চন্দ্রদ্বীপরাজ্য পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত, উত্তরে ইছামতী, পশ্চিমে মধুমতী এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (মহাবংশাবলী)। 'দিগ্বিজয় প্রকাশিকাবিবৃতি'তে মেঘনা ও ধলেশ্বরের মধ্যস্থ ইদিলপুর হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত ভূভাগ চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তোডরমল্লের রাজস্ববিবরণে (Rent roll of 1582) দেখা যায়, যশোহরের পূর্ব্ব, পদ্মার পশ্চিমতীর, ব'দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণ এবং দক্ষিণে ভাটি পর্য্যন্ত এই স্থানের নাম বাক্‌লা সরকার। অতএব দেখা যাইতেছে প্রাচীন যশোহরের কিয়দংশ যে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধযুগে যে সময় মহারাজ অশোক চট্টলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবহমান স্রোত যশোহরের দ্বীপপুঞ্জকেও প্লাবিত করিয়াছিল।(৯) এই কালে যশোহরের দ্বীপভাগে বৌদ্ধ বিহারাদি নির্ম্মিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হুয়েন সিয়াঙ্গ সমতটের ৩০টী সঙ্ঘারাম ও শতাধিক হিন্দুদেবালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সমতটে ২০০০ বৌদ্ধশ্রমণ ও বহুসংখ্যক নিগ্রন্থ জৈন অবলোকন করেন। উক্ত স্থান সুনীল শস্যক্ষেত্রে ও মনোরম ফলপুষ্পে সুশোভিত ছিল। (১০)

---

(৭) ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজন পরিমিত্যোহ্ পবঙ্গো হি ভূমিপ।
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কানন সংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যাঃ নৃপ শার্দ্দূল বহুলাস্থ নদীযু চ।

(৮) বিশ্বকোষ—'যশোহর' শব্দ।

(৯) আর্য্যাবর্ত্ত—জ্যৈষ্ঠ—১৩২০ বঙ্গাব্দ।

(১০) Julien's Records of Western Countries—PP. 199.

বর্ত্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠমাসের 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রশ্ন তুলিয়াছেন,"এই ৩০টী বৌদ্ধসঙ্ঘারাম যশোহরের কোথায় ছিল ?" তদুত্তরে বক্তব্য এই. কালের কঠোর অত্যাচারে ভারত-বক্ষ হইতে কতশত মহতী কীর্ত্তি বসুমতীর গর্ভে চিরতরে সমাহিত হইয়া গিয়াছে—কালদৈত্যের এ ভীষণ প্রভাব উপেক্ষা করিয়া কোন দ্রব্যই অনাহতভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, এই মহাকালের প্রভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলিও ধ্বংসপুরে গমন করিয়াছে ; তাই আজ কেহই নিঃসংশয়-রূপে তাহাদের প্রতিষ্ঠানভূমি নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। আর, কেবল যশোহর লইয়াই সমতট নহে, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব হুয়েন সিয়াঙ্গ-বর্ণিত বৌদ্ধমঠগুলির অবশেষ যশোহর ব্যতীত সমতটের অপরাপর স্থানেও থাকিতে পারে। যশোহরের অন্তর্গত মঠবাড়ী, মহেশপুর, শৈলকূপা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শৈলকুপার উপকণ্ঠস্থ দেবতলায় এখনও একটী বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ লোকলোচনে পতিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু শিব-বাড়ীতে যেরূপ একটী বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, সেইরূপ আর একটা কয়েকবৎসর হইল যশোহরের অন্তর্গত বেড়গুণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

পালবংশের রাজত্বকালে যশোহরের কয়েকটী দ্বীপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বনগ্রাম, গৌরীপোতা, (গেঁড়েপোতা) যাদবপুর, আঁধারকোটা প্রভৃতি স্থানের নাম ছিল অন্ধ্রদ্বীপ। ইছামতীনদী হইতে মধুমতীনদী পর্য্যন্ত এবং ভৈরব নদের উত্তর এই অঞ্চল সূর্য্যদ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। সূর্য্য-দ্বীপে কৈবর্ত্তরাজগণ রাজত্ব করিতেন। মহেশপুর যোগীন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত, চিত্রানদীর উপকূলে ককদ্বীপ। (বিশ্বকোষ যশোহরশব্দ) পূর্ব্বে আধুনিক চৌগাছার নিকটে চিত্রা ও কুমার আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। চৌগাছার (যাহার প্রাচীন নাম চতুঃপলাশী) উল্লেখ গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকায় আছে ঃ—

"যশোরাখ্যে রমণীয়ক্ষেত্রে বঙ্গীয়ভাগে সুবিশালদেশে।
চতুঃপলাশীতি বরাজ গ্রামঃ চিত্রাকুমারোর্ম্মি বিধৌতপাদঃ॥"

বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী যাদবপুরে যাদব রায় নামে এক কৈবর্ত্তরাজার নাম শুনা যায়। তিনিই নাকি যাদবপুর স্থাপন করেন।

যোগীন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত মহেশপুর প্রভৃতি স্থান রাজা মহেশের অধিকার-ভুক্ত ছিল। তিনিও কৈবর্ত্তবংশোদ্ভব। রাজা মহেশ বল্লাল সেনের নৌবিভাগের অধ্যক্ষ ("মহানাবিক") ছিলেন এবং বল্লালতনয় লক্ষ্মণ সেনকে একরাত্রির মধ্যে নবদ্বীপ হইতে গৌড়ে আনিয়া দিয়া মহেশপুর অঞ্চল জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। মহেশের বংশধর—সূর্য্যরাজার গড় "সূর্য্যের বেড়' নামে এখনও মহেশপুরে বিরাজ করিতেছে। যশোহরের দ্বীপপুঞ্জে কৈবর্ত্ত-গণের প্রতাপ অনেকদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

আবাহন।

নির্ম্মল নব শান্ত প্রভাতে
পূর্ণ করিয়া সাজি ;
আনিয়াছি ওগো হৃদয়-দেবতা
পূজার অর্ঘ্য আজি !

বাসনা আমার সৌরভভরা
শুভ্র কুসুমভার ;
কামনা আমার হরিচন্দন
অর্ঘ্যের উপচার।

মন্ত্র আমার অস্ফুট শত
তোমার পুণ্যগান ;
পূজা-পদ্ধতি জানি না দেবতা,—
জানি শুধু তব ধ্যান।

কল্পনা মোর নবীন নীরোদ
শ্যামল দূর্ব্বাদল ;
গঙ্গার বারি আনি নাই আজি
এনেছি অশ্রুজল !

হৃদয় আজি গো পূজার শঙ্খ
মন্দিরতলে তব ;—
আরতির কালে ফুকারি ফুকারি
প্রাণের বার্ত্তা ক'ব।

বন্দনা আজি নীরব ভাষায়
গা'বে গৌরব-গাথা ;
চরণ-পরশে দূরে সরি যাবে
ক্ষুব্ধ শতেক ব্যথা।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

গল্পের প্লট্।

——:•:——

ক

প্রিয় সম্পাদক মশাই,—

আমি এই 'নাকে খৎ' দিতেছি, আর কখনও গল্প লিখিব না। গল্প লেখার খাতিরে সব ছাড়িতে পারি,—যায় প্রিয়ার চুম্বন আর আপিসের চাকুরি পর্য্যন্ত ! কিন্তু গল্প যদি লিখিতে হয়, তবে অন্ততঃ আমার বাঁচিয়া থাকাটা যে নেহাৎ দরকার, সেটা আপনি স্বীকার করেন, বোধ হয়।

কিন্তু আপনার অনুরোধ রাখিতে গিয়া আমার কি দশাখানা হইয়াছে, একবার তাহা শ্রবণ করুন।

কাল সন্ধ্যার কিছু আগে, আমি আমার বারান্দায় 'ইজি-চেয়ারে' চুপ্টি করিয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময়ে আপনার তাগিদ-পত্র আসিল।

চিঠিখানা পড়িয়া একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিলাম। তারপর চেয়ারের উপরে 'আড়' হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি লেখা যায় ?

ভাবিলাম, একটা নতুন ধরণের প্রেমের গল্প লিখিয়া ফেলা যাক্। তার নায়ক হইবে রাজার ছেলে আর নায়িকা চাষার মেয়ে। নায়কের নাম পুষ্পকুমার ; নায়িকা, কুমারী পুঁটুরাণী। নায়কের বয়স উনিশ ; নায়িকার সাত।

কলম আর কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলাম।

"পুঁটুমণি, পথের উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া, বস্ত্রশূন্য কোমরে লাল সুতার একটী 'ঘুন্সি' পরিয়া 'হাপুস্' চোখে কাঁদিতেছিল,—এমন সময়ে, পুষ্পকুমার সেই পথে ! মদন ঠাকুরের খেলাটা দেখ একবার !

সেই সপ্তমবর্ষীয়া, ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দিগম্বরী পুঁটুরাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া, রাজপুত্র একেবারে মোহিত !

পুষ্পকুমার মনে মনে তারিফ্ করিয়া স্বগতঃ বলিলেন, "অহো, এ সামান্য চোখের জল নয়—একি অপূর্ব্ব শোভা ! যেন কালো কুচ্‌কুচে কষ্টিপাথরের

উপর দিয়ে সাদা সাদা জুঁই ফুল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়্‌ছে—আহা, তোফা! খাসা!

(প্রকাশ্যে) ওঃ বরাননে, প্রকাশ ক'রে বল, তোমার হাস্যে অরুচি কি হেতু?"

পুঁটুরাণী প্রথমে নাক্ ঝাড়িল। তারপর, মুখব্যাদান করিয়া রাজপুত্রকে আড়ে আড়ে দেখিতে লাগিল। দেখিয়া, বোধ হয় মুগ্ধ হইল। ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, "কাঁদ্‌ব না? মা কেন মারে?"

রাজপুত্র আস্তে আস্তে পুঁটুরাণীর নাকে সুড়্‌সুড়ি দিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া সুধাইলেন, "তুমি কি করেছিলে? পয়সা চুরি?"

পুঁটু। (ঘাড় নাড়িয়া সকৌতুকে) দূর—তাই বুঝি?

রাজপুত্র। তবে?

পুঁটু। (গম্ভীর ভাবে) আমি তেঁতুলের আচার চুরি ক'রে খেয়েচি কি না,—তাই।

রাজপুত্র। (সক্রোধে, অসি নিষ্কাষণ করিয়া) কি সামান্য দোষে তোমায় প্রহার করেছে? অবলার কোমল বক্ষে ব্যথা দিয়েছে? কোথায় সে পাপীয়সী, আমি তাকে দেখ্‌ব। (রাজপুত্র বন্ বন্ করিয়া অসি ঘুরাইতে লাগিলেন)

পুঁটুরাণী আবার 'দু-পাটি দাঁত' বাহির করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া, হঠাৎ মনে হইল, প্লট্‌টা তেমনতর জম্‌কাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। কলমটা বিরাগভরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, হতাশভাবে আবার চেয়ারের উপরে শুইয়া পড়িলাম।

খ

শুইয়া আছি। আমার সম্মুখে দিয়া গাঁয়ের সরু পথটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'না-জানি-কোথায়-কোনদেশে' চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ দেখিলাম, পথের উপরে দু'জন লোক! একজন পুরুষ, আর একজন রমণী।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পথে 'শেয়াল-কুকুর' কেউ কোথাও নাই। এমন সময়ে, এখানে এরা দুজনে কে?

ও হরি, এযে আমার প্রজা হানিফ সেখের তৃতীয়পক্ষের বিবি! আর ও লোকটা কে? ভাল করিয়া তাকে দেখিলাম, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না!

হানিফের স্ত্রীর ব্যবহারটাও কেমন যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিতেছে, আর সেই লোকটাকে চুপি চুপি কি বলিতেছে। ব্যাপার কি?

উঠিলাম! আস্তে আস্তে নামিয়া, গাছের আড়ালে আড়ালে তাদের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম। এরা যদি প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, তাহা হইলে আমায় আর প্লটের জন্য ভাবিতে হয় না। আর সে প্লট্‌টাও কি কম চমৎকার হইবে? এক্কেবারে বস্তুতন্ত্র! ওঃ!

কিন্তু, আমি সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে শুনিলাম, হানিফের বিবি বলিতেছে, "হেথা না,—চল ঘরের মইদ্দে চল।"

পুরুষটা বলিল. "কেনে?"

হানিফের বিবি বলিল "কত্তা যদি দেখ্‌তি পায়, তাহলে এহুনি কুপিত হয়ে কুইমারের চাকৃডার মুতন কুদিতে থাক্‌বে।"

এত যখন লুকোচুরি, তখন ব্যাপারটা থার্ডক্লাশের ছেলের কাছে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়' যেমন,—তেমনি সাফ্ বোঝা যাইতেছে! আচ্ছা বাবা, যেখানেই যাও, আমিও সহজে ছোড়নেওয়ালা নই, আড়ালে 'ঘাপ্‌টি মারিয়া' থাকিয়া, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, তবে এখান হইতে নড়িব।

তাহারা ঘরের ভিতরে ঢুকিল। আমিও আস্তে আস্তে দাওয়ার উপরে উঠিয়া জানালায় কান পাতিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একটু পরেই ঘরের ভিতর হইতে পুরুষ-কণ্ঠে শুনিলাম—

"হাঁরে আবাগী. তুই কি এক্কেবারে মইর‍্যা আচিস্? একবার খবরডাও লইতে পারিস না?"

বুঝিলাম, প্রেমিক বিরহ-পীড়ায় শীর্ণ এবং প্রণয়টাও কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের মত জমাট! গল্পের সুন্দর প্লট্!

তখনই হানিফের বিশ্ব-প্রেমিকা বিবির গলা শুনিতে পাইলাম। তার কথাগুলা আমি নিরাকার রসগোল্লার মত 'গিলিতে' লাগিলাম।

হানিফের বউ বলিল, "গাইল দাও কেনে? কেমনতর সুসোয়ামী

জান না, মুই যে দোজকে পড়ে আচি! মোর শুইয়ে বইসে সোয়াস্তি নাই, দিন রাইতে চখে নিন্‌য়া নাই, উঠতি বস্‌তি কাটা! আবার আয়ে আরে তোমাদের কত কথাই বলে!"

পুরুষটা কহিল "তোর হা ধরে বইলে যাচ্চি, বাপ্-মাও থাইক্‌তে তুই বুড়ো-বুড়ী দুটোকে আর দুস্ক দিস্ নে, মইদ্দে মইদ্দে খবরডা নিস্। কাল বিয়ানে কিছু মিডা আর বাত্তি কাডল (মিষ্টান্ন আর পাকা কাঁঠাল) কিইনে পাইঠে দিব,—যদি পায়া হানিপ মিঞা নরম হৈয়া যায়।"

তাই ত! কাথাবার্ত্তগুলা ঠিক প্রেমশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না!

এমন সময়ে শুনিলাম, হানিফের বিবি বলিতেছে "উঃ! আশমানে ম্যাঘ্ উঠ্‌চে, গতিকডা আইজ ভাল না চাচা!"

চাচা? আরে দুর্! রে অপ্রেমিকা! এই শুনিবার জন্যই কি এতক্ষণ আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি? আরে ছিঃ! আরে ছিঃ! কি নীরস, 'বিট্‌কেল্' সম্বোধন! হায়, আমার 'গল্প,—ওরে আমার 'প্লট্'! এক পলকে রোমান্সের সমস্ত গন্ধটুকু 'ন্যাপ্‌থলিং'এর মত উবিয়া গেল!

রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে ফিরিয়া দাওয়া হইতে নামিতে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, খানিক তফাতে একটা লোক!

গ

তখন, ভরা সাঁঝ। অন্ধকার বেশ ঘোরালো। আকাশে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ নিকষ-কালো মেঘমালা। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও সুরু হইয়াছে।

কি আপদ! লোকটা যে এদিকেই আসে! তাইত, হানিফ নয়ত! আমাকে এ অবস্থায় এখানে দেখিলে কি মনে করিবে? দূর হোক্, কপালে আজ বিস্তর দুঃখ আছে দেখিতেছি।

একলাফে পাঁচিলের পাশে, কচু ঝোঁপের তলায় গিয়া গুড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িলাম

শুনিলাম, লোকটা আপন মনে গান গায়িতে গায়িতে আসিতেছে:—

শোঁঠের সনে প্রোণয় করা
আর ভাল লাগে না (সই)।

শোঁঠের সনে প্রোণয় করা
হাটু জলে ডুইবে মরা
হাবুডুবু কইরে মরি
হা ধইরে তুলে না (প্রাণ)!

তারপর, হঠাৎ গান থামিয়া গেল এবং গর্জ্জন হইল, "ওরে মাগী! দরজা বন্ধ কইরে ঘরের মইদ্দে কি হইছে রে!"

হানিফই বটে!

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ভিতরে সব চুপ্‌চাপ। কলে-পড়া ইন্দুরের মত, ঘরের ভিতরে চাচাজীর সঙ্গীন অবস্থা স্মরণ করিয়া, আমার সারা মন খুসি হইয়া উঠিল। ঐ রাস্কেল চাচার জন্যই ত' আমার এই দশা! পাজী ব্যাটা!

হানিফ দ্বারে পদাঘাত করিয়া গরম হইয়া বলিল, "ও আবাগীর বেটী! শুন্‌তি পাইছ না? কারে লয়্যা মজা মার্‌তিছ?"

এবার হানিফের বিবি উত্তর দিল। ঘুমজড়ানো গলায় অস্পষ্টস্বরে বলিল, "মিন্সের রকমডা কি? রাইন্ধে, খাইয়্যে এক কুল্‌কি নিন্‌রারও যো নেই! ধন্যি সোয়ামী!"

তারপর, দরজা খুলিয়া গেল। সন্দিগ্ধ হানিফ বেগে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

উঃ! রমণী কি ছলনাময়ী! কিন্তু মিথ্যাবাদিনি, তোমার চাচা আজ আপনাকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিবে না,—হানিফের যে রকম 'গোঁসা' দেখিতেছি, আজ সে চাচাকে নিশ্চয় সংহার করিবে। আগ্রহে আমি উঠিতে পারিলাম না; বাড়ীর ভিতরে পৃষ্ঠসঙ্গে মুষ্টিযোগের শব্দ শুনিবার জন্য আমি দু' কান খাড়া করিয়া 'উবু' হইয়া বসিয়া রহিলাম। এমন সময়ে সূর্য্যালোকে বজ্রাঘাতের মত, অকস্মাৎ প্রাচীরের উপর হইতে একটা ঠিক 'পাকা' 'দশমণি' বোঝা একেবারে আমার ঘাড়ের উপরে বিনা নোটীশে লাফাইয়া পড়িল। "ওরে বাবারে, মরে গেছি রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া আমি সটান ভুমিসাৎ হইলাম। আমার ঘাড়ের বোঝাটাও আতঙ্কে 'আঁউ মাউ' করিয়া উঠিয়া দশহাত তফাতে ঠিকরিয়া পড়িল। তারপর, চোখের

পলক না ফেলিতে যেমন আকস্মিকভাবে আসিয়াছিল, তেমনি আকস্মিক ভাবে উঠিয়া সিধা দৌড় দিল।

আমি সেই কাদার উপরে মিনিট দু'এক, একান্ত করুণভাবে 'চিৎপটাং' হইয়া শুইয়া শুইয়া, দু'চোখ বুজিয়া মানস-নেত্রে, অতি অপূর্ব্ব সরিষা ফুলের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে ম্রিয়মানভাবে উঠিয়া ঘাড়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বুঝিলাম, মস্তকটি আমার পিতৃপুণ্যে 'বাস্তভিটা' হইতে খসিয়া পড়ে নাই। তখন একটু আশ্বস্ত হইয়া, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া অনুমান করিলাম, পলায়ন-পর চাচা, আপনা বাঁচাইতে গিয়াই আমার ঘাড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সত্য আবিষ্কারপূর্ব্বক, আমি সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব গরম হইয়া, চাচাজীকে খুব শক্ত ও নূতন রকমের একটা গালি দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে, স্তম্ভিত-নেত্রে দেখিতে পাইলাম, বাম হাতে কেরোসিনের ডিবা ও ডান হাতে প্রকাণ্ড এক বংশদণ্ড লইয়া হানিফ মিঞা বাহিরে আসিয়া 'বাজখাঁই' গলায় হাঁকল, "কোন্ সুমুন্দী রে! ও হালার পুত!"

তাহার লাঠির বহর দেখিয়াই আমার পেটের 'পিলে' চমকাইয়া গেল। আমি চট্‌পট্ উঠিয়া 'চোঁচা' দৌড় দিলাম। দৌড় ব'লে দৌড়, ঠিক করা গেল, বাড়ীতে না পৌঁছিয়া কোন মতেই এ দৌড় থামানো হইবে না!

হানিফ, অবশ্য আমার পিছনে পিছনে খানিক ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আমার দৌড়িবার 'সতেজ উৎসাহ' দেখিয়া সহসা সে একান্ত দমিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

* * * * *

প্রিয় এডিটর,

আমার ঘাড়ের অবস্থা বিষম শোচনীয়। এখানে তার্পিন তৈল মিলে না,—কিছু কিনিয়া ফেরৎ ডাকে পাঠাইবেন। কিঞ্চিৎ মালিশ আবশ্যক।

অতএব, এই রহিল আপনার দোয়াত, আর এই রহিল আপনার কলম, আমি 'নাকে খৎ' দিয়া বলিতেছি, আমার গল্প লেখায় আজ হইতে 'ইস্তফা'! ইতি * শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

* পুঃ।—কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিবেন না; সম্প্রতি আমি 'তাম্র-শাসন' লইয়া অল্পবিস্তর নাড়া-চাড়া করিতেছি। গবেষণার ফল আপনার ভাগে পড়িবে তাতে পাঠক হয় না বটে; কিন্তু কাগজের নাম হয়।

শিশু।

—ঃ০ঃ—

স্নেহময়ী জননীর স্নেহমাখা কোলে
শিশু সে স্বর্গের ফুল—চাঁদের জ্যোছনা—
নিরখি যাহার পানে বিশ্ব-চিত্ত ভোলে
ঘুচে যায় মুহূর্ত্তেকে সকল বেদনা!

কিংবা সে যে নন্দনের বিহঙ্গ-সঙ্গীত
সিন্ধু-যাত্রী তটিনীর মধুর কল্লোল,
ক্ষণে ক্ষণে হয় বুঝি অমিয় বর্ষিত
চৌদিকে উথলি উঠে আনন্দ-হিল্লোল!

সরল পবিত্র অতি স্বভাব-সুন্দর
সংসার-মরুর বক্ষে স্নিগ্ধ 'ওয়েসিস',
প্রেম-যজ্ঞে পুণ্য-চরু, নিধি শ্রেষ্ঠতর,
মর্ত্ত্য-জনে বিধাতার অপূর্ব্ব আশিস্!

অর্দ্ধস্ফুট ভাষা ওই—ওই দিব্য হাসি—
জগতের মুগ্ধ প্রাণে বাজাইছে বাঁশী!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সুখ ও দুঃখ।

—ঃ০ঃ—

কেবলি আলোক চাও, আঁধারেতে ধাঁধা খাও;
ছিছি, ভাই, একি তব মূঢ় আচরণ?
পেলে সুধু দিবা-বিভা কুসুমের সুখ কিবা?
আলো-ছায়া দুই—তা'র হয় প্রয়োজন।

সুখ-দুঃখ দুই চাই,—হিতব্রত দুই ভাই ;
অশ্রুর মরম হ'তে হাসির জনম।
কাঁদ তুমি প্রাণ খুলে, সব ব্যথা যা'বে ভুলে ;
চোখে মুখে দেখা দিবে সহাস সরম।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম।

—:০:—

জোরোয়াস্তার বা প্রাচীন পারস্য ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রীতি-নীতির সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ দেবতাদিগের নামে জেন্দ্-আবেস্তার সহিত বেদের একত্ব। বেদোক্ত "দেব" ও "অসুর" জেন্দ-আবেস্তার "দিব" ও "অহুর"। কেবল বেদে ও সমগ্র প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে দেব-নাম স্বর্গীয় জীব-নির্ব্বাচক। হিন্দুর নিত্য পূজ্য সামগ্রীর নাম ; আর জেন্দ-আবেস্তার দিব—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ইত্যাদি। প্রাচীন পারস্যবাসীর নিকট তাহার ধর্ম্ম "বিদয়েবো" বা দেব-বিরুদ্ধ এবং "বিদয়েবে-দতা" বা দেব-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত। তাহার নিকট দেবতা মন্দ, অপবিত্র, মৃত্যুর উৎপাদক এবং সদা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির গৃহ, ক্ষেত্র, বৃক্ষাদি ধ্বংসকারী মাত্র। ইঁহাদের ধর্ম্মমতে যত মল ও ক্লেদপূর্ণ স্থান বিশেষতঃ শ্মশান দেবের নিকট অতি পবিত্র।

জোরোয়াস্তার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম
১। দেবতার নাম।

অসুর আবেস্তার "অহুর", পারসীগণের দেবনামের আদি এবং জোরোয়াস্তার ধর্ম্মই "অহুর ধর্ম্ম" বলিয়া কীর্ত্তিত। কিন্তু হিন্দুর মধ্যে অসুর দেবগণের চিরশত্রু, পিশাচ। ঋগ্বেদসংহিতার বহু পুরাতন অংশগুলি পাঠে আমরা জ্ঞাত হই যে, জেন্দ-আবেস্তার মত অসুর শব্দও আর্য্যহিন্দুঋষিবৃন্দ দেব-অর্থেই গ্রহণ করিতেন।

ঋগ্বেদে আছে,—

"হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞে হবি প্রদান করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে অসুর! হে রাজন্!

আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।"

(ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল-২৪সূ-১৪ ঋ)

"গভীর কম্পনবিশিষ্ট অসুর, সূর্য্যরশ্মি অন্তরীক্ষাদি তিনলোক ব্যাপ্ত করিয়াছে। এক্ষণে সূর্য্য কোথায় কে জানে? কোন্ দিব্য লোকে তাঁহার রশ্মি বিস্তৃত হইয়াছে।"

(ঋগ্বেদ ১ম—৩৫—৭)

এইরূপ হিন্দুর প্রধান প্রধান দেবতা "শত্রুবিজয়ী, নিজবল-দৃঢ়মনা দীপ্তিমান্ মহৎ ইন্দ্র" (১ম।৫৪।৩), "হিরণ্যহস্ত, সুনেতা, হর্ষদাতা, সবিতা (১।৩৫।১১), অগ্নি (৪ম।৫৩।১), রুদ্র (৫ম।৪১।৩) প্রভৃতির আখ্যা অসুর।*

ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে অন্য অর্থে অসুর শব্দ কেবল দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বশিষ্ঠ বলিতেছেন ;—

"হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চ্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, এরূপ নাশ করিয়াছ।" †

ইহাতে কেবল দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরগণের পরাজয়-কাহিনী বিবৃত আছে ; কিন্তু ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে, অথর্ব্ববেদে ঋষিবর্গ কর্ত্তৃক অসুরগণের কৌশল ভঙ্গ ও তাহাদের দমন-কাহিনী শ্রুত হয়।*

ব্রাহ্মণে দেবগণকে অসুরবর্গের সহিত সদা যুদ্ধে নিযুক্ত দেখা যায়। আর

---

* ঋগ্বেদের মাত্র প্রথম মণ্ডলের নিম্নলিখিত স্থানে বিভিন্নদেবকে অসুর বলা হইয়াছে :—
ইন্দ্র—৫৪।৩, ১৭৪।১ ; ঋত্বিক্‌গণ—১৪৮।৬ ; বরুণ—২৪।১৪ ;
সূর্য্যরশ্মি—৩৫।৭ ; সবিতা ৩৫।১০ ; মরুদ্‌গণ—৬৪।২ ;
ত্বষ্টা—১১০।৩ ; রুদ্র—১২২।১ ; ভাবয়ব্য রাজা—১২৬।২ ;
স্বর্গলোক—১৩১।১ ; মিত্র ও বরুণ—১৫১।৪

অন্যান্য মণ্ডলেরও বহুস্থানে অসুর শব্দের দেব অর্থে প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে উল্লেখ করা হইল না।

† ঋগ্বেদ সংহিতা—৭ম মণ্ডল—৯৯ সূক্ত—৫ম ঋক্।

* ঋগ্বেদ—৪।২৩।৫ ; ৬।৭।২।

দেখা যায়, অস্থরগণ হিন্দুদেবতার শত্রু, হিন্দু ঋষির যজ্ঞবিঘ্নকারী, পিশাচ। তাহাদিগকে পরাজিত করিতে দেবভাণ্ডের প্রায় সমস্ত বুদ্ধি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য-বর্ণিত অস্থরই পারসীগণের দেবতা।

শুক্লযজুর্ব্বেদোক্ত ছন্দোমধ্যে "গায়ত্রী আস্থরী", "উষ্ণীহ আস্থরী", "পঙ্‌ক্তি আস্থরী," প্রভৃতি সাতটী আস্থরী ছন্দঃ দৃষ্ট হয়। † প্রাচীন ঋগ্বেদে অজ্ঞাত এই আস্থরী ছন্দঃ জেন্দ্‌ আবেস্তার গাথা-সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গায়ত্রী আস্থরী পঞ্চদশনদী এবং দুই ছন্দ, আবেস্তার "অহুন ভইতি গাথা" মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উষ্ণীহ আস্থরী চতুর্দ্দশপদী আবেস্তার "বোহুক্ষথ্র গাথার" মত। পঙ্‌ক্তি আস্থরী একাদশনদী এবং ইহা "উষ্ট বইতি" ও স্পেণ্ডামইন্যু" গাথার মধ্যে প্রাপ্তব্য। এইরূপ ছন্দঃমিলন কি আকস্মিক ?

২। ছন্দঃ মিল।

হিন্দুর কতিপয় দেবতা জেন্দ-আবেস্তার হয় অস্থর না হয় দেবতা বলিয়া বর্ণিত আছে। এখন তাহাই দর্শিত হইবে।

বৈদিক সময়ে হিন্দুর প্রধান ঈশ্বর বজ্রবাহী ; বল ও তেজঃদেবতা ইন্দ্র ; যাহার উদ্দেশে হিন্দু ঋষি সোমরস প্রদান করিতেন, তাঁহার কথা আবেস্তাতে বর্ণিত আছে। এই দেবতা আবেস্তাতে "আঙ্গরেমইন্যুসে"র (অহ্রমন) নিম্নপদেই অধিষ্ঠিত। অনেক সময় ইঁহাকে "দেইবা নাম দেইবো" (দেবতার দেবতা) অস্থরের অস্থর বলা হইয়াছে।

৩। দেবতা।

ইন্দ্রের পরই "সৌর্ব্ব দেব" (সর্ব্বদেব) ইহা শিবের এক নাম "সর্ব্ব" হইতে উদ্ভূত। আবেস্তার "নাওনাহইথ্যাদেব"ই বেদোক্ত অশ্বিনীকুমার নাসত্য।

কতকগুলি—বেদোক্ত দেবতা জেন্দ আবেস্তাতেই "ওয়াজাতি" বা দেবতা ভাবে বর্ণিত। যেমন,—"মিথ্র" ইহার সংস্কৃত "মিত্র", বেদসঙ্গীতে সর্ব্বত্র ইনি জগৎস্বামী স্বর্গপতি বরুণ দেবের সহিত পূজ্য ; কিন্তু—জেন্দ্‌

---

† See A, Weber's white Jajurveda Vol. I., P. IX.

আবেস্তায় তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার প্রাচীন সঙ্গীর সহিত বিচ্ছিন্ন। কেবল মাত্র ঋগ্বেদের একটী সূক্তে তিনি সূর্য্যরূপে কথিত।

"মিত্র সকল মানবকে কার্য্যে নিয়োজিত করেন; মিত্র স্বর্গ ও ভূমি রক্ষা করিতেছেন; মিত্র জাতিবর্গোপরি অনিমিলিত নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। মিত্রকে হবিসহ আহুতি প্রদান কর।"

"হে মিত্র! যে মানব তোমার নিয়ম-পালনার্থ আপনাকে কষ্ট দেয় হে আদিত্য! তাঁহার প্রাচুর্য্য হউক; দূরে বা নিকট হইতে যেন তাঁহার উপর কোন বিপদ পতিত না হয়।" *

আর একটী বৈদিক দেবতা "আর্য্যমান" (১।১৩৬।২) জেন্দ্ আবেস্তার "আইয়ার‍্যমান"। আর্য্যমান দ্ব্যর্থবোধক, প্রথম অর্থে মিত্র; ইহা আবেস্তায় মিত্রভাবেই উল্লিখিত এবং দ্বিতীয় অর্থে কোন বিবাহপতি দেবতা। ভাগবত গীতায় ইনি "পিতর শ্রেষ্ঠ"।

বেদের "ভগ" ও আবেস্তার "ভঁগ" একই, 'ভগ' অর্থ ঈশ্বর। * বৈদিক "ভগ" ভাগ্যগঠনকারী দেবতা (৭ম।৪১।২)।

"আমরা প্রাতে সেই জয়শীল উগ্র আদিত্য, সেই জতধারক সর্ব্ব দ্রব্য-বণ্টনকারী ভগকে প্রার্থনা করিব। দীন, রোগী, নৃপতি সকলেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, বল,—"আমাদের অংশ আমাদিগকে দান কর।"

ঋগ্বেদে স্ত্রীদেবতা "অরামতি" অর্থে (১) সেবা, বশ্যতা, (৭ম।১।৬; ৩৪।২১) (২) পৃথিবী (১০ম।৯২।৪,৫)। ইহা আবেস্তার স্বর্গীয় দূতশ্রেষ্ঠ—"অরামাইতি" এবং উহাও ঐরূপ দ্ব্যর্থবোধক।

"গ্না" আর একটী স্ত্রী দেবতা। ইঁহার নাম ঋগ্বেদের কতিপয় মাত্র সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় অগ্নিকে আহুতি-দত্ত ঘৃতের সহিত

* ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল, ৫৯ সূক্ত।

* Slavonic, Russian প্রভৃতি ভাষায় "bog"ই ঈশ্বরের সাধারণ নাম। প্রাচীন Slavonic Mythol gyতে "biel bog" হইল শ্বেত ঈশ্বর ও "ezery bog" কৃষ্ণ দেবতা।

আগমন করেন (৭ম।১।৬)। সুমধুর সোমপানে উল্লাসিত হইবার জন্য দেবগন্তব্য পথ দ্বারা অগ্নিদেব কর্তৃক আনীত হন (৫ম.৪৩।৬)। এই "গ্না" জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের "গেন" অর্থাৎ স্ত্রীদেব। †

বৈদিকদেব বায়ু যিনি, "প্রাতর্যজ্ঞের সহিত সর্ব্বপ্রথম সোমরস পান করিতেন, তিনি জেন্দ আবেস্তায় "সর্ব্বস্থানভ্রমণক্ষম "বায়ু" নামেই খ্যাত।

"বৃত্রহা" বৈদিক গ্রন্থে ইন্দ্র, কিন্তু জোরোয়াস্তার ধর্ম্মবর্ণিত—"ভিরে থ্রাঘ্ন (বেয়্হাম) ও ইন্দ্র ভাবেই পূজিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আবেস্তায় ইন্দ্র অসুর, কিন্তু তাঁহারই উপনামধারী "ভিরে থ্রাঘ্ন" দেবতা। ঋগ্বেদ-পাঠে আমাদের এ ধারণা দূরীভূত হইবে। ইন্দ্রের পূর্ব্বে "বৃত্রহা" আখ্যা বজ্রবাহী, দানবহন্তা ইন্দ্রবৎ পূজিত "ত্রিত"কে প্রদত্ত হইত। এই "ত্রিত" ইরাণীয় গ্রন্থে "থ্রেইতাওনা" (ফ্রছন) নামে কথিত।

৪। ত্রয়স্ত্রিংশ দেব।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হিন্দুর "ত্রয়স্ত্রিংশ দেব" যথা,—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, এক প্রজাপতি, এবং এক বসট্কার জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম-ঘোষিত "মহ্দা-" স্থাপিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য-সংরক্ষক ত্রয়স্ত্রিংশঃ-"রতাস্" বা প্রধান একই। এই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবই বোধ হয় পঞ্চ নদীর তীরে ভারতগামী আর্য্যদল-বিচ্ছিন্ন ইরাণ-দেশবাসী আর্য্যের "ত্রয়স্ত্রিংশ রতাস্।"

৫। ধর্ম্মনায়কবর্গের নাম ও তাঁহাদের উপাখ্যান।

শুধু যে বেদ ও আবেস্তায় দেবাদি এক তাহা নহে, হিন্দুর ধর্ম্মনায়ক, প্রভৃতির সহিতও তাহাদের সাদৃশ্য বর্ত্তমান। জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের—"যিমক্ষায়েস্তা" (যম সেদ্) ও হিন্দুর "যমরাজ" অভিন্ন। বংশ নামও উভয়ের এক। হিন্দুর "বিবস্বত"-পুত্র "বৈবস্বত", আবেস্তার' "বিবংভাট"-পুত্র "বিবানহাও"। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে ;—"নবসংগ্রাহক যমরাজ পাতাল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি প্রথমে একটী বিশ্রাম স্থান স্থির করিলেন, সেস্থান হইতে কেহই তাহার অধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, এই পথ দিয়া পিতৃ-পিতামহগণ গমন করিয়াছেন, পুত্রগণও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইবে।"

† Greekগণ ইঁহাকে gyne বলেন।

জেন্দ আয়েস্তাতে "যিম" তাঁহার চতুর্দ্দিকে দলে দলে নর ও পশু একত্র করিয়া পৃথিবীকে তদ্দ্বারা পূর্ণ করিলেন এবং তাহার রাজ্যে শৈত্যের প্রভাব শেষ হইলে, তিনি কতিপয় সংসৃষ্ট জীবসহ এক উত্তম স্থানে গমন করতঃ অনির্ব্বচনীয় সুখ উপভোগ করেন।"

জেন্দ্ আবেস্তার "থিত থে্ইতাওনা" (ক্রছন্) "সাম" বংশোদ্ভূত এবং "অত্রিমান"-সৃষ্ট। তিনি রোগাদির প্রথম চিকিৎসক। বেদেও "ত্রিত" সম্বন্ধে ঐরূপই শ্রুত হয়। অথর্ব্ব বেদে কথিত আছে (৬ম।১১৩।১।) "দেবগণ যেমন ত্রিত শরীর হইতে রোগাদিকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, ত্রিতও সেইরূপ মানব-শরীর হইতে রোগাদির নিবৃত্তি জন্য দেবগণ পরিবর্ত্তে শয়ন করিবেন (১৯ম।৬।৪)। তিনি দীর্ঘজীবন প্রদান করেন। শান্তির জন্য যে কোন মন্দ দ্রব্য হউক না, তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (ঋ ৭ম।৪৭।১৩)। আবেস্তার "সাম" পদবীর অর্থই "শান্তকারী।"

মহর্ষি ত্রিত কূপমধ্যে পতিত হইয়া উদ্ধারার্থ দেবগণের উদ্দেশ্যে স্তোত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন; দেবগণের রক্ষক বৃহস্পতি তাঁহাকে পাপ রূপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন (ঋ ১ম। ১০৫।১৭)। ঋগ্বেদে "ত্রিত" বৃত্রের হননার্থ সোমরসপানে বল-সঞ্চারিত ইন্দ্রের মত সোমরস পান করিতেন (১ম।১৮৭।১) এবং ত্রিত এককালে হস্তস্থিত লৌহদণ্ড দ্বারা জলরাশি ভেদ করিয়াছিলেন। (১ম।১৫৩।৫)।

"থে্ইতাওনা' (ক্রছন) বৈদিক "ত্রৈতন" আবেস্তায় "অথ্যো' এবং বেদে "আপ্ত্য (ত্রিত)।

আবেস্তার "কব্ উস্" বেদের "কাব্য উশনস্"। ইনি ইরাণদিগের এক-জন প্রধান ধর্ম্মনায়ক এবং এককালে ইরাণ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বেদে ইনি ইন্দ্রের সঙ্গী এবং তাহাতে তিনি "কাব্য উশনা" 'বা' "কবি উশনা" নামে উক্ত।

হিন্দু শাস্ত্রে ইনি শুক্র (Venus) এবং ইনি জীবিতকালে দেবশত্রু, দানবগণের গুরু ছিলেন। বেদে তিনি তদ্রূপ গৃহীত হন নাই। এই কাব্য উশনা (কবির পুত্র উশনা) অগ্নিকে মানবের সর্ব্বোচ্চ পুরোহিতপদে অভিষিক্ত করেন (ঋ ৮ম।২৩।১৭)। তিনি স্বর্গীয় গাভীগণকে চারণ স্থানে

চালন করিয়াছিলেন (ঋ ১মা৮৩।৫।) এবং ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে বৃত্রাসুর-বধে সাহায্য করিয়াছিলেন। গীতায় তিনি সর্ব্বপ্রথম (১০।৩৭) কবি-ভাবে বর্ণিত; যেহেতু সর্ব্ববিষয়ে কথিত শ্রীকৃষ্ণ ও উশনস্ একই। মহাভারত অনুসারে (১।২৫৪৪) ইঁহার চারি পুত্র অসুরদিগের নিকট বলি প্রদান করিতেন। ইরাণীয় পুরাণে তিনি নির্দ্দোষ নহেন। তিনি এত গর্ব্বিত, এত আত্মাভিমানী যে শূন্যে উড্ডীন হইতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহার এই গর্ব্বের জন্য তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইতে হইয়াছিল।

বেদ ও আবেস্তা উভয়েই দানব নাম শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত। তাহাদের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে হইবে।

জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের "তিস্ত্রেয়" বেদের ইন্দ্রের মত মানবের প্রার্থনার সাহায্য ভিন্ন "চৌরুকাসা" সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে বৃষ্টি দান করিতে পারেন না। তদ্রূপ ইন্দ্রও মানবপ্রার্থক প্রতিনিধি বৃহস্পতির সাহায্য ভিন্ন পর্ব্বতসঙ্কুল গুহা হইতে দানব-তাড়িত স্বীয় গাভীকে (মেঘ) মানবের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে পারেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারানাথ রায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পরম পবিত্র ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার সহযোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম কাশ্যপের নেতৃত্বে ও মহারাজ অজাতশত্রুর চেষ্টায় রাজগৃহের সন্নিকটে বেভার (বৈভার) পর্ব্বতের সপ্ত-পর্ণীতে (সপ্তপর্ণী) পাঁচশত অর্হৎ একত্র সমবেত হন। পালিগ্রন্থে এই সম্মিলনী প্রথম "সঙ্গীতি" নামে পরিচিত। ইহার সম্বন্ধে পালিগ্রন্থ হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের উপদেশ আবৃত্তির জন্যই এই অধিবেশনের আয়োজন হয় এবং পরে উপালি ও আনন্দ নামক দুই জন বৌদ্ধের দ্বারা বিনয় ও ধর্ম্ম নামক দুইখানি পিটক সংশোধিত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত কার্য্য সম্বন্ধে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য এই উপাখ্যান-মূলে নিহিত আছে, তাহা বলা সহজ নহে। ওল্ডেনবার্গ (Oldenberg) তাঁহার

মহাবংশের ভূমিকায় ইহাকে কল্পনাপ্রসূত উপকথা বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র, মহাবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে মনে হয় যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার উপদেশ আবৃত্তি করিবার জন্যই প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হয় এবং সেইজন্যই ইহার নাম সঙ্গীতি। তাহার পর অর্হৎগণের মধ্যে বক্তব্যাবক্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু সেখানে ত্রিপিটক, বিনয় বা সূত্র সংশোধিত হইয়াছিল কি না বলা অত্যন্ত কঠিন। বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিজ ডেভিড্‌স্ এই মত সমর্থন করেন। *

যাহাহউক ইহার এক শত বৎসর পরে বৈশালী নামক স্থানে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়; ইহার সম্বন্ধে যে সকল মতামত ও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলির আলোচনা করিলে বুঝিতে পাওয়া যায় যে, মহাসঙ্ঘিকের বহুপূর্ব্বে এই অধিবেশন আহূত হইয়াছিল এবং তথায় "বিনয়" সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়া থাকিবে।

ইহার পরে পাটলিপুত্রে আর একটী সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় যে, বিভজ্যবাদিগণের মতকেই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া প্রচার ও ইহার প্রাধান্য-সংস্থাপন। ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্মিলন মাত্র। মহাসঙ্ঘিকেরা ইহাতে আদৌ যোগদান করেন নাই। এই হিসাবে ইহার মূল্য অল্প হইলেও, ইহার আর একটা দিক্ আছে এবং তদ্দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্ঘে সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে, তাঁহার চেষ্টায় বুদ্ধ-ভাষিত শাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ ও নানাস্থানে প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হয়। জয়পুরের অন্তর্গত ভাব্‌রা নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত সম্রাট্ অশোকের গিরিলিপিই এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ।

---

* That at the time of the Council of Rajagriha the doctrines of Budhism had already been formulated into treatises which could be and which had been, learnt by heart is not only not impossible but highly probable—Budhism P 214.

সম্রাট্ অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া, ভল্গা নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে জাপান পর্য্যন্ত এবং সিংহল ও শ্যামদেশ হইতে মঙ্গোলীয়া ও সাইবেরিয়ার সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত সম্রাট্ অশোকের নাম পরিচিত হইয়াছিল। কোপেন (Koppen) সাহেব বলেন যে, সম্রাট্ অশোক সিজার অপেক্ষাও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টায় অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

মহাবংশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পাটলিপুত্রে তৃতীয় সঙ্গীতির পরই ভারতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বৌদ্ধপ্রচারকগণ প্রেরিত হন :—

১। কাশ্মীর ও গান্ধার।

২। মহীষ—ল্যাসেন সাহেব বলেন যে, বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যে গোদাবরী নদীর দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত ছিল।

৩। বনবাসী—অনেকে অনুমান করেন, ইহার দ্বারা তির্ব্বতদেশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে, ইহার দ্বারা রাজপুতানার মরুভূমিকে বুঝাইতেছে। (Ohilders Die দ্রষ্টব্য)

৪। মহারাষ্ট্র।

৫। জ্ঞানলোক—রিজ ডেভিডস্ সাহেব বলেন ইহার দ্বারা বাক্ট্রিয়াকে (Bactria) বুঝাইতেছে।

৬। হিমবন্ত—হিমগিরি হিমালয়ের সানুদেশ।

৭। সুবর্ণভূমি—রিজ ডেভিডস্ সাহেব বলেন, ইহার দ্বারা রেঙ্গুণ হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদকে বুঝাইতেছে।

৮। সিংহল।

ইহা ব্যতীত চোল, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণ দেশীয় স্থানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে সিংহল দেশকে লইয়াই কোন কোন ঐতিহাসিক কিছু বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় অর্ণবপোতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, সিংহল দেশে অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালেই যে, ভারতীয় পণ্য ভারতীয় যানে বাবিলন প্রভৃতি স্থানে নীত হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জ্যাক্‌সন সাহেব (Jackson) সাহেব তাঁহার Bombay Oity Gezetteer

পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, বৌদ্ধ জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় অর্ণববান গুর্জ্জর প্রদেশ হইতে বাবিলনে যাতায়াত করিত। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া স্মিথ সাহেব তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অশোক কর্ত্তৃক সিংহলে প্রচারক-প্রেরণ অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করেন না।

সিংহল বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অশোকের সময়ে তিস্‌সা নামক একজন নরপতি সিংহলের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অশোকের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য সিংহলে বৌদ্ধ প্রচারকগণের উপস্থিতির পূর্ব্বেই রাজদূত পাঠাইয়া অশোককে অভি-বাদন ও তাঁহার প্রতি শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভারতের সহিত সিংহলের একটা পরিচয় পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্ঘের পরই মহেন্দ্র নামক একজন প্রচারক এই পরিচয়ের ফলেই চারিজন শ্রমণ সমভিব্যাহারে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। তিস্‌সারাজ মহেন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং মহেন্দ্রের ইচ্ছানুসারে স্বীয় রাজ্যে একটী বৃহৎ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, তথায় একটী স্তূপমধ্যে বুদ্ধদেবের দেহের একখানি অস্থি প্রোথিত করা হয়। অনুরাধপুরায় ইহার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহেন্দ্র ধর্ম্মপ্রচার-ব্রতে সিংহলেই জীবনপাত করেন। তথায় তাঁহার নামে আজিও একটী বিহার দেখিতে পাওয়া যায়।

চীনদেশে কোন্ সূত্রে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধ-প্রচারকগণ প্রেরিত হন, তাহা ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে; তবে অধ্যাপক মোক্ষমুলর তাঁহার Lecture on the Science of Language নামক পুস্তকে বলেন যে, ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ-প্রচারকগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেই চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। চৈন সাহিত্যে একজন ধর্ম্মপ্রচারকের খৃষ্টের জন্মের ২১৭ বৎসর পূর্ব্বে চীনে আগমনের কথা জানিতে পারা যায়, কিন্তু তিনি ধর্ম্ম-প্রচারে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারা যায় না। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১২০ অব্দে গোবীর উত্তরে অসভ্য অধিবাসিগণকে পরাজিত

করিয়া একজন চীন সেনানায়ক একটী বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি লইয়া আসেন। জুলিয়েন (Julien) বলেন যে, চীনবাসীদিগের অস্থিমজ্জা, ধ্যানধারণা সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চভাব হইতে গৃহীত।

মিংগ-টি (Ming Ti) নরপতির রাজত্বকালেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে তিনি ৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি সাই-ইন (Tsai-in) নামক একব্যক্তির সহিত রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলগত নীতি শিক্ষার জন্য ভারতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা ভারতে আসিয়া দুইজন পণ্ডিতের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ চীন ভাষায় ভাষান্তরিত করেন। ইহার পর হইতেই ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ এতই নিকটতর হইয়া উঠে যে, চৈনিক পরিব্রাজকগণ প্রতিনিয়ত বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা ও বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য ভারতে গমনাগমন করিতে থাকেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ফাহিয়েন, হুয়েং সাং প্রভৃতির নাম ভারত-ইতিহাসে সুপরিচিত।

এইরূপে একদিন বুদ্ধের ধর্ম্মমত নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী একদিন ভারতে সগর্ব্বে উড্ডীন হইয়াছিল। বৌদ্ধ প্রচারকগণের কর্ম্মকুশলতায় বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ নরনারী গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

রাজবিচার।

একদা প্রভাতে নগরপ্রান্তে শত সভাসদ্-মাঝে
গাজনী মামুদ সুলতান ছিল ব্যস্ত বিচার-কাজে;
হেনকালে সেথা পশিল জনেক বৃদ্ধ পলিতকেশ,
যষ্টি ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পরিয়া জীর্ণ বেশ;
কুর্ণিশ করি কম্পিত পদে, দ্বিধায় জড়িত বাণী,
করুণ কাতর কণ্ঠে কহিল জোড় করি দুই পাণি,—
"গরীবের ঘরে, শোন সুলতান, কাল সন্ধ্যায় শেষে
কি জানি কে এক ধনি-সন্তান দুয়ারে দাঁড়া'ল এসে;

অনুচর তা'র লুটে ল'য়ে গেল যা কিছু আছিল মোর,
অত্যাচারের নিঠুর পীড়নে রজনী করিয়া ভোর;
কোনমতে প্রভু রেখেছিনু কাল রাত্রি আঁধার-ঘোরে,
কন্যারে মোরে অপমান হ'তে কষ্টে গোপন ক'রে;
আজ প্রভু মোরে এ বিপদ হ'তে বাঁচাও, বাঁচাও তুমি,
শুষ্ক শীতল ওষ্ঠে তোমার চরণ-যুগল চুমি!"
আঁখি-জল মুছি, বক্ষে চাপিয়া উদ্যত রাজরোষ,
কহে সুলতান, "বৃদ্ধ আমার মার্জ্জনা কর দোষ;
গত রজনীতে কষ্ট পেয়েছ আমারি ক্রটির লাগি,
আজিকে তোমার কুটীরের দ্বারে রহিব প্রহর জাগি;
নির্ভর কর, ভয় কি তোমার দেশেতে থাকিতে রাজা,
নিজ হাতে আজ দিব গিয়া তারে চোরের উচিত সাজা।"
বিচারের শেষে ভেঙ্গে গেল সভা উল্লাস-কোলাহলে,
ভক্তি-বিনত সভাসদ্ যত চলে গেল দলে দলে।

* * * *

নির্জ্জন রাতে অশ্বারোহণে চারিটী প্রহরী সাথে
চলে সুলতান গম্ভীর গতি দীর্ঘ অসিটী হাতে;
বনপথ ছাড়ি, বাঁধিয়া ঘোটকে জীর্ণ বটের আড়ে
পল্লীপ্রান্তে আসিয়া থামিল বুড়ার কুটীর-দ্বারে।
সুলতানে হেরি কাতর কণ্ঠে কহিল বৃদ্ধ কাঁদি,
"নিয়ে যায় প্রভু, কন্যারে মোর নিঠুর পীড়নে বাঁধি,
দয়ামায়াহীন পিশাচের হাতে রক্ষা কর গো মোরে;—"
বলিতে বলিতে ঢলিয়া পড়িল দারুণ মূর্চ্ছা-ঘোরে।
"নিবাও প্রদীপ" অনুচরগণে সুলতান ডাকি বলে,
বজ্র-মুঠিতে কৃপাণ ধরিয়া কক্ষের দিকে চলে।
আঁধারের পরে আঁধার নেমেছে, নিবেছে সকল আলো,
তারি মাঝে সেথা নৃত্য করিছে মৃত্যু নিবিড় কালো!
করুণ কণ্ঠে চীৎকার কার সহসা পশিল কানে,

কে ওই রমণী আলু থালু বেশ—ছুটে আসে তার পানে ;
উষ্ণীষে কার মুক্তা মাণিক ঝলকে আঁধার মাঝে,
মত্ত আবেগে ছুটে আসে ওকে রমণীর পাছে পাছে!
মামুদের করে মুক্ত কৃপাণ তুচ্ছ করিয়া বাধা,
পলকের মাঝে কাটিয়া পড়িল মুকুটের সহিত মাথা!
পদতলে তার লুটায়ে পড়িল রমণী ভয়েকে মুক,
ফেনিল তপ্ত রক্তের স্রোতে ভিজে মামুদের বুক।
"জ্বাল জ্বাল আলো," কহিল মামুদ কঠোর বজ্ররবে,
"ভূমিতলে লুটে এ কোন্ অভাগা এখনি দেখিতে হবে ;
শাসনের কালে চেনা মুখ হেরি পাছে বা বিচার ভুলি,
পাছে আসে দ্বিধা, নিবাতে বলিনু সকল আলোকগুলি ;
বিচার আমার শেষ হয়ে গেছে এখন চাই যে আলো,
কার্য্য-সমাধা হ'য়ে গেছে এবে ত্বরিতে প্রদীপ জ্বালো।"
জ্বলিল প্রদীপ। অনুচর চারি চীৎকার করি উঠে,
সাহাজাদা ওযে শোণিতে ডুবিয়া ভুমিতে পড়িয়া লুটে!
নিজ হাতে আজ মামুদ কেটেছে নিজের পুত্রশির,
শুনে দলে দলে ছুটে আসে লোক নয়নে অশ্রুনীর।
—মামুদ তখন নতজানু হ'য়ে উদ্দেশ্যে দেবতার,
ঊর্দ্ধে চাহিয়া কর জোড় করি প্রণমে বারম্বার!
"ধন্য তুমি হে পরমেশ্বর, ধন্য রাজাধিরাজ,
তোমারি কৃপায় সাধিয়াছি আজ রাজার উচিত কাজ।"

শ্রীসন্তোষকুমার পাল।

হারানো রুমাল।

—ঃ০ঃ—

ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া থামিল। আমি বন্ধুর বিবাহে গয়াতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলাম, এই ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিব বলিয়া আমিও ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। লোকে তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া ট্রেণে উঠিতেছিল। আমি নিঃসঙ্গ একাকী, আমি গজেন্দ্রগমনে একটা কামড়ায় উঠিতে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম,—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্ত্রী-কন্যা লইয়া ট্রেণে উঠিবার জন্য কাতরকণ্ঠে স্থানভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কেহই বৃদ্ধের সেই কাতরোক্তি শ্রবণোপযোগী বলিয়া মনে করিতেছেন না। বৃদ্ধের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মনে কষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত হইলাম। অনেক কষ্টে তাঁহাদিগকে একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠাইয়া দিলাম। সেই কামরার অন্যান্য আরোহী বৃদ্ধকে অযথা মৃদু মন্দ তিরস্কার করিতে লাগিলেন, অবশ্য আমাকেও তাঁহারা বাদ দিলেন না।

গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই। তাঁহাদিগের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বৃদ্ধের দিকে একবার চাহিলাম, তাহার অর্থ আমি তবে বিদায় হই। বৃদ্ধের সঙ্গের বালিকাটীও আমার পানে তাকাইয়া একটু হাসিল, তাহার অর্থ বোধ হয় আপনার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বৃদ্ধ আমায় আশাতীত ভূরি ভূরি প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃদ্ধের এই সকল প্রশংসা শুনিতে হইলে আমায় ট্রেণ ফেল্ করিতে হয়, সেইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বে তাড়াতাড়ি একটা কামরায় উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীরভাবে একজন ভদ্র লোকের পার্শ্বে উপবেশন করিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল, সেইজন্য গা হইতে গরদের চাদরটি খুলিয়া রাখিবার সময় দেখি যে, বৃদ্ধকে ট্রেণে উঠাইবার সময় চাদরটার অনেকখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মনে বড়ই কষ্ট হইল। কারণ চাদরখানি আমার নহে, আমার এক বন্ধুর। তারপর মুখ মুছিতে যাইয়া দেখি যে, রুমালখানিও অদৃশ্য হইয়াছে। ভাবিলাম, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুঁটুলির সহিত সেখানি তথায় রাখিয়া আসিয়াছি, কারণ সভ্যতার অনুরোধে রুমালটী

আমার হাতে ছিল। এখন কি দিয়া মুখ মুছিব তাহাই ভাবিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

পার্শ্বের বাবুটি আমার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি অসুস্থ হইয়াছেন?" উত্তর দিলাম, "হাঁ"। তিনি সনাতন প্রথানুসারে একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম?" বিরক্তি-সহকারে বলিলাম, "অতীন্দ্রনাথ রায়।" "কোথায় যাইবেন"? অসহ্য হইল, উত্তর দিলাম "যমের বাড়ী"। বাবুটি একটু হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলাম, লোকটা কি গোয়েন্দা? কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলাম না, কারণ শৈশব হইতে নিজের ব্যতীত পরের কোন অনিষ্ট করি নাই। মুক্ত বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার ভাণ করিয়া একাগ্র-মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। গাড়ী আপনার মনে চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে দেখি মাথাটী কয়লার গুঁড়ায় ভরিয়া গিয়াছে। হাত দিয়া যথাসম্ভব মাথাটী পরিষ্কার করিয়া সিগারেট ধরাইবার অভিপ্রায়ে দিয়াশলাই বাহির করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য পকেট খুঁজিয়া দেখি সিগারেট নাই। পার্শ্বের ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখিয়া নিজের পকেট হইতে একটী সিগারেট বাহির করিয়া দিলেন। আমিও লইতে দ্বিধা করিলাম না, কিন্তু মনে মনে বড় লজ্জিত হইলাম। সিগারেট ধরাইয়া নিবিষ্টচিত্তে ধূমপান করিতে লাগিলাম।

কিঞ্চিৎ পরে বাবুটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি চাকুরী করেন?" ভাবিলাম, এই বিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যে আমার সিগারেট খাওয়ার এই প্রকার পারদর্শিতা দেখিয়া বোধ হয় ভদ্রলোকটি অনুমান করিয়াছেন যে, আমি সরস্বতীর ত্যাজ্য পুত্র। মনের ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে প্রশান্ত-ভাবে উত্তর দিলাম, "হুঁ"। সিগারেট টানিলাম। তিনি আবার নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি সংসারী"? আমি "আজ্ঞে তবে কি বৈরাগী হইয়া এই প্রকার ট্রেণে ট্রেণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি"?

বাবুটী হাসিয়া উঠিলেন। আর কোন কথা হইল না। সন্ধ্যার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

গাড়ী হাজারীবাগে আসিলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তথায় দেখি ঐ বাবুটি নামিবার উপক্রম করিতেছেন। আবার কিছু জিজ্ঞাসা করেন,—এই ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলাম। তারপর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গাড়ী লিলুয়ায় আসিলে সহসা ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইল, ত্রাস্তভাবে চাহিয়া দেখি যে সাহেব-বেশধারী ঘড়ি-চেইন-সুশোভিত আমার চেয়ে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এক বাঙ্গালী যুবক আমার টিকিটখানির প্রার্থী। তাঁহার প্রাপ্য লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণের ভিতর গাড়ী হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। রুমালখানির আশায় সত্বর সেই বৃদ্ধের কামরার নিকটে যাইলাম, কিন্তু যাইয়া দেখি যে, বৃদ্ধ তাঁহার স্ত্রী-কন্যা লইয়া কোথায় নামিয়া গিয়াছেন।

এই ঘটনার পর ২।৩ বৎসর গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে এক শুভদিনে দাদার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বৌদিদি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, সেইজন্য আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটী আয়তনে একটু বাড়িয়াছে। আধ মাইল লম্বা ঘোমটার ভিতর দিয়া বৌদিদির চন্দ্রবদনখানি দেখিয়া যেন হঠাৎ চমকিত হইলাম। মুখখানি যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল।

কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল, আমি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। সকলে বলিল, বড় বৌ খুব পয়মন্ত। আমি পাশ হইলাম বৌ দিদির পয়ে—সকলের একথায় মনে বড় রাগ হইল, কিন্তু তখনই রাগ পড়িয়া গেল।

আমার ছাত্রজীবনের যবনিকা এইখানেই পতিত হইল। সকলে আমার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন, ইহার প্রধান উদ্যোগী হইলেন বৌদিদি। বৌদিদির একাগ্রতায় প্রজাপতি ঠাকুর আমার উপর প্রসন্ন হইলেন। আজ আমায় বর্দ্ধমান হইতে দেখিতে আসিবে,—এই শুভ সংবাদ শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলাম, জীবনে এত চিন্তিত বোধ হয় কখন হই নাই। হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনেক দিনের অনেক কথা উঁকি মারিতে লাগিল। এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে প্রবেশ করিতে হইলে যে সকল বিপদ অবশ্যম্ভাবী সেগুলি একে একে মানসপটে উদিত হইল; কিন্তু কি করিব আর উপায় নাই। একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। বাহিরে যাইব মনে করিলাম। জামা কাপড় পড়িয়া বৌদিদির নিকট হইতে একখানি রুমাল চাহিলাম। বৌদিদি আজ একখানি

তাল সিল্কের রুমাল আনিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ যেন এটা হারিও না"।

রুমাল লইয়া দেখি,—সেই আমার ট্রেণের হারানো রুমাল। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলাম। আমার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া বৌদিদি বড় ভীত হইলেন। আমি তাঁহাকে এ রুমাল কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি গয়া ষ্টেশন, লোকের ভিড় ইত্যাদি সমস্তই বলিলেন। আমার হৃদয় হইতে একটি পাষাণ নামিয়া যাইল। আমি বলিলাম, আমিই সেই 'বাবু', সেই ছিন্ন গরদের চাদর অদ্যাবধি আমার নিকট বর্ত্তমান।

বৌদিদিও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ তাঁহার মুখটি ভাল করিয়া দেখিলাম। হাঁ এই সেই মুখ!

কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম জানি না, সহসা কাহার ডাকে আমার চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি দাদা আমায় বাহিরে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। বুঝিলাম,—আমায় দেখিতে আসিয়াছে। আজ আমার জীবন-মরণের সন্ধিস্থল! ধীর-মন্থর গমনে বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার শূন্য হইল। সেই হারানো রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া দেখিলাম।

ভাবিলাম আমি জাগ্রত না নিদ্রিত? বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আমার নিকট সমস্তই বাজিকরের বাজির মত বোধ হইতে লাগিল। দেখিলাম, ট্রেণের সেই যুবাপুরুষটী আমায় দেখিতে আসিয়াছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন,—'মহাশয় কি এখনও অসুস্থ আছেন?' আজ নম্রভাবে উত্তর দিলাম, 'না'। তিনি একটু হাসিলেন। আমার নিকট সে হাসি বিদ্রূপের হাসি বলিয়া বোধ হইল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়ের চাকুরী কি প্রকার চলিতেছে?' আমি নিরুত্তর রহিলাম। দাদা বলিলেন 'কাহার চাকুরী?' আমার শঙ্কিত, কম্পিত ও লজ্জাবনত মুখখানি দেখিয়া তিনি অন্য কথা আরম্ভ করিলেন। সেই দিনই আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু তখনও বুঝিলাম না, ট্রেণের সেই যুবকটীর সহিত কন্যাপক্ষের কি সম্বন্ধ।

তারপর একদিন ফাল্গুন মাসে আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ করিতে গেলাম হাজারীবাগে। বিবাহের পরদিন যখন নববধূর সঙ্গে একত্র গাড়ীতে

আরোহণ করিয়াছি, সেই সময়ে হঠাৎ ট্রেণের সেই যুবাপুরুষটীর সঙ্গে পুনরায় দেখা হইল। তিনি আমার হস্তে অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের একটী তোড়া দিয়া বলিলেন—"মহাশয় এতদিন যাহা আপনার নিকট 'যমের বাড়ী' ছিল, আশা করি, এইবার তাহা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে।" আর একটা কথা—নলিনী আমার ছোট বোন, তাকে একটু আদর-যত্ন কর্‌বেন।"

লজ্জায় আমার মস্তক অবনত ও মুখ লাল হইয়া উঠিল। এদিকে ট্রেণের সময় হইতেছে বলিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি বৌদিদির সেই রুমাল ও ট্রেণের সেই যুবাপুরুষের সহিত আমার বর্ত্তমান সম্পর্কের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

প্রতীচ্যে প্রাচ্য কবির প্রতিষ্ঠা।

প্রাচ্যের বাণী বহুদিন হইতেই প্রতীচ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রাচ্যের ধর্ম্মবার্ত্তা—ভারতের ধর্ম্মকথা প্রতীচ্যে জলদ-নির্ঘোষে ব্যক্ত করিয়াছেন। উষার আলোক বা তরুণ তপনের কনক কিরণ প্রাচ্যের সম্পত্তি, তাহা প্রাচ্য হইতে বিচ্ছুরিত হয়। জ্ঞানের নব-রশ্মি-রেখাও তেমনই প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে সঞ্চারিত হইবে—ইহা স্বাভাবিক। প্রাচীন যুগেও এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ঈশা, মুষা, বুদ্ধ, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, কন্‌ফিউসিয়াস, সকলেরই উদ্ভব এই প্রাচ্যভূমিতে, কিন্তু ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা জগদ্ব্যাপিনী। তাই বলিতেছিলাম, ধর্ম্মের বাণী চিরদিনই প্রাচ্য হইতেই প্রতীচ্যে—প্রতীচ্যে বলি কেন সমগ্র জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তাই আজ—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচ্যের কবি-প্রতিভা যে প্রতীচ্যে গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে, এ সংবাদে আমরা বিচলিত হই নাই। প্রাচ্য কবির—বিশেষতঃ বাঙ্গালী কবির চিরমধুর বংশী-তানে প্রতীচ্য-কোবিদ-কুল যে বিমুগ্ধ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বঙ্গভূমি কবির লীলা-ভূমি,—বঙ্গজননী কবি-মাতৃকা। জয়দেব-চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি-নরোত্তম

হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-চন্দ্র মুকুন্দরাম পর্য্যন্ত এবং ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধু-হেম-নবীন-রবীন্দ্র-অক্ষয় পর্য্যন্ত কবিগণ বাঙ্গালার সাহিত্যকে কাব্যরসসিক্ত করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্য ইঁহাদের কবিতা-মধু-ধারায় চিরমধুর। আমরা এই মাধুর্য্য অনুভব করিতেছি, এই মধুর রসের আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি। আজ বঙ্গ-বাণীর প্রিয় সন্তান কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-মাধুর্য্য বিশ্বসাহিত্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার"গীতাঞ্জলি"তিনি স্বয়ং ইংরাজীতে অনূবাদিত করিয়া প্রতীচ্য সাহিত্যামোদীদিগকে তাঁহার মধুর কবিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পরিচয় লাভ করিয়া প্রতীচ্যের সাহিত্যিকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিতোষিক—'নোবেল' পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের 'দরবারে' যে উচ্চ সম্মান লাভ করিলেন, ইহাতে কেবল তিনি যে তথায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, তাহা নহে; ইহা দ্বারা বিশ্বসাহিত্য-সভায় বঙ্গ-সাহিত্যেরও এক আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। 'নোবেল' পুরস্কার-লাভ ব্যক্তিগত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নিকট মহৎ লাভ এবং প্রতীচ্যের গুণগ্রাহী লোকদিগের নিকট তাঁহার কবিত্বের রসবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় হইলেও আমরা কিন্তু ইহাতে বিধাতার শুভেচ্ছা দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় ও সম্বন্ধ-সংস্থাপনের সময় আসিয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ভিতর দিয়া তাঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া এই শুভ-সম্মিলন সংঘটিত হইল। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙ্গালা সাহিত্য আজ আসন লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথ এই পরিচয়-সংঘটন করাইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন; বাঙ্গালীর কবি-প্রতিভাকে সভ্য জগতের পূজার্হ করিয়াছেন। কেবল ইহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সম্মানের অধিকারী; কেবল এইজন্যই আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। নতুবা, তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠদান বলিয়া যদি আমরা রবীন্দ্র নাথের প্রশংসা করি, তাহা হইলে তাহা তাঁহার নিকট প্রকৃত প্রশংসাবাদ হইবে না—চাটুবাদ মাত্র হইবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'

ভাব-সম্পদে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি নহে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী, বা রামপ্রসাদের গীতাবলী ভাব-সম্পদে 'গীতাঞ্জলি' অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ গভীর ভাবমূলক কবিতার সহিত পরিচয়-লাভ এদেশের সাহিত্যে লব্ধবিদ্য না হইলে বা এদেশের প্রকৃতির সহিত পূর্ণ পরিচিত না হইলে অসম্ভব। সুতরাং অনুবাদ দ্বারা এ সকল প্রাচীন কবিতার রসবোধ প্রতীচ্যের বুধমণ্ডলী করিতে পারিতেন না। শুনিয়াছিলাম, একবার মনস্বী স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র 'বৈষ্ণব পদাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ করিতে গিয়া নিরাশ হইয়া বলিয়াছিলেন,—এরূপ গভীর ভগবদ্‌-ভাবমূলক কবিতার অনুবাদ অসম্ভব। পরকীয় ভাষায় ইহা অনূদিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে এই বৈষ্ণবপদাবলীর ক্ষীণ অনুরণন আছে। প্রাচ্যের সুগভীর ভাব যাহা পরজাতির পক্ষে অনুভব করা সহজসাধ্য নহে, তেমন ভাব ইহাতে নাই। পরন্তু, বর্ত্তমান যুগে যখন প্রাচ্যের ভাব-রাজির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রতীচ্য ইতিপূর্ব্বেই লাভ করিয়াছে, তখন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাবলী'র রসানুভব করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। নানাবিধ প্রাচ্য পুস্তকরাজি অধুনা প্রতীচ্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, সুতরাং প্রাচ্য ভাবের বা রসের একটা অপূর্ণ মূর্ত্তি তাঁহারা যে একেবারে অনুভব করেন নাই, বা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হন নাই, এমন নহে। প্রতীচ্য এখন প্রাচ্য ভাবের সহিত পরিচিত হইবার জন্য স্পৃহান্বিত,—এমত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাইয়া তাঁহারা যে মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বঙ্গসাহিত্যের সহিত প্রতীচ্য সাহিত্যের পরিচয়-সংস্থাপক। এই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া যদি বঙ্গদেশের সাহিত্য-সম্পদ্‌ বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা স্পর্দ্ধা করিব বৈ কি! আর সেই স্পর্দ্ধা, গৌরব যিনি আনিয়া দিয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের আরও স্পর্দ্ধার সামগ্রী, আরও গৌরবের সামগ্রী! সার্থক তিনি মাতৃ-সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারই সাধনায় আজ জননীর গৌরব দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল; প্রতীচ্যে প্রাচ্যকবির গৌরব-কেতন উড্ডীন হইল।

পুস্তক-পরিচয়।

—:•:—

পল্লী-সেবক।—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিল্প-সমিতির সম্পাদক শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামগুলি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। রোগে, শোকে, অনশনে, অর্দ্ধাহারে পল্লীবাসী জর্জ্জরিত। বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে এই ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে। কি উপায়ে বাঙ্গালার পল্লীসমূহের এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, পল্লীসমূহ আবার সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে, পল্লীবাসীদিগের অন্ন-সংস্থানের উপায় ও অভাবের নিরাকরণ হয়, অধ্যাপক শ্রীযুত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে সে সকলের আলোচনা করিয়াছেন। পল্লীগ্রামগুলি আমাদের দেশের কতখানি অংশ অধিকার করিয়া আছে, এবং সেগুলিকে 'বাদ' দিয়া কোন কার্য্যই যে হয় না, অধ্যাপক রাধাকমল তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন :—

"বাঙ্গালাদেশে কয়েকবৎসর হইতে শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে। দেশের আধুনিক শিক্ষা যে দেশবাসীর উপযোগী নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন। নূতন প্রকারের অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন কি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কিন্তু এই বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত অভাব মোচন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। দেশবাসী কাহারা এবং দেশবাসীদের প্রকৃত অভাব কি—এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের ভুল ধারণা আছে। কেবল মাত্র ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লইয়া দেশ নহে, কয়েকটী সহর মিলিয়া দেশ গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশকে বুঝিতে হইলে সহরের বড় রাস্তা, আফিস-আদালত ছাড়িয়া শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছায়া-সুনিবিড় পল্লীগ্রামে আসিতে হইবে। দেশবাসীর হৃদয় বুঝিতে হইলে স্বদেশহিতৈষীর বক্তৃতা এবং উকিল-হাকিমের জারিজুরীর প্রতি মনোযোগ না দিয়া, যে কৃষক ক্ষেত্রে

লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে রামপ্রসাদী গান ধরিয়াছে তাহার গান শুনিতে হইবে। বাস্তবিক বাঙ্গালাদেশে সহরের সংখ্যাই বা কত? খুব জোর ১১০, কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ২,০৩,৬৫৪। দেশবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন পল্লীগ্রামে এবং কেবল মাত্র ৫ জন সহরে বাস করে। সুতরাং বাঙ্গালীর কোন অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আয়োজন করিবার সময় যদি পল্লীবাসীদের কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।"

অধ্যাপক রাধাকমলবাবুকে আমরা সাদরে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। তিনি যে ভাবে, যে প্রণালীতে 'পল্লী-সেবক' রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিন্তার প্রগাঢ়তা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে এখন এইরূপ শ্রেণীর প্রবন্ধ-রচনার সময় আসিয়াছে। তাঁহার ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল এবং সর্ব্বজন-বোধগম্য। আমরা তাঁহার ভাষার এবং আলোচনা-প্রণালীর প্রশংসা করিতেছি। অধ্যাপক রাধাকমল তাঁহার এই একটী নিবন্ধেই বঙ্গসাহিত্যে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

অপরাধীর দণ্ডগ্রহণ। *

[সমাজ-শাসনের একটী চিত্র]

এস্কুইমো বলিয়া একটা জাতি আছে, তাহারা এত নিরক্ষর যে রাজকরের কথা জানে না। কিন্তু রাজকর-সম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ হইলেও তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিয়া থাকে।

আইসল্যাণ্ডেও সম্ভবতঃ পুলিশ নাই। সেখানকার শাসনকার্য্য—শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন পুলিশের সাহায্য বিনাই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তথায় দেশশাসন কেমন করিয়া হয়,—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

একবার একজন যুবক আইসল্যাণ্ডবাসী এক প্রান্তর পার হইতেছিল। এমন সময়ে পথে তাহার সহিত একজন অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ হইল। প্রান্তরটী

* ইংরাজী হইতে।

নির্জ্জন ; এখানে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় না। কাজেই দুইজনে দুই জনকে অভিবাদন করিল। তাহার পর যুবক, অশ্বারোহীকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি ?

অশ্বারোহী। ষ্টিফ্যান।

যুবক। তোমার পিতার নাম ?

অশ্বারোহী। থ্রসটিন।

যুবক। কোথায় যাইতেছ ?

অশ্বারোহী। কারাগারে!

যুবক। কেন ?

অশ্বারোহী। একটা ভেড়া চুরি করিয়াছি।

যুবক। তোমার সঙ্গে কোন রাজকর্ম্মচারী নাই ?

অশ্বারোহী। না ; সেরিফ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন। সেইজন্য তিনি গ্রেপ্তারী কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—তুমি নিজেই কারাগারে যাও।

তাহার পর দুইজনে নস্যের ও চুম্বনের আদান প্রদান হইল এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের গন্তব্য মুখে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে আবার সেই যুবক ঠিক সেই স্থান দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল ; এমন সময়ে সেই অশ্বারোহীর সহিত পুনরায় তাহার সাক্ষাৎ হইল।

যুবক। কি হে ষ্টিফ্যান থ্রসটিন্ নয় ? তুমি না বলেছিলে তুমি কারাগারে যাচ্ছ ?

অশ্বারোহী। হাঁ, তাই ত গিয়েছিলেম ; কিন্তু তারা আমায় কারাগারে প্রবেশ কর্‌তে দিলে না ?

যুবক। কেন ?

অশ্বারোহী। আমার গ্রেপ্তারী কাগজপত্র পথে খোয়া গিয়াছিল।

যুবক। তাই বুঝি তুমি বাড়ীতে আবার ফিরে যাচ্ছ ?

অশ্বারোহী। হাঁ।

তার পর ষ্টিফ্যানের কি ঘটিল,—শুনুন। ষ্টিফ্যান বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহার অসাবধানতার জন্য সে তিরস্কৃত হইল। তাহার পর আবার সেরিফের নিকট গিয়া সে গ্রেপ্তারী কাগজপত্র গ্রহণ করিল। সেই কাগজপত্র

লইয়া সে কারাগারে গেলে কারা-কর্ত্তৃপক্ষগণ এবার তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল।

ষ্টিফ্যানের যতদিন কারাগারে থাকিবার কথা, ততদিন পর্য্যন্ত সে কারাগারে রহিল। তাহার পর সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে সমাজে পুনর্গৃহীত হইল। উপরের এই গল্পটী পড়িয়া একজন আধুনিক লোক অনায়াসে বলিতে পারেন,—"লোকটার সঙ্গে যখন কনেষ্টবল ছিল না, তখন সে কেন নিজে গায়ে পড়িয়া কয়েদে গেল? সে ত পলাইতে পারিত?" কিন্তু সে পলাইয়া যাইবে কোথায়? সে পুলিশের হাত এড়াইতে পারে; কিন্তু সমাজের দুর্জ্জয় শাসন-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পলাইতে পারে, তাহার এমন ক্ষমতা নাই। সমাজই তাহাকে দোষী করিয়াছে, সমাজের বিচার সে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। সুতরাং সমাজ যে দণ্ড দিয়াছে. সে সেই দণ্ডভোগ না করিলে সমাজ তাহাকে লইবে কেন? সে কারাগার হইতে পলাইয়া যদি সমাজের হাত অতিক্রম করিত, তাহা হইলে নিজের সমাজের পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইত? কিন্তু তাহা হইলে তাহার জীবন যে কত ক্লেশকর হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। দুই দশ মাসের কারাদণ্ড-ভোগ বরং ভাল,—কিন্তু সমাজ-ত্যাগ,—আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব-পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-ত্যাগ কি ভয়ানক কথা!

সমাজের শাসনের চেয়ে কঠিনতম শাসন আর নাই।

প্রতিধ্বনি।

—:০:—

গৃহস্থ—কার্ত্তিক, ১৩২০।

ভারতের নিজস্ব শিল্প-পদ্ধতি।

আমাদের দেশে এখন একটা শিল্প-বিপ্লবের যুগ চলিতেছে। ভারতের নেতৃবর্গ জাতীয় সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির নিমিত্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন। প্রতিভাবান্ বিদ্বানেরা ভারতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য একদিকে প্রধাবিত। ভারতবর্ষকে একটা শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করিতে অধুনা তাঁহারা অত্যন্ত ব্যগ্র। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনেক যুবক শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন আরম্ভ করিয়াছেন। দেশের স্থানে স্থানে নুতন নুতন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নুতন নুতন শিল্প-বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য

তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই সময় একটা কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। কথাটা এই—ভারত ও ইউরোপের আদর্শ এক নয়; ইউরোপের প্রদর্শিত পথে ভারতাত্মার অভিব্যক্তি অসম্ভব। সুদূর আমেরিকার অনুকরণও আমাদের চলিবে না। সুতরাং কোন একটা বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ইউরোপ বা আমেরিকার ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তোলা কি সমীচীন? উত্তরে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার অনুমোদন করিবেন এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। এখন প্রশ্ন, বর্ত্তমানে যে ভাবে শিল্পের আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে, তাহা কি প্রতীচ্যের অনুকরণে নয়? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডেও এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল; কৃষি-প্রধান ইংলণ্ড শিল্প-প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারতেও ক্রমশঃ সেইরূপ ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে নূতন নূতন অভাব সৃষ্ট এবং তাহার নিরাকরণার্থে নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন শিল্পের এখন আর আদর নাই। এদিকে বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের প্রধান খাদ্য-শস্য বিদেশে নীত হইতেছে; দেশের লোক অনাহারে মৃতকল্প। সুতরাং কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি দেশীয় শিল্পীরা জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া নবীন শিল্পের সহায়তা-সাধনে যত্নবান। এমন কি, কৃষককুলও এই সমস্ত শিল্পোপযোগী দ্রব্য-উৎপাদনেই মনোনিবেশ করিতেছে। জাতীয় শিল্প ত ধ্বংসোন্মুখ। কিছুদিন পরে অন্ন জুটাও ভার হইবে। ১৩০৪ সালেও বাঙ্গালা-দেশে টাকায় বিশ সের চাউল বিক্রয় হইত। এখন তাহা আমাদের নিকট উপন্যাসের গল্প মাত্র।

সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩২০।

উপাসনা-তত্ত্ব।

এই সংসারে আমি আছি বলিয়াই আর সকল পদার্থ আছে। আমি না থাকিলে, আমার পক্ষে তাহারা থাকে না। আমার দশটি ইন্দ্রিয় আছে, তাই এই দশেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাহা কিছু, সে সকলেরই অনুভূতি আমার আছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি, সে সকলই আমা হইতে পৃথক্ ভাবে, স্বতন্ত্ররূপে অনুভব করি। এই অনুভূতিই আমার সৃষ্টি, অন্যের নহে। আমার আমিত্বটাকে দেহগত অনুভূতির সকল ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্রভাবে জানি ও বুঝি বলিয়াই, অনুভূতিগম্য যাহা কিছু তাহা আমা হইতে যে পৃথক্ এ বোধ আমরণ দেদীপ্যমান থাকে। নয়নযুগলের সাহায্যে আমি যাহা দেখিতে পাই, তাহা আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবেই দেখিতে পাই। আমি ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, এ জ্ঞান আমার থাকেই। শ্রবণযুগলের সাহায্যে আমি যে সকল শব্দ ও ধ্বনি শুনিতে পাই, সে সকলই যে আমি শুনিতেছি, এবং আমার দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে শুনিতে পাইতেছি, এ বোধ আমার থাকেই,—যাবজ্জীবন থাকেই। এমনই ভাবে আমার সকল অনুভূতিগম্য পদার্থই আমা হইতে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হয়।

অহং অস্মি।—Ergo Cogito Sum.

আমি আছি—সুতরাং আমি আছি। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের জ্ঞানটা নিত্যসিদ্ধ; দেহী-মাত্রেরই এ জ্ঞান থাকে। আমার আমিত্বের জ্ঞানটা যখন নিত্য, তখন আমা হইতে যাহা পৃথক্—যাহা আমি দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি, অনুভব করি—তাহার অস্তিত্বটাও আমার আমিত্বের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ আমি আছি এবং আমি ভোগী বলিয়াই আমার ভোগ যাহা কিছু তাহা যতদিন আমি দেহী থাকিব, আমার ইন্দ্রিয় সকল সজীব থাকিবে, ততদিন আমার পক্ষে দেদীপ্যমান থাকিবে। আমার দৃষ্টিশক্তি যতদিন থাকিবে; ততদিন পরি দৃশ্যমান জগৎ আমার পক্ষে সমুদ্ভাসিত থাকিবে। তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল যেমন ভাবে সজীব থাকিবে, তেমন ভাবে সেই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আমার অনুভূতিগম্য থাকিবে। এই অনুভূতিগম্য জগৎকে শাস্ত্র বিসৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি যেন আমার আমিত্বকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—দূরে রাখিয়া—উহার স্বতন্ত্র স্থিতির কল্পনায় মুগ্ধ হইতেছি। আমি আছি বলিয়াই আমার জগৎ আছে, আমি মরিলে আমার পক্ষে আমার জগৎও মরিবে। তাই কবির বলিয়াছেন,—

"হম্ ডুবা ত জগ ডুবা।"

প্রবল বন্যার স্রোতে আমি যখন ডুবিয়া যাই, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুভূতিগম্য জগৎও ডুবিয়া যায়। এই আমি—কে? ইহাই কিন্তু বলিতে পারিব না; আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন পণ্ডিতেই বলিতে পারে নাই। আমি আছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি; বলিতেছি; বুঝিতেছি—সর্ব্বকর্ম্মই করিতেছি; কিন্তু আমি জানি না, আমি কি ও কে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরাদ্যং পুরুষপ্রধানম্॥

এক সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, অথচ স্বয়ং নিরাকার অনন্ত পুরুষ-প্রধান নিত্য বিদ্যমান আছেন; তিনি বিদেহ-আত্মা; তাঁহার হস্ত নাই তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চরণ নাই তিনি বিশ্ব-চরাচর ভ্রমণ করেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার শ্রবণ নাই তিনি সকল শব্দ শুনিতে পান; তিনি বিশ্বসৃষ্টিকে জানেন, বিশ্বের কেহই তাঁহাকে জানে না। এই অনন্ত ও অজ্ঞেয় আত্মা প্রতি দেহে বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, তিনিই আমি, আমিই তিনি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তটির ধারণা আমাদের নাই। যে কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটা আমাদের মনে দৃঢ় হয়, আমরা আমাদের দেহগত আত্মাকে চিনিতে—জানিতে—বুঝিতে পারি—আমি কে তাহার ঠিকমত নির্দ্দেশ করিতে পারি—তাহাই উপাসনা, তাহাই সাধনা, তাহাই তপস্যা ও আরাধনা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১৩২০।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই; হইবে না; হইতে পারে না" ব্রাহ্মসমাজ এই যে 'না'বাচক বা অভাবাত্মক মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা কোনও অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রের কথা নহে। কারণ ব্রাহ্মসমাজে এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। অথচ 'ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না ও হইতে পারে না' ইহা আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতির কথাও নহে। কারণ আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি-লব্ধ সত্য মাত্রেই হাঁ-বাচক। যাহা নাই তার প্রত্যয়ও হয় না অনুভূতিও অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন আত্মপ্রত্যয় এই কথা বলিতে পারে। তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ এ সকলের সাক্ষ্য স্বানুভূতি দিতে পারে। কিন্তু তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন কি না পারেন ইহা আত্মপ্রত্যয় বলিতে পারে না। স্বানুভূতি ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। এ সকল কথা আত্মপ্রত্যয় ও স্বানুভূতির অধিকারের বহির্ভূত। অতএব যে মূল প্রামাণ্যের উপরে ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা তাহার দ্বারা অবতারবাদ সপ্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২০।

"আদর্শ-সমালোচনা"।

'কি'র খেদ নামক কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ

'কি' ছিলাম আমি কেমনে হলাম 'কী'
ভেবে হাসি হিঃ হিঃ হী।
ভাগের মা এই বঙ্গভাষার
কেহ নাই বটে গঙ্গা দিবার
শ্রাদ্ধ ত তার করে প্রতিদিন
ফণি মণি ভারতী।
ভেবে হাসি হিঃ হিঃ হী।
সবাই জগতে হতে চায় বড়
আমি রব ছোট কী,
তোমরা সকলে বিচার করতো জী।
সেই কেলোয়াৎ যে চেঁচাতে দড়
যে লেখে কবিতা সেই কবিবর,
আমিই কেবল হ্রস্ব হইয়া
পড়িয়া রহিব ছিঃ, বিচার করতো জি।

"কপিঞ্জল"।

বঙ্কিম-কথা।

—ঃ(০)ঃ—

শনিবারের সন্ধ্যা। কলিকাতার পথগুলি জনকোলাহল ও যানশব্দে মুখরিত। পথের উপর-স্থিত দ্বিতল গৃহের একটি প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া ঠাকুরদাদা অ—বাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম।

ঠাকুরদাদার বয়স প্রায় পঁচাত্তর বৎসর হইবে। গায়ে একটি বালাপোষ। তাকিয়ায় হেলান দিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে কত কথাই কহিতেছিলেন। তাহারই কিয়দংশ আজ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি। কথাগুলি অমূল্য।

আমি বলিলাম, "বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কিরূপ দ্রুতগতিতে হইতেছে, দেখিতেছেন ত?"

ঠাকুরদাদা। এ আর তুমি আমায় দেখাচ্ছ কি? আমি আমার নিজের জীবনে একটা ভাষার কি উন্নতি দেখ্‌ছি ভেবে দেখ দিকি। ছেলেবেলায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্তের বই পড়েছি, তখন বাঙ্গালা ভাষার গতিই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তারপর যৌবনেই বঙ্কিমের প্রতিভায় বাঙ্গালাভাষা নূতন পথে ধাবিত হ'ল। বিলাতে দর্শকেরা কোন নাটকের প্রথম রজনীতে উপস্থিত ছিল বলিয়া গর্ব্ব করে, আজ বৃদ্ধ বয়সে আমিও তেমনি 'বঙ্গদর্শন' 'প্রচার' 'নবজীবন' প্রভৃতির প্রথম প্রকাশ দেখিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করি। (আলমারির দিকে দেখাইয়া) এই পুরাতন 'বঙ্গদর্শন' 'প্রচার' প্রভৃতির সংখ্যাগুলি আমার কাছে কত মূল্যবান্। ইহাদের প্রত্যেক পৃষ্ঠার সহিত আমার যৌবনের কত কাহিনী বিজড়িত। কখনও 'বিষবৃক্ষে'র কতিপয় পরিচ্ছেদ বাহির হইলে ইহার শেষ কিরূপ হইবে তাহার তর্ক করিয়াছি, কখনও 'কামিনীকুসুম' প্রভৃতির রচয়িতা কে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি।

বঙ্কিম, প্রফুল্ল, রামদাস, হেম, নবীন, রবীন্দ্র সকল লেখকই আমার জীবন-কালের মধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। প্রৌঢ়ে গিরিশ, দ্বিজেন্দ্র, অমৃত-লালের পরিণত রচনায় মুগ্ধ হয়েছি। একটা মানুষের জীবনে একটা ভাষা সৃষ্টি হয়ে এরূপে জগতের সাহিত্যে স্থান পেতে আর কোথাও দেখেছ কি?

আমি। সৃষ্টি বল্‌বেন না। তার পূর্ব্বেও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখকের অভাব ছিল না।

ঠা। অবশ্য সৃষ্টি বল্‌ব। বঙ্কিমের ভাষা এক নূতন সৃষ্টি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতির রচনা পূর্ব্বে ছিল বটে কিন্তু সেগুলি উপাদান মাত্র। সেই উপাদান-সহায়ে বঙ্কিম নূতন সৃষ্টি করিলেন। আমি সে সময়ে এ বিষয়ে যে কবিতা লিখেছিলাম তা নিয়ে কত লোকে আমায় পরিহাস করেছিল। আজ সকলকেই মান্‌তে হচ্ছে যে, বঙ্কিম অসাধারণ ক্ষমতায় বাঙ্গালা ভাষায় নবীন তেজ দিয়াছিলেন।

ঠাকুরদাদা নিজে যে একজন সাহিত্যিক তাহা আমরা জানিতাম। কিন্তু তাঁহার রচনা কখনও গ্রন্থকারে বা মাসিকপত্রের প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, নিজেও মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ বা কবিতা লেখেন। কিন্তু বহু অনুরোধেও কখন আমাদের তাহা দেখাইতেন না। আজ এই কবিতার কথা শুনিয়া আমি জিদ্ করিয়া বলিলাম "কবিতাটি আমায় দেখাইতে হইবে।"

ঠাকুরদাদা কথাটা চাপা দিবার চেষ্টায় বলিলেন "বঙ্কিম কেন ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ, বা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি প্রচার না করিয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন জান? ঐ আল্‌মারি হইতে প্রথম খণ্ড 'প্রচার' বাহির কর।"

আমি একখানি জীর্ণ পুস্তক বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম। পুস্তকখানি ১২৯১ সালের 'প্রচার' নামক মাসিকপত্র। ২৬ পৃষ্ঠা খুলিয়া ঠাকুরদাদা বলিলেন, "বঙ্কিমের সীতারাম প্রচারে 'প্রথম' প্রকাশিত হয়। এই সীতারামের প্রথমেই একটি পরিচ্ছেদ ছিল, বঙ্কিম পরে উহা উঠাইয়া দেন। এই পংক্তিটি পড়।"

আমি পড়িলাম—

"আমার যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহার অনেক কথা দেশ কাল

পাত্র বিবেচনা করিয়া উপন্যাসে গাঁথিয়া বলিতে হয়।”

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের এই উক্তিটুকু পড়িবার পর ঠাকুরদাদা বলিলেন, “ইহা দুঃখের কথা, ক্ষোভের কথা। বাঙ্গালা দেশে উপন্যাসের যত পাঠক, অন্য কোনও গ্রন্থের তত নহে। তাই লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বঙ্কিম উপন্যাসেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। শুধু বাঙ্গালাদেশে কেন, ইউরোপেও উপন্যাস-সাহায্যে আজও জনসাধারণের মত চালিত হইতেছে। উইল্‌কি কলিন্‌সের Man and Wife নামক উপন্যাস প্রচারিত হইবার পর বিবাহ-বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমিলে জোলার Germinal উপন্যাসে কুলিজীবনের অপরিসীম যন্ত্রণার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে উত্তেজিত জনসাধারণ বহু ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া অত্যাচার-দমনে উদ্যোগী হয়। বাঙ্গালাদেশে রমেশচন্দ্রও ‘সংসার’ ও ‘সমাজে’ এইরূপ সমাজ-সংস্কেরর চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবীচৌধুরাণীতে কত কৌশলে ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছ কি? "অনুশীলন" (ধর্ম্মতত্ত্ব) ও "দেবীচৌধুরাণী" এই বই দুইখানি একসঙ্গে পড়, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। দুই চারিটি বিষয় আজ দেখাইয়া দিই, সময় পাই ত আর একদিন বিস্তৃত আলোচনা করিব।”

এই বলিয়া ঠাকুরদাদা নিজে উঠিয়া দুইখানি পুস্তক বাহির করিলেন, একখানি ‘অনুশীলন’ অপরখানি ‘দেবীচৌধুরাণী’। প্রথমে ‘অনুশীলন’ ক্রোড়পত্র (খ) খুলিয়া নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি পাঠ করিলেন—

“সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন. আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত Ecce Homo এবং Natural Religion অনেকেই মোহিত করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার একটী উক্তি বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে। বাক্যটী এই “The Substance of Religion is Culture.’”

দেবীচৌধুরাণীর Motto হইতেছে এই মহাবাক্য—‘The Substance of Religion is Culture.’ এই পংক্তিগুলির টীকাতেও বঙ্কিম সংক্ষেপে লিখিয়াছেন “দেবী চৌধুরাণীতে।’

ঠাকুরদাদা আবার পাতা উল্টাইলেন। এবার ‘অনুশীলন’ অষ্টম অধ্যায়

খুলিয়া একটী পাদটীকা পড়িলেন—

"লেখক প্রণীত দেবীচৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।"

ঠাকুরদাদা বলিলেন "দেখ, দেবীচৌধুরাণীর প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লের অনুশীলনবিধি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকের পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর উপায়ের মধ্যে শারীরিক ব্যায়াম একটি। 'অনুশীলনে'ও ঠিক এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। ভবানী পাঠকও প্রফুল্লকে বলিতেছে "দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।" প্রফুল্লের শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন এইরূপে হইয়াছিল। মানসিক বৃত্তির অনুশীলন ভবানী-ঠাকুর নিজে কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় ও যোগ শিখাইয়া সম্পন্ন করিলেন। আর প্রফুল্লের আহার, পরিচ্ছেদ, শয়ন প্রভৃতির যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অনুশীলনের এই পংক্তিটি পড়িলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।—

"আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি প্রভৃতি সহ্য করিতে পারা চাই।"

ঠাকুরদাদা এবার চাকরকে ডাকিলেন চাকর তামাক দিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাম্রকূট সেবন করিয়া পুনরায় বলিলেন "দেবীচৌধুরাণীকে যখন ইংরাজের সিপাহী ঘিরিয়াছে তখন কি কৌশলে ঝটিকার সাহায্য লইয়া দেবী পলাইল তাহা মনে আছে ত? দেবী ভবানীঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইল, আমার রক্ষার জন্য ভগবান্ উপায় করিয়াছেন, আকাশপানে চাহিয়া দেখিবেন। পাঠকের মনে হয়, ভগবান্ Miracle দ্বারা ঝড় সৃষ্টি করিয়া দেবীচৌধুরাণীকে বাঁচাইলেন। যাঁহারা Miracle জানেন না, তাঁহারা এ বর্ণনাকে অসম্ভব বলিবেন। তাঁহাদের জন্য যে যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা "দেবীচৌধুরাণী"তে নাই, কিন্তু "অনুশীলনে" আছে, সে যুক্তি এই, পড়িয়া দেখ।"

আমি পড়িলাম—

"একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে; কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিষ্ফল হয়! বিশেষ যে ভক্ত, 'দক্ষ' ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত সুতরাং সে অতিশয় কার্য্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াও, আত্মরক্ষা করিতে করিতে পারিবে, ইহা কি অসম্ভব!"

এই অংশটির পাদটীকায় বঙ্কিম লিখিয়াছেন—"ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহীহস্ত হইতে দেবীচৌধুরাণীর উদ্ধার বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে, সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজ দক্ষতা। দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তি-ব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।"

ঠাকুরদাদা আর কিছু মত প্রকাশ করিলেন না। আমি ঠাকুরদাদার দেবীচৌধুরাণীখানি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। এখানি প্রথম সংস্করণের একখানি গ্রন্থ। টাইটেল পেজে লিখিত আছে—

দেবীচৌধুরাণী।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯১

মূল্য ২৲ টাকা।

আমি বলিলাম "আচ্ছা, ঠাকুর্দ্দা। প্রথম সংস্করণ যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, পরে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি?"

ঠাকুরদাদা। তুমি ত, 'রাজসিংহ', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিবর্ত্তন মাসিকে লিখিয়াছ, এই বিষয়টার খোঁজ রাখ না?

আমি। ১২৮৯, ও ১২৯০ সালের বঙ্গদর্শন কোথাও পাই নাই। তবে প্রথম সংস্করণটি একবার দেখিয়াছি। আপনি যখন ধরিয়া ফেলিয়াছেন তখন স্বীকার করাই ভাল যে প্রথম সংস্করণের সহিত শেষ সংস্করণ মিলাইয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু আপনার মুখে এ বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

ঠা। তিনটি স্থলে পরিবর্ত্তন হয়। ত্বইটি পরিবর্ত্তন প্রফুল্ল-চরিত্রে। তৃতীয় পরিবর্ত্তনটি বিশেষ কিছু নয়, কেবল, ব্রজেশ্বর-সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ মন্তব্য উঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সাগরকে বলিল ঃ—

"না গিয়া কি করিব ? আর কি জন্য থাকিব ?

সা। একবার দেখা করবে না ?

প্র। কার সঙ্গে ? তোমার সঙ্গে ?

সা। দূর, যেন হাবি ! শ্বশুরবাড়ী এসে কেবল সতীনের সঙ্গে দেখা করতে হয় ! আর কার সঙ্গে যেন দেখা করতে হয় না !

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল। বলিল "বুঝি নাই ভাই। স্বামীর সঙ্গে ? তা কি কপালে ঘটিবে ?"

সা। আমি ঘটাইব। তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও।

[দেবীচৌধুরাণী, প্রথম সংস্করণ।

দেখ, এইস্থলে প্রফুল্লের চরিত্র কি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় ? সে স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা এত কথার পর প্রকাশ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক ? এবং তাহার নিজেরই ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত। আর সাগরের মুখেও 'আমি ঘটাইব', এ উক্তি শোভা পায় না। তাই বঙ্কিম পরে উক্ত অংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া কি লিখিলেন দেখ।

ঠাকুরদাদা আর একখানি দেবী চৌধুরাণী বাহির করিয়া সেই স্থল খুলিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

প্র। না গিয়া কি করিব ? আর কি জন্য থাকিব ? থাকি, যদি—

সা। যদি, কি ?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল। চক্ষে জল পড়িল। বলিল "বুঝ নাই ভাই?"

সাগর তখন বুঝিল। একটু ভাবিয়া, একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও।"

ঠাকুরদাদা বলিলেন "কি সুন্দর এই পরিবর্ত্তন! প্রফুল্লের স্বামিদর্শনেচ্ছা, প্রবল লজ্জার সহিত কিরূপ দ্বন্দ্ব করিতেছে। সুন্দর ইঙ্গিতে প্রফুল্ল মনোভাব প্রকাশ করিল। সাগরও পূর্ব্বের ন্যায় বলিল না 'আমি ঘটাইব।" সে 'একটু ভাবিয়া, একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া' প্রফুল্লকে সন্ধ্যার পর তাহার ঘরে বসিতে বলিল। অতি উজ্জ্বল স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত হইল।"

আমি বলিলাম "আরও একটি গুরুতর দোষ বঙ্কিম সংশোধন করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে প্রফুল্ল মিথ্যাবাদিনী ছিল। বজরায় সাহেব যখন কে দেবী জানিবার জন্য দিবা ও নিশিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন আগেকার সংস্করণে এইরূপ ছিল।" এই বলিয়া আমি সেই স্থল বাহির করিলাম। প্রথম সংস্করণে ৩য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ছিল:—

"তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল 'আমি অতি ক্ষুদ্র চাকরাণী। আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কি জানি ইহার পর মিছা কথা ধরা পড়িলে যদি আমরা সকলে মারা যাই তাই বলিতেছি এ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য নহে।" পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল 'এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে রাণীজিকে মা বলে, রাণীজীকে মার মত ভক্তি করে, এইজন্য সে রাণীজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছি।' পরে দিবাকে দেখাইয়া বলিল 'এই যথার্থ রাণীজি'।

এই স্থলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, দেবীর উক্তি আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-নীতি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে গেলে গর্হিত বলিতে হয়। কেন না, কথাটা মিথ্যা কথা। ইহা পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বটে কিন্তু পাশ্চাত্য কার্য্য-প্রণালীর অনুমোদিত কি না তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। তবে দেবীর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁর সত্যবাদের ভাণ নাই। ভাণই ভয়ানক মিথ্যাবাদিতা। সরল নীতিশাস্ত্র ও জটিল কর্ম্মকৌশলের একত্র সমাবেশ হইতে

জগদীশ্বর মানবজাতিকে রক্ষা করুন।

আমি বলিলাম "দেবীর এই পরিচারিকা মূর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য বঙ্কিম ৩য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদের প্রথমে কি লিখিয়াছিলেন দেখুন।" এই বলিয়া আমি পড়িলাম—

"যোড়হাত করিয়া দেবী দিবাকে বলিল 'যদি হুকুম হয়, তবে কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ দেখি।'

দিবা বুঝিয়া বলিল 'অবশ্য। মর্ত্তমান রম্ভা, পাকা আঁব প্রভৃতি সামগ্রী বজরায় আছে।

দেবী তখন সাহেবকে সেলাম ও দিবাকে প্রণাম করিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।"

[প্রথম সংস্করণ, দেবীচৌধুরাণী।

ঠাকুরদাদা বলিলেন "পরে এ স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেবী নিজের প্রকৃত পরিচয় নিজেই দিতেছে।"

আমি নূতন সংস্করণখানি খুলিয়া পড়িলাম—

"তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'দেবী কে?' দেবী বলিল 'আমি দেবী।"

ঠাকু। দেবীর চরিত্র এই পরিবর্ত্তনে দোষলেশশূন্য হইল। এই গুণের জন্যই বঙ্কিমকে আমি এত ভালবাসি। বারবার সংশোধন, প্রতি পংক্তি, প্রতি শব্দ, প্রতি অক্ষর পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া দেখিয়া পরিবর্ত্তনাদি করিতেন। তাই তাঁহার পুস্তকগুলি এত নিখুঁত হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্লের পাল্কী ডাকাতে আক্রমণ করিয়াছে এই মনে করিয়া বাহক পলাইয়া গিয়াছিল বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মূল কোন্ ঘটনা জান?

আমি। শচীশবাবুর বঙ্কিম জীবনীতে পড়েছি, যাজপুরে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জামাতা পাল্কী করিয়া আসিতেছিলেন পথে ডাকাতে তাঁহাদের ঘেরাও করে। ষোলজন বাহক ঊর্দ্ধশ্বাসে পাল্কী ফেলিয়া পলাইয়া যায়। বঙ্কিম সাহসের সহিত দস্যুগণের সম্মুখীন হইলে দস্যুরা পলায়ন করে।

ঠাকু। আচ্ছা, ব্রজেশ্বরের উপর যে মন্তব্যটা বঙ্কিমচন্দ্র পরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা রাখা কি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না?

আমি। না ঠাকুর্দ্দা। তাহা উঠাইয়া দেওয়া ভালই হইয়াছে।

আমরা যে পরিত্যক্ত অংশের কথা বলিতেছিলাম তাহা প্রথম সংস্করণে ২য় খণ্ডের ১২শ পরিচ্ছেদে ছিল। তাহা এই—

"ব্রজেশ্বর মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে এ ডাকাইতির টাকা স্পর্শ করা যাইবে না। "তাহা হইলে আমরা সেই পাপীয়সী"র হায়, প্রফুল্ল এখন পাপীয়সী! "পাপীয়সীর পাপের ভাগী হইব।" কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিই সে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনের কারণ হইল। ....

ব্রজেশ্বর যদি বলেন যে "টাকা পাই নাই" তবে স্পষ্ট কথা হয়। ব্রজেশ্বর যদি একালের ছেলে হইতেন তবে ইংরেজি পড়িয়া Lie Direct সম্বন্ধে এ স্থলে কি বিবেচনা করিতেন বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রজেশ্বর সেকেলে ছেলে— একটা Lie Direct সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আর যেখানে ব্রজেশ্বর মিথ্যাকথা বলিতে পারুক আর না পারুক বাপের সম্মুখে নহে। মুখ দিয়া কখনও বাহির হয় নাই। ব্রজেশ্বর বলিতে পারিল না, 'টাকা পাই নাই'। ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ হতাশ্বাস হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, চুপ করিয়া কোথাও মিথ্যাবাদ হইতেছে। ব্রজেশ্বর টাকা আনিয়াছেন অথচ তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ বুঝিতে-ছেন যে ব্রজ টাকা আনে নাই। ব্রজেশ্বরের মোটা বুদ্ধিতে বোধ হইল যে আমি বাপকে প্রবঞ্চনা করিতেছি। আমার মার্জ্জিত-বুদ্ধি, মার্জ্জিত-রুচি মার্জ্জিত-পাঠক একেলে ইংরেজিনবিসের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধ হইত যে, 'আমি ত মিছে কিছুই বলি নাই—যেটুকু বলিয়াছি সাঁচা সত্য। তবে দেবী-চৌধুরাণীর টাকার কথা আমি বলিতে বাধ্য নই। কেন না সে টাকা ত আনিবার কোনও কথাও ছিল না। আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও হয় নাই। আর সে ডাকাতির টাকা গ্রহণ করিলে পিতৃঠাকুর মহাশয় পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন, অতএব সে কথা প্রকাশ না করাই আমার ন্যায় বিশুদ্ধাত্মার কাজ। বিশেষ, আমার মুখ দিয়া ত মিথ্যা বাহির হয় নাই—তা বাবা কেন জেলে যান না, আমি কি করব?' ব্রজেশ্বর তত বিশুদ্ধাত্মা নয়, সে, সে রকম ভাবিল না। তার বাপ মাথায় হাত দিয়া নীরব হইয়া

বসিয়াছে দেখিয়া তার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন "আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি।"

ঠাকু। দেখ, প্রফুল্লকে পাপীয়সী সম্বোধন করানটাও বঙ্কিমের ভাল হয় নাই। তাই পরে উহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতা-টুকুও নিস্প্রয়োজন। তাই ঠিকই বলিয়াছ যে পরিবর্ত্তনটি ভালই হইয়াছে।

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। আমি বলিলাম 'ঠাকুর্দ্দা, আজ উঠি, কিন্তু আগে তোমার বঙ্কিম-সম্বন্ধীয় কবিতাটা দেখাও।

ঠাকুরদাদার মেজাজটা আজ খুবই ভাল ছিল, সন্দেহ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বাক্স হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন তাহার মধ্যে অনেকগুলি টুকরা কাগজ। একখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন "আমার ছেলেমানুষি নিতান্তই দেখ্‌বে? তা দেখ। কিন্তু মনে রেখ, যখন এ কবিতা লিখেছিলাম তখন আমার বয়স কত!" ঠাকরদাদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। বোধ হয় তাঁহার মনে অতীত যৌবনের সুখময় স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আমি কবিতাটি লইয়া চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরদাদা রাগই করুন আর যাই করুন, তাঁহার কথাগুলি ও কবিতাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। কবিতাটি এই—

বঙ্কিমের প্রতি।

সম্মুখে সংস্কৃত-শৈল; পশ্চাতে আবার
গ্রাম্যভাষা জলাভূমি আবিল-সলিলা;
বঙ্গভাষা-নদী মাঝে; রুদ্ধ স্রোত তার
কভু ক্ষেত্রে ঢলে, কভু লঙ্ঘে শৈলশিলা।

হে বঙ্কিম! মায়াযষ্টি লেখনী-চালনে
ছুটাইলে সে তটিনী; মধু কলতান
পুঞ্জ পুষ্পপূর্ণ কুঞ্জে ভ্রমর-গুঞ্জনে
কখনও প্রণয়ীজনে শুনাইছে গান,

কভু উপন্যাসরূপ সলিলে তাহার,
দেখায় (মুকুরে যথা) ছায়া বিমোহন,
কভু ধর্ম্মনীতিরূপ ঢালিছে আসার
তৃষাতুরকণ্ঠে, দানি নবীন জীবন।
কত সৃষ্টি! হাস্য অশ্রু, আলোক, আঁধার,
কভু বজ্রনাদ, কভু মুরলীনিক্কণ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

—:০:—

অদেখাকে দেখা। *

——:০:——

লাফ্‌কাডিও হার্ণ জাপানীদের বন্ধু; তিনি সুবিদ্য—তিনি সুপ্রতিভ লেখক।

হার্ণের বয়স তখন উনিশ। সেই বয়সে তিনি এক সম্পাদকের কাছে গেলেন এবং সংবাদদাতার পদ প্রার্থনা করিলেন।

হার্ণ দেখিতে বেশ সভ্য-ভব্য ছিলেন না। তিনি কৃশতনু হরিদ্বর্ণাভ এবং ঈষৎ কুব্জপৃষ্ঠ।

সম্পাদক অবাক্!

হার্ণের গায়ের কাপড়চোপড়গুলা তাঁর অস্থিসার দেহের উপরে এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছিল।

সম্পাদক মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

"কি হে ছোক্‌রা, কি চাও তুমি?"

"আপনার কাগজের সংবাদদাতা হ'তে চাই।"

"বটে, বটে, কি হতে চাও?"

"সংবাদ-দাতা।"

---

* ইংরাজী হইতে।

সম্পাদকের আস্যে আবার হাস্যরেখা! তাহা উল্লাসের উচ্চহাস্য নয়। তাহা উপহাসের হাসি। তাহা অবহেলার গাল্-টেপা হাসি!

"বেশ, বাপু বেশ,—তুমি কাজ পেলে। তোমার প্রথম কর্ম্ম কি জান? ঐ যে দেখ্‌চ রাস্তা, আর রাস্তার ওপারে ঐ যে দেখ্‌চ উঁচু মন্দির; একদম্ ওর 'টঙে' উঠে চ'ড়ে বসগে'। তার পর, ওখানে বসে যা' যা' দেখ্‌বে নেমে এসে তার বর্ণনা লিখে আমার হাতে দিতে হ'বে। বুঝ্‌লে হে ছোক্‌রা? যাও!"

হার্ণ মন্দিরের উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরে—উপরে—আরও আরও উপরে, ক্রমে বিপুল শূন্যে! মন্দির-চূড়ায় বসিয়া হার্ণ উর্দ্ধে চাহিলেন। কি নীল, ঐ নিথর আকাশ! যেন অনাদির সাকার আভাস! যেন ভূমানন্দের শরীরী বিকাশ!

তিনি নীচের দিকে চাহিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি অল্প,—নাই বলিলেও চলে। তাঁর মনে হইল, পৃথিবীর দৃশ্যপটের উপরে কে যেন তিমির-তুলিকা বুলাইয়া দিয়াছে। তিনি অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। তাঁর নজরে পড়িল সুধু কুয়াশার একটা পুরু পর্দ্দা,—ধোঁয়া আর ধোঁয়া আর ধোঁয়া, তাঁর শ্রবণে বাজিল একটা গুঞ্জন—মৃদু, অস্পষ্ট, বিষাদমাখা! সে যেন কার বুকভাঙ্গা কান্নার আধ্‌ফোটা অনুরণণ।

কিছুই দেখিতে না পাইয়া, হার্ণ মন্দির-চূড়ার উপরে আপনার ভক্তিমাখা চুম্বনের দাগটী আঁকিয়া দিলেন। তারপর নীচে নামিয়া আসিলেন,—ধীরে, ধীরে, ধীরে!

তিনি আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজের ছোট ঘরটিতে গিয়া বসিয়া লিখিতে সুরু করিলেন।

হার্ণ এক অমর নিবন্ধ লিখিলেন।

তিনি সহর-জোড়া রাস্তাগুলির কথা বলিলেন। সহরের ক্রমাতিসূক্ষ্ম তরুশ্রেণীমধ্যগত দীর্ঘ পন্থা, তাহার জলবেণীসুষমা তটিনী, প্রাণরঞ্জক আরাম-কুঞ্জ, অদূরে দৃশ্যমান শ্যামলিত কানন-শ্রী এবং ধূমধূমল শৈলমালার ব্যোম-চুম্বিত শৃঙ্গ,—তাহাদের কথাও বলিলেন। তিনি নগর-ভরা মালগুদাম, ছোট বড় দোকান, সরাইখানা, কলকারখানা আর দেবালয় আর সুরা-

বিপণির কথা বলিলেন। তিনি ধনীর রং-রাঙ্গা, সাজানো প্রাসাদ, এবং গরিবের ভাঙ্গাচোরা, জল-ঝরা কুঁড়ের কথাও বলিতে ভুলিলেন না।

সুধু এই নয়,—তিনি আরও দেখিলেন, সহরের গোপন অন্তঃপুরে কোথায় কি দৃশ্য! দেখিলেন, মূর্ত্ত আত্মহত্যা; হস্তে তাহার রক্তসিক্ত অস্ত্র! চক্ষুঃ তাহার অক্ষিকোটরমধ্য হইতে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে!

দেখিলেন, পুলকপাগল মানুষদিগকে! সাফল্যে তাহারা উন্মত্ত, দেমাকে তাহারা ডগমগ, বড়াই করিয়া তাহারা কহিতেছে, "আর কি, কেল্লা ফতে! এবার যা কর্ব্ব, তা কেউ কখনো শোনে নি।"

দেখিলেন, মহা শ্মশান। ধূ ধূ চিতানল জ্বলিতেছে, মোহন বপু—টানা চোখ, রাঙ্গা ঠোঁট, যৌবনের ভরা রূপ পুড়িয়া পুড়িয়া সব খাক্ হইতেছে। কোথাও সবে-আনা শব মাটীতে পড়িয়া আছে,—কি মৌন, কি নিশ্চেষ্ট, কি অসহায়! পাশে দাঁড়াইয়া এলোকেশী পতিহীনা সতী,—পিতৃহারা মানবক হাহাকারে ফাটিয়া মরিতেছে।

দেখিলেন, পাটলবসনা পুষ্পিতযৌবনা স্মিতাননা ললনাদিগকে। জীবনের ভোরে প্রাণ-সরকে তাহারা প্রেমের প্রথম মদিরায় সবে এই চুমুক দিতেছে। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া কুব্জক্রোড় কুৎসিত, প্রকটাস্থি, শিথিলমাংস স্ত্রীলোকেরা দন্তহীন মুখে জীবনকে এবং জীবনদত্ত প্রসাদকে অভিশাপ দিতেছে।

দেখিলেন, টুক্‌টুকে লাল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, বাগানের সবুজ ঘাসের বিছানায় ছুটাছুটি করিতেছে, যেন বাতাসে ফুলের পাপ্‌ড়ি উড়িতেছে। রাস্তা দিয়া বর-কনে চলিয়াছে,—বড় ঘটার মিছিল। বাড়ীর ভিতরে বিয়ের ভোজ হইতেছে। বাড়ীর বাহিরে অনাহারী দীন, পেটের জ্বালায় নিজের হাত কাম্‌ড়াইয়া মরিয়া পড়িয়া আছে।

দেখিলেন, মাতালেরা বাড়ী ফিরিতেছে। শিশুরা ভয়ে খাটের তলায় লুকাইল। পদাঘাতে নীরবে বুক পাতিয়া দিল, তাহার ঘরণী।

দেখিলেন, হিংসা ও ঘৃণা, জিঘাংসা ও লালসা এবং বিশ্বগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর চক্রান্তশীল মহা গর্ব্ব। তিনি দেখিলেন,—এক কথায়—সত্য সত্যই

দেখিলেন, উতলা, অশান্ত এবং দুর্ব্বল জনসংঘ, যাহাকে আমরা বলি, মানব-সমাজ। তিনি তাহাদের অসম্পূর্ণতা এবং পৈশাচিকতার এক কুসংস্কার-মলিন মূর্ত্তি দেখিলেন। সে মূর্ত্তি গর্ব্বিত, নিষ্ঠুর, কৃতঘ্ন এবং মূর্খতাজন্য দর্পিত। সেই সঙ্গে তিনি দেখিলেন, আত্মমগ্ন প্রেমকে। যাতনার পশরা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তবু সে মৌনব্রতী এবং করুণাপেলব।

তিনি সুধু নগরের বর্ত্তমানকে দেখিলেন না,—দেখিলেন ভবিষ্যৎকেও। ভবিষ্যতে তাহার নির্ম্মল, নিয়মাধীন, সসম্মান, সুন্দর, মিলন-পিপাসী, পরস্পর-বাধ্যতায় নম্র এবং সাধু ইচ্ছাযুক্ত মূর্ত্তিও দর্শন করিলেন।

এইরূপে তিনি অতীত দেখিলেন; তিনি বর্ত্তমান দেখিলেন এবং তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টি নেত্র দূর ভবিষ্যকেও দেখিল,—তথায় স্বাস্থ্য ও সুখ এবং ন্যায় ও প্রেমের বিচিত্র সমাহার।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

——:০:——

যদিও আধুনিক পারসী ধর্ম্মের সেই বলিদানপ্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা বিদ্যমান আছে তাহার সহিতও বৈদিক বলিপ্রথার বহু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

৬। বলিদান।

জেন্দ্ আবেস্তায় পুরোহিতকে "আথ্রব" বলে, ইহা বেদোক্ত অগ্নি ও সোমের যজমান বা "অথর্ব্বন্!" বৈদিক বাক্যাবলী যথা,—ইষ্টি, আহুতি, জেন্দাবস্তার "ঈষ্টি" ও "আজাইতি"তে পরিণত। অধুনা পারসীদের ভাষায় উহার অর্থ—"উপহার" ও "প্রার্থনা" দাঁড়াইয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র-পাঠকারী "হোতা" জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের "হাওতা।" বৈদিক যজ্ঞের বিঘ্ননিবারক কাষ্ঠ-অসিধারী। "প্রতি প্রস্থাতা" প্রাচীন পারসী

৭। পুরোহিত যজ্ঞ।

ধর্ম্মের তৎকার্য্য নিযুক্ত "স্রোসাবয়েজা।" জোরোয়াস্তার যজ্ঞের অগ্নি-সম্বলিত পাত্রের রক্ষাকারী "অটরেবক্সো" ব্রাহ্মণগণের "অগ্নিধ্র।"

আধুনিক পারসী পুরোহিতবর্গ অনুষ্ঠিত "ইয়াগ্নি" যজ্ঞে প্রাচীন সোমপর্ব্ব "জ্যোতিষ্টোমে"র সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ—জ্যোতিষ্টোমের প্রথমে সম্পাদিত হইত। ইহাতে বলি হইত চারিটী ছাগ। এই ছাগমাংস দেবমানব-মধ্যস্থ অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপ করতঃ দেবগণকে আহুতি দেওয়া হইত ও অবশিষ্ট মাংস পুরোহিত ও হোতাগণ ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু "ইয়াগ্নি" যজ্ঞে কোন প্রাণীহত্যা হয় না। ব্রাহ্মণগণের "পুরোডাশ" বা পিণ্ড পরিবর্ত্তে পারসীগণ "দারুস্" নামে এক প্রকার পিষ্টক প্রদান করেন।

ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞের প্রারম্ভে প্রয়োজনীয় "উদক শান্ত" জোরোয়াস্তার যজ্ঞের "জাওথ্র"।

"জ্যোতিষ্টোম" ও "ইয়াগ্নি" যজ্ঞের সর্ব্বপ্রথম দ্রব্য সোমরস। উভয়েতেই যজ্ঞকালে সোমলতা আনীত হয় ও তাহার রস প্রস্তুত করা হয়। পারসীগণ সোমকে "হোম" ও সোমরসকে "পরহোম" বলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গ সোমরস পান করিবার পূর্ব্বে তাহা অগ্নিমধ্যে প্রদান পূর্ব্বক দেবগণকে নিবেদন করিতেন, কিন্তু পারসী পুরোহিতগণ সুধু অগ্নি দেখাইয়াই তাহা পান করিতেন।

বেদের "আশ্রি" যজ্ঞ পারসীর "আফ্রিহান," ব্রাহ্মণ ও পারসীগণের এই যজ্ঞে মৃত ব্যক্তি বা দেবগণ তাঁহাদের আপনাদের জন্য প্রস্তুত খাদ্যের অংশ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রিত হন।

ব্রাহ্মণের "দর্শপূর্ণম্" ইষ্টি পারসীগণের "দারুস্"। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণবর্গ পুরোডাশ ও পারসীগণ দারুণ ব্যবহার করেন।

প্রাচীন হিন্দুর "চাতুর্মাস্য ইষ্টি" জোরোয়াস্তার "গাহন বার" যজ্ঞ। এই যজ্ঞে পশুবলি উভয় ধর্ম্মেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বলিদত্ত পশুর কিঞ্চিৎ মাংস দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু পারসীগণ কেবল অগ্নিকে উহা দর্শন করাইয়াই মাংসভাবে উহা ভোজন করেন।

আধুনিক ব্রাহ্মণ কেবল অগ্নিকে প্রদর্শন করাইয়াই তাহা ভোজন করেন।

আর পাকক্রিয়াকালে যদি দুই এক খণ্ড মাংস অগ্নিতে পতিত হয় তবেই প্রাচীন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়!

৮। ধর্ম্মরীতি, গার্হস্থ্য আচার ও সৃষ্টিমত।

পারসীগণের গোমূত্র (গোমেজ) দ্বারা শোধনক্রিয়া হিন্দুর মত। হিন্দুর মতে "পঞ্চগব্য" দ্বারা শরীরাভ্যন্তরীণ অশুদ্ধতা নিবারিত হয়। ইহা শরীরের অসুস্থতার পক্ষেও উপকারী অধুনা এই গোমূত্রগ্রহণপ্রথা ইউরোপেও প্রচলিত।

যজ্ঞোপবীত (কুষ্টি) গ্রহণ ব্রাহ্মণ ও পারসী উভয় ধর্ম্মেই কর্ত্তব্য। যতদিন পর্য্যন্ত এই উপবীত গ্রহণ করা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জোরোয়াস্তার বা ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে কাহাকেও গ্রহণ করা হয় না। ব্রাহ্মণের মধ্যে ইহার গ্রহণকাল অষ্টম হইতে ষোড়শ বর্ষ এবং পারসী-গণের কুষ্টিগ্রহণ সপ্ত বর্ষমধ্যেই সমাপিত হয়।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উভয় ধর্ম্মেই এক। কোন লোকের মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা স্বর্গে প্রেরণ করিবার জন্য উভয় ধর্ম্মেই প্রার্থনা গীত হইত। মৃত্যুর ১০ দিবস পর পারসীগণ "ইজস্নি" পাঠ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করেন।

সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ সমগ্র পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে ও পারসীগণ সপ্ত "কেশ্বরে" (আবেস্তার "কর্ষভের) বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর কেন্দ্রকে সুমেরু পর্ব্বত বলেন, পারসী বলেন "অলবর্জ" (Elburz ?) (আবেস্তার "হরোযেবিজাইতি")।

জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম।
১। তাহার উদ্ভব।

বেদ ও জেন্দ আবেস্তার প্রাচীন অংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে, জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম বহু পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণের সহিত মতভেদ বা বিবাদ হইতে উদ্ভূত। আবেস্তায় ও বেদে অসুর শব্দ দেবার্থবাচক দেখিয়া বোধ হয়, যে যখন উভয় ধর্ম্ম এক ছিল, তখন আর্য্যগণ অসুরকেই দেব অর্থে পূজা করিতেন। তারপর কোন বিপ্লব উপস্থিত হইল, আর্য্যগণ "অসুর" ও "দেব" ধর্ম্মে বিভক্ত হইয়া গেলেন। অসুর ধর্ম্মাবলম্বী জোরোয়াস্তারগণ দেবধর্ম্মাবলম্বী পৃথিবীর অন্য আর্য্যগণ হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। দেবধর্ম্ম

জোরোয়াস্তার ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্মকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইল। তাহার প্রমাণ জোরোয়াস্তার ভিন্ন সমস্ত আর্য্য ধর্ম্মে দেব ও স্বর্গনামের একত্ব।*

এই ধর্ম্মবিপ্লবকর্ত্তারা বোধ হয় ভারতাগত ব্রাহ্মণগণ; কারণ জেন্দ আবেস্তায় বর্ণিত ইন্দ্র, সার্ব্বদেব নাসত্য ইত্যাদি দেবগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য আর্য্যজাতির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন।

পাঠক! পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন যে, এক দেবতাই আবেস্তাতে ভিন্ন-নামধারী হইয়া "দিব" ও "অহুরে" পরিণত হইয়াছে। যথা, ইন্দ্র। ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মবিপ্লব ব্রাহ্মণ ও জোরোয়াস্তার-গণকে বিভক্ত করিয়াছিল তাহা কোন্ সময়ের। বোধ হয় যখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট দেবশ্রেষ্ঠরূপে পূজিত হইতেন তখন ইহা সম্পাদিত হয়, তখনও ব্রাহ্মণগণ হিন্দুস্থানে পদার্পণ করেন নাই। এই সময়েই সুললিত বেদগান রচিত হয়। ইহার পরে হইতে পারে না, কারণ বেদোক্ত দেবতার পর হইতেই ত্রিমূর্ত্তি অবতার না। যদি পরে হইত তবে জেন্দ আবেস্তাতেও ত্রিমূর্ত্তির কথা থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। তবে জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের উদ্ভব ইহারও পূর্ব্বে।

জোরোয়াস্তারের গাথাতে দেবগণের পুরোহিত প্রভৃতি "কবি," "উসিক্ষ," "করপনো"। বেদগীতে প্রথমটী ও দ্বিতীয়টীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদে আছে,—

"কবি, সদা স্তুতিশীল যজমানদিগের মিত্র, মেধাবী দৈব্য হোতৃদ্বয় এবং শুচি ও দেবগণের মধ্যস্থা হোম নিষ্পাদিকা ভারতী ইলা, এবং সরস্বতী যজ্ঞার্থ উপযুক্ত হইয়া কুশোপরি উপবিষ্ট হউন (১ম।১৪৩।৮,৯)।"

দেবগণ বিশেষতঃ ব্রহ্মণস্পতি এই নামে উক্ত (ঋ ২ম।২৩।১); ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, কবি তখন একটী সম্মানপ্রদ উপাধি ছিল।

"উষিজ" এই নামেরই অর্থবোধক। ইহাই গাথার "উসিক্ষ" অর্থ "জ্ঞানী, মনীষি ব্যক্তি" (ঋ ২।২১।৫ ; ১০।৪৬।ই)

---

* হিন্দুগণ—দেব ও দ্যুস্; Lithuanianগণ Diewas; Greekগণ Dens, or Zens বা Dios; প্রাচীন Teutonicগণ Tins; Anglosaxonগণ Tives, ইত্যাদি।

"করপনো" গাথাতে কবিদিগের সহিত উল্লিখিত ; ইহা হইতেই আমরা বুঝি যে, ইনি যজ্ঞ পুরোহিত যাহাকে ব্রাহ্মণগণ বলেন "শ্রোত্রিয়"। ব্যাকরণ মতে ইহা "করপ্" ধাতুইতে উদ্ভূত এবং ইহা সংস্কৃত "কল্প" ধাতু (যজ্ঞ সম্পাদন করা) হইতে আগত যাহা হইতে "কল্পা" (ধর্ম্মসংহিতা) হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কবি-আখ্যা প্রাচীন ইরাণের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, "কবি হুস্রভ্ (কই হুস্রো), কবি কবাত (কাই কবাদ), কবি বিবিস্তস্প (কইগুস্তাস্প) এবং ইহা হইতেই প্রাচীন "বকৃট্রিয়" শাসক-বংশের উপাধি "কায়া পিয়"।

আচ্ছা, যে নাম জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের তীব্র শত্রু-পরিচায়ক সে নাম সম্মানপ্রদ উপাধিরূপে তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ পোষকগণের নামের সহিত ব্যবহৃত হইত কেন ?

উত্তর বোধ হয় ইহাই হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সেই ধর্ম্মমতভেদ জাগিবার পূর্ব্বে, যখন ইরাণ ও ব্রাহ্মণগণ একত্র ছিলেন, তখন কবিরা উভয় সম্প্রদায়েরই নেতা ছিলেন। তাহার পর যখন মতের পার্থক্য উপস্থিত হইল, যখন বিভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায় স্ব স্ব মত লইয়া পৃথক হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে কবি-নাম ঘৃণিত বলিয়া দেব ভিন্ন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু যে উপাধি তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা রক্ষিত হইল এবং প্রধান প্রধান যোদ্ধা, নায়ক, নৃপতিদিগের সম্মান-পরিচায়ক বলিয়া জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম তাঁহাদের নামের সহিত ব্যবহার করিলেন।

২। ধর্ম্মমত ভেদের কারণ ?

আর্য্যদিগের মতভেদের কারণ জেন্দ্ আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ, বিশেষতঃ গাথা হইতে বোধগম্য হয়। আর্য্যগণ যখন আপনাদের শৈত্যপ্রপীড়িত, আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহারা প্রধানতঃ—ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতেন এবং সময় সময় আপনাদিগের জীবন-ধারণের জন্য কিছু কিছু ভূমি কর্ষণ করিতেন। ক্রমে বিভিন্ন আর্য্যগণ বিভিন্ন স্থানে প্রধাবিত হইলেন। তন্মধ্যে ভারতাগত আর্য্য ব্রাহ্মণগণ তখনও "পঞ্চ নদীর তীরে" উপস্থিত হন নাই। ইরাণদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ স্থান-

পরিবর্ত্তনে ক্লান্ত হইয়া অক্সাস্ ও জ্যাক্জারটিশ্ নদীদ্বয় মধ্যস্থিত ভূভাগে ও বাক্‌ট্রিয় উপত্যকায় আগমন পূর্ব্বক তথায় চিরস্থায়ী বাস নির্ব্বাচন করিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে সংসারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট আর্য্যগণ তখনও ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইরাণদিগের ধনসম্পত্তি-অবলোকনে হিংসাকে দমন করিতে পারিলেন না। সুযোগ পাইলে তাঁহারা তাহাদের ধনাদি লুণ্ঠন করিতেন।

তখন অবশিষ্ট আর্য্যগণের মধ্যে দেবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাহার প্রচারার্থ ইরাণে আসিলেন। যদিও ইরাণগণ তাহাদিগের ধর্ম্ম ও আপনাদিগের ধর্ম্ম একই মনে করিতেন, তবুও তাঁহারা ধনাপহারকদিগের ধর্ম্মের সহিত আপন ধর্ম্মের একত্বসূত্র ছিন্ন করিলেন। তাঁহাদিগের মতে দেবধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মের আগার বলিয়া বিবেচিত হইত, তাই তাঁহারা সে ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিলেন। পরন্তু দেবধর্ম্ম-বর্ণিত দেবগণকে আপনাদের "দিব" বা দানব আখ্যা প্রদান করিলেন, দিব ধর্ম্ম দানবধর্ম্ম হইয়া গেল। এইখানে জোরোয়াস্তারগণের সহিত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃবর্গের বিচ্ছেদ হইল।

ব্রাহ্মণগণ তখন আপনাদিগের দেবধর্ম্মসহ সরস্বতীর তীরে।

এই "অহুর" ধর্ম্মের উদ্ভাবনা কেবল মাত্র এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়, এই ব্যক্তির নাম "স্পিতম জোরোয়াস্ত্রা।"

৩। স্পিতম জোরোয়াস্ত্রা, জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের উদ্ভাবক; কালনির্ণয়।

গাথাতে আমরা দেখিতে পাই যে, জোরোয়াস্ত্রা বহুস্থানে প্রাচীন দেববাণীকে সম্মান করিয়াছেন এবং "সয়োসান্তো"র (অগ্নি পুরোহিত) জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন। তিনি আপন দলকে "অঙ্গর"কে (বেদের অঙ্গিরস্) সম্মান করিতে উত্তেজিত করিতেছেন।

গ্রীক ও রোমাণগণ ইঁহাকে বহু প্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করেন। সর্ব্বপ্রথম গ্রীক লেখক লিডিয়াবাসী Xanthos, যিনি ৪৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি জোরোয়াস্ত্রাকে ট্রোজান যুদ্ধের (১৮০০ খৃঃ পৃঃ) ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বলিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি ২৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বের লোক।

এরিষ্টটল এবং এণ্ডোক্সাস্ ইঁহাকে প্লেটোর ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বলেন।

ব্যাবিলোনীয় ঐতিহাসিক বিরোসেস্ ইঁহাকে ব্যাবিলোনের রাজা এবং সেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। এই রাজবংশ ব্যাবিলোনে ২২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহা হইলে তাহার সময় হইল ২২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে Xanthosএর কথার সহিত মাত্র দুই শত বৎসরের অসামঞ্জস্য।

পারসীগণ বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা দারিয়াসের পিতা হিস্তাস্পেসের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। এই হিস্তাস্পেসই আবেস্তার বর্ণিত "কর বিস্তাস্প"। অতএব তিনি মাত্র ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই ভ্রম হিস্তাস্পেস ও বিস্তাস্পের বংশ-আলোচনাতেই দূরীভূত হইবে।

গ্রীক ইতিহাসের জনক হেরোটোডাস্ হিস্তাস্পের বংশ এইরূপ বলিতেছেন,—প্রথম Achaemenes, তৎপুত্র Teispes, তৎপুত্র Ariaramnes, তাঁহার পুত্র Arsames, তদীয় পুত্র Hystaspes ও তাঁহার পুত্র Darius.

কিন্তু আবেস্তায়, "কবি করাতে"র (কাইকবাদের) পুত্র "কব উষা" (কাই কাউষ), তৎপুত্র "কব সুশ্রব" (কই খুশ্রো), তাঁহার পুত্র "ঔর্ব্বদস্প" (ললু বাস্প), তদীয় পুত্র "বিস্তাস্প" (কইগুষ্টাস্প)। অতএব ইরাণদিগের বিশ্বাস ভুল।

বেদের সময় নির্দ্ধারিত হইলেই বোধ হয় তাঁহার অবস্থানের মোটামুটী কালনির্ণয় হয়। ঋগ্বেদ্-রচনার কালমধ্যেই বোধ হয় জোরোয়াস্ত্রার জন্মকাল। কিন্তু বেদের কাল নির্দ্ধারিত হয় নাই।

আমি কয়টী মাত্র পাশ্চাত্য মনীষীর মত উল্লেখ করিতেছি, পাঠক বিচার করিবেন।

Sir Roper Lethbridgeএর মতে,—"......it is believed that some of these (Bedic) writings were composed more than 3200 year ago. তবে ১৩০০ খৃঃ পূর্ব্বে! W. W. Hunter সাহেবের মতে বেদ ১৪০০ খৃঃ পূর্ব্বেরও পূর্ব্বে (?) বলা হইয়াছে। J. C. Marshman

সাহেবের মত তাহাই। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক V. A. Smith সাহেব কলিযুগ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ আবার ২৫০০ খৃঃ পূর্ব্বেও বলেন। যদি মহাভারত বেদের পূর্ব্বে না হয়, যদি সত্য কালে সেই সত্য বেদের প্রচার হইয়া থাকে, তবে সে কাল কতদিন পূর্ব্বে?

শ্রীতারানাথ রায়।

গঙ্গাবক্ষে।

(১)

গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া বালিকা ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার কচিমুখ-খানিতে ঘর্ম্মবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল। বালিকার সুদীর্ঘ রুক্ষ কেশগুচ্ছ মন্দ পবনে দুলিতেছিল। পরিধানে একখানি ছোট ময়লা কাপড়। তাহার ভাল দিকটি পরিয়া ছেঁড়া দিকটি দিয়া কোন ক্রমে সে তাহার উন্মুখ যৌবনের অতুল লাবণ্যরাশি ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বালিকার অনিন্দ্য রূপরাশি নব বসন্তের ঈষৎ বিকসিত গোলাপ-কোরকের ন্যায় ছিন্নপত্রের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। হাতে কেবল দুগাছি কাচের চুড়ী।

বালিকা ছুটিতে ছুটিতে হাঁফাইয়া পড়িয়াছে। তবুও বিরাম নাই। তাহার মুখখানি যেন কি একটা অপ্রত্যাশিত বিপদের কল্পনায় শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। রাস্তার পাশে কাঁটাবনে তাহার কাপড় আটকাইয়া গেল; বালিকা থামিয়া বহু কষ্টে আঁচলখানি কণ্টকমুক্ত করিয়া ছিন্ন অংশে একটি গাঁইট লাগাইল। তাহার পায়ে একটি বড় কাঁটা ফুটিয়া গেল; সে রাস্তার উপর বসিয়া পড়িল। বালিকার কোমল চক্ষুদুটি জলে ভরিয়া আসিল। ক্ষতমুখ দিয়া রক্তবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দিকে চলিল। বালিকার ঘন ঘন পদক্ষেপ দেখিয়া মনে হয় যেন দৌড়িতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার ভয়ানক দুঃখ হইতেছে।

সে অতিকষ্টে রামতারণবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া ক্ষীণ ও করুণ কণ্ঠে ডাকিল, "সুরু দা!"

বালিকার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর মধ্যাহ্নের ঘোর স্তব্ধতায় প্রাণ হারাইল। বালিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "সুরু দা, সুরু দা বাড়ী আছেন?"

কেহই তাহার কথায় উত্তর দিল না। রামবাবুর পুকুর পাড়ের বটগাছে একটি শালিক পত্নীর সহিত ঘোর ঝগড়া আরম্ভ করিল। রামবাবুর একটা দেশী কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বালিকার মুখের দিকে একবার ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উঠানে শুইয়া পড়িল। একঝাঁক পারাবত সাঁ করিয়া উড়িয়া আসিয়া যেই বৈঠকখানার সম্মুখে বসিয়াছে, অমনি কুকুরটি সিংহবিক্রমে ঘা ঘা শব্দ করিতে করিতে তাহাদের উপর পড়িল। লক্ষের পূর্ব্বে তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়াছিল তাই ক্রোধান্ধ দুর্ব্বলের নিষ্ফল গর্জ্জনের ন্যায় দুই একবার বিকট চীৎকার করিয়া সে আবার পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া শয়ন করিল।

ঠিক এই সময় বালিকা আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "সুরু দা, ও সুরু দা, সুরু দা বাড়ী আছেন।"

প্রাবৃটের গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, গভীর বনানী মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্র-হুঙ্কারের ন্যায় নিস্তব্ধ বৈঠকখানার গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া উত্তর আসিল, "কেরে?"

বালিকার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম-বিন্দু বাহির হইল। নিঃশ্বাস ঘন ঘন বাহির হইতে লাগিল। বহুকষ্টে ভীতিজড়িত কণ্ঠে বালিকা আবার উত্তর দিল, "আমি সুরু দার কাছে এসে-ছিলাম। তাঁকে খুঁজছি।"

বালিকার গলার স্বরে সে চিনিতে পারিয়াছিল। আরও ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন সুরু দা কি করবে? দুপুর বেলা জ্বালাতে এসেছ।"

"মার বড় অসুখ"

"মার অসুখ ত সুরু দার কি! সে কি ডাক্তার? যা বেরো এখান থেকে।"

মার যে বড় অসুখ গো, সুরু দা না হলে কে ডাক্তার ডাক্‌বে”

“কেন সুরু দা কি তোর বাবার মাইনে-করা চাকর?”

বালিকার অশ্রু আর প্রবোধ মানিল না। তাহার অধর দুঃখে ও ক্রন্দনের আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিল সুরু দা না হইলে আর মার বাঁচিবার উপায় নাই। তাই সে আবার বলিতে লাগিল।

“আমার মা কেমন হ’য়ে পড়েছে। তেষ্ঠায় তার গলা শুকিয়ে আস্‌ছে। বাড়ীতে কিছু নাই। সুরু দা বলেছিলেন, যখন অসুখ বেশী বলে বোধ হবে তখন তাঁকে খবর দিতে।”

রামতারণবাবু আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না। বালিকার কাতর আবেদন তাহার হৃদয়ে যেন বিষবাণ মারিতেছিল। দরজার সম্মুখে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তবে রে বেটি বার বার বলছি শুন্‌তে পাচ্ছিস না। দুপুর বেলা ঘুমের সময় এখানে বিরক্ত কর্‌তে এসেছিস্‌, বেরো এখান থেকে।”

বালিকা রামতারণবাবুর কৃষ্ণবর্ণ বিশাল দেহ, ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত আবরণহীন উদর, জবাফুলের মত দুটো বড় বড় চোখ দেখিয়া ভয় পাইল। তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইতেছিল; কিন্তু কি করিবে এ দিকে যে মা মারা যায়! আরও বিনীতকণ্ঠে বলিল, “জ্যেঠা মশায়, মা আর বাঁচবেন না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি একবার সুরু দাকে ডেকে দিন।”

বালিকার ছিন্ন অঞ্চল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। তাহার করুণ আবেদন রামতারণবাবুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণ আকুল করিতে পারিল না; আত্ম-আদেশ অবমাননার জন্য সে আরও ক্রুদ্ধভাব ধারণ করিল।

“তবে রে বেটি আমার মুখের উপর কথা, রঘো, দে বেটিকে ধাক্কা দিয়ে আমার সীমার বাহিরে বের করে দে।”

এই বলিয়া রামতারণবাবু গৃহে প্রবেশ করিবেন। এদিকে যমের সহোদরের মত রঘুদয়াল সিং আসিয়া বালিকাকে এক ধাকায় বৈঠকখানার উঠান হইতে নীচে ফেলিয়া দিল। ভাঙ্গা ইঁটের কুচিতে তাহার পা কাটিয়া গেল। বালিকার কণ্ঠ কাটিয়া বাহির হইল—মাগো।

অতি কষ্টে সে যেই উঠিয়াছে, আবার ধাক্কা! এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন চারিটি ধাক্কা খাইয়া সে রামতারণবাবুর সীমানার বাহিরে গিয়া পড়িল।

কেহই এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিল না। তবে কি জানি কেন রামবাবুর কুকুরটা ঘা ঘা করিয়া রঘু দয়ালের দিকে ছুটিয়া আসিল।

আর দ্বিতল গৃহের উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ দিয়া একটী করুণ-নেত্র যুবকের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িল ও এক উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস যেন তাহার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া হতভাগিনীর নিরুপায় অপমান ও তীব্র মনোব্যথার গভীরত্ব জানাইয়া গেল।

(২)

গ্রামের এক পার্শ্বে ছোট কুটীর। কুটীরখানি যেন দীনতার একখানি সুস্পষ্ট চিত্র। কোথাও মাটীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও তৃণাচ্ছাদন খুলিয়া গিয়াছে। কোথাও উঠানের দুই একটি বংশদণ্ড ভগ্ন হওয়ায় চালটী নামিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে একটি দূষিত জলপূর্ণ ডোবা। তাহার তীরে একটি বড় বাঁশঝাড়, ডোবাতে একটি ছোট ঘাট। চির দরিদ্রের আকুল আকাঙ্ক্ষার মত ইহা যেন সতৃষ্ণনেত্রে সংস্কারের আশায় চাহিয়া রহিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র কুটীরের মাঝে মলিন ছিন্ন শয্যায় পড়িয়া নিস্তারিণী শুষ্ককণ্ঠে মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছিল। কন্যা মৃণ্ময়ী অনেকক্ষণ গিয়াছে এখনও ফিরিতেছে না। তবে কি সৌরীন্দ্র বাড়ীতে নাই; কিম্বা তাহার পিতার কোপ-দৃষ্টি এড়াইয়া আসিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র স্নেহের পুতুল মৃণ্ময়ীর পথে কোন বিপদ হয় নাই ত? বিবিধ চিন্তায় নিস্তারিণীর রোগক্লিষ্ট মুখমণ্ডল আরও পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। আপনার অদৃষ্ট বিপর্য্যয় ভাবিয়া, মৃণ্ময়ীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, স্বামীর অকাল মৃত্যুর কথা ভাবিয়া তাহার শীর্ণ গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুস্রোত ছুটিল।

নিস্তারিণী ভাবিল, "ভগবান, আর কেন, এখনও কি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই? আর যে এ কষ্ট সইতে পারি না, আর যে বাছার কান্না দেখ্‌তে পারি না! আমি স্বচ্ছন্দে মর্‌তে পারি। কেবল মনুর কথা ভেবে বুক কেঁপে

উঠে, আমি বেঁচেও আর তার কি করছি। কেন স্নুরু কি তার দিকে চাইবে না! সে কি তার বাপের মত নিষ্ঠুর হবে!"

নিস্তারিণীর শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কেহ নিকটে নাই যে, এক বিন্দু জল দেয়। রোগের প্রবল আবেগ তাহার ক্ষীণ তনুকে বর্ষার মেঘের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহার দুর্ব্বল হৃদয় নানা চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

"কই এখনও ত মেনু এল না।" নিস্তারিণী আকুলহৃদয়ে শুষ্ককণ্ঠে দুইবার ডাকিল, "মেনু, মেনু।"

ডোবার ঘাটে পা ধুইতে ধুইতে মৃণ্ময়ী উত্তর দিল, "এই যে মা।"

বালিকা তাড়াতাড়ি পা ধুইয়া মায়ের শয্যায় গিয়া বসিল। মৃণ্ময়ীকে একাকিনী দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। নিস্তারিণী আগ্রহপূর্ণস্বরে বলিল, "মেনু স্নুরু কোথা মা?"

বালিকা নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া নিস্তারিণী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মেনু কথা কচ্ছিস না যে, স্নুরু কোথা, সে কি বাড়ী নাই?"

বালিকা তখন মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কন্যার তপ্ত অশ্রুতে মায়ের বক্ষ ভিজিয়া গেল। কারণ বুঝিতে না পারিয়া নিস্তারিণী আবার দুর্ব্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মেনু, মা আমার কি হয়েছে? কেন স্নুরু কি তোকে কিছু বলেছে?"

বালিকা রুদ্ধকণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না তিনি বাড়ী নাই।"

"তবে আর কে কি বলেছে মেনু?"

মৃণ্ময়ীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। সে তাহার ছিন্ন অঞ্চলখানিতে চোখ ঢাকিয়া কেবলই কাঁদিতেছিল।

নিস্তারিণী চারিদিকে আঁধার দেখিল। মৃণ্ময়ীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "কে কি বলেছে মেনু?"

বালিকা উত্তর করিল, "জ্যেঠা মহাশয়।"

নিস্তারিণীর রুগ্ন বুক ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত বাহির হইল,—"কি বলেছেন তিনি?"

বালিকা একে একে সমুদায় ঘটনা বলিল। একে নিস্তারিণীর রোগ-ক্লিষ্ট দেহ নাড়িবার ক্ষমতা ছিল না, তাহার উপর এ অপমান—তাহার প্রাণাধিকা মৃণ্ময়ীর উপর অমানুষিক অত্যাচার তাহার বুকের মধ্যে তীব্র বহ্নি-শিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নিস্তারিণী বলিয়া উঠিল, "হা নিষ্ঠুর এত লয়েও তোমার আশা মিটিল না! এত পুড়িয়েও তোমার হিংসা নিভ্‌ল না!" তাহার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল!

উঠানে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। নিস্তারিণীর স্তিমিত চক্ষুদুটি দ্বারের দিকে ফিরিল।

মৃণ্ময়ী বলিল, "সুরু দা আস্‌ছে।"

মৃণ্ময়ী আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে সৌরীন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "কাকী মা।"

তাহার স্বর লজ্জানম্র ও ক্ষোভব্যঞ্জক।

"কাকী মা আমায় ক্ষমা কর।"

"তোমার কি দোষ বাবা!"

"আমি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি; কিছুই কর্‌তে পারিনি।"

"সবই আমার কপালের দোষ।"

"কাকী মা! মানুষে মানুষের উপর এত অত্যাচার করে কেন? মানুষে মানুষের দুঃখ দেখেও চোখের জল ফেলে না কেন?"

"বাবা যার কপাল মন্দ, তার জন্যে কারও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে না।"

নিস্তারিণীর স্বর ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিল। সৌরীন্দ্র তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল,—সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গিয়াছে; চক্ষু দুইটি নিষ্প্রভ। নাড়ী টিপিয়া দেখিল, অনেকক্ষণ পরে এক একবার ক্ষীণ স্পন্দন।

সৌরীন্দ্র বড়ই ভীত হইল। নিস্তারিণীর অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কাতরভাবে সৌরীন্দ্র ডাকিল, "কাকী মা।"

ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল, "বাবা।"

নিস্তারিণীর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, কথার স্পষ্টতা বিলুপ্ত হইতেছিল, ক্ষিপ্রহস্তে নিস্তারিণীর মুখে জল দিয়া সৌরীন্দ্র বলিল, "মেনু তুই বাতাস দে,

আমি শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি।"

সৌরীন্দ্র উঠিতে না উঠিতে নিস্তারিণী তাহার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া বলিল, "বাবা, আমায় যেতে দে, ডাক্তারে আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আমার—সময় ফুরিয়ে এসেছে!"

মৃণ্ময়ী কাঁদিয়া উঠিল,—"মা, মা।"

নিস্তারিণী ধীরে ধীরে কন্যার হাতখানি সৌরীন্দ্রের হাতের উপর রাখিয়া ধরিল।

"সুরু, বাবা—সুখে থাক। তোমার—হাতে—মেয়ুকে—নিস্তারিণীর আর কথা বাহির হইল না। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ উদ্দীপনার ন্যায় দুই একটি আহা উহু করিয়া নিস্তারিণী নীরব হইল। তাহার ক্ষীণ জীবন-দীপটী চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল।

মৃণ্ময়ী "মা মা" বলিয়া নিস্তারিণীর পায়ের তলায় লুটিয়া পড়িল। আর সৌরীন্দ্র নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া নিস্তারিণীর শীর্ণ ও ম্লান করতল অশ্রু-প্লাবিত করিয়াছিল।

মানবের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজ যে দ্বারে দ্বারে একমুষ্টি অন্নের জন্য কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, কাল হয়ত সে লক্ষপতি হইয়া শত শত অন্নহীনের আহার যোগাইতেছে; আজ যে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুখের ক্রোড়ে লালিত; কাল হয়ত সে পথের কাঙ্গাল; তাহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার কেহ নাই। সে নিন্দা, অপমান ও লাঞ্ছনার তিক্ত বোঝা মাথায় করিয়া তাহার দুর্ব্বহ জীবনকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া, বহু দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত থাকিত, আজ হয়ত জীর্ণ কুটীরে তাহাকে সহায়হীন অবস্থায় চক্ষু মুদিতে হইতেছে।

নিস্তারিণীর অদৃষ্টেও তাহাই হইয়াছিল। স্বামী অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; কিন্তু আজ তাহাকে একটী নিরাশ্রয়া কন্যাকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া যাইতে হইল।

নিস্তারিণীর শ্বশুর বেশ চতুর লোক ছিলেন। তাঁহার নয়খানি জমিদারী ছিল। বাড়ীতে রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ, প্রতিদিন রাধা-গোবিন্দের পূজা ও

ভোগের জন্য অনেক টাকা খরচ হইত। পার্শ্ববর্ত্তী দুইচারিখানি গ্রামের দীন দুঃখী রাধা-গোবিন্দের প্রসাদ পাইয়া বাঁচিয়া ছিল। চারিদিকেই তাঁহার সুনাম। সর্ব্বত্রই গোপাল সরকারের দানের প্রশংসা। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে তাঁহার দানশীলতার কাহিনী শুনা যাইত।

সুখ, সম্পদ ও সম্মানের মধ্যেও গোপাল সরকারের মনে তৃপ্তি ছিল না। তাহার হৃদয় পুত্র সুরেশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এ দেশময় খ্যাতি, সার্ব্বজনীন সম্মান পুত্রের চরিত্র-দোষে নিশ্চয় কালের বুক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। পুত্র সুরেশচন্দ্র অল্পবয়সে সুরাপায়ী। পিতার জমিদারীর উপর ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণের চিন্তা ন্যস্ত করিয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। সুরা ও জনকয়েক চরিত্র-হীন বন্ধু ব্যতীত সুরেশ আর কোনও কিছুর প্রতি ততটা আগ্রহ প্রকাশ করিত না। তাই গোপাল সরকার একমাত্র বংশধর, অতুল সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারীর অপরিণামদর্শিতায় বড়ই বিহ্বল হইয়াছিল। কিন্তু কুলগুরু ও রাধা-গোবিন্দের পূজক রামতারণ মুখুজ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। রামতারণ বয়সে গোপালবাবু অপেক্ষা কিছু কম ও স্নেহে তাহার পুত্রস্থানীয়। রামতারণ শুধু পূজা ও গুরুগিরী করিয়া সময় কাটাইত না। সে গোপালবাবুর নিকট জমিদারীর কাজ বেশ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিত। বিষয়-রক্ষার প্রতি তাহার আন্তরিক আগ্রহ ও সম্পত্তি-পরিচালনে তাহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেখিয়া গোপালবাবুর একটু ভরসা হইয়াছিল। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে রামতারণকে স্থায়ী পূজক ও সুরেশের বিষয়-রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। পুত্রকে সর্ব্বদা তাহার উপদেশ ও আদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। রামতারণও চোখের জল ফেলিয়া সুরেশকে ছোট ভাইএর মত সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবার জন্য বৃদ্ধের মৃত্যু-শয্যায় প্রতিশ্রুত হইল।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর ঘটনার স্রোত বিপরীত দিকে বহিল। রামতারণ সুরেশের চরিত্র-দোষ সংশোধন করা ত দূরের কথা,—ক্রমশঃ তাহাকে কল্পতরু-জ্ঞানে সর্ব্বদাই তাহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল। রামতারণ আত্মোদর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। খাজনা বাকী পড়ায় জমিদারী নিলামে উঠিল।

কি উপায় হইবে,—সুরেশ ভাবিয়া পাইল না। অত্যধিক সুরাপানে সে আজ কঠিন রোগে শয্যাগত। রামতারণকে ডাকিয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সুরেশ অনুরোধ করিল। যেদিন সুরেশের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়, সেইদিন রামতারণ আপনার নামে নিলামে জমিদারী ধরিয়া বাড়ী ফিরিল।

সুরেশের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে পত্নী ও একমাত্র কন্যা মৃণ্ময়ী গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ও রামতারণ এখন সুরেশের পিতৃভবন, রাধা-গোবিন্দ ও সমূহ সম্পত্তির অধিকারী। বৃদ্ধের অর্থলিপ্সা এখনও মিটে নাই। সুরেশের স্ত্রী ও কন্যা সামান্য অর্থের জন্য রামতারণের নিকট কত অনুনয়-আবেদন করিয়াছে ; কিন্তু তাহার হৃদয়ে সলিল-রেখায় ন্যায় সে করুণ আবেদন তখনই মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে রামতারণ প্রতাপশালী ; সকলে তাহার ভয়ে শঙ্কিত। রামতারণের অর্থাগমের আরও একটী উপায় হইয়াছে। পুত্র সৌরীন্দ্র এইবারে বি-এ. পাশ করিয়াছে। রামতারণ ডাক দিয়াছে যে, চারি হাজার টাকা নগদ ব্যতীত সে পুত্রের বিবাহ দিবে না। একে জমিদার-পুত্র তাহাতে আবার সুশিক্ষিত ; সুতরাং দুই একটী ক্রেতা যে জুটিবে না রামতারণ তাহা মনে করিতে পারে নাই।

(৩)

আহারের পর রামতারণ শয্যাগৃহের খাটের উপর বসিয়া গড়্‌গড়াতে তামাক টানিতেছিল। পত্নী হরিমতি ঘরের মধ্যে পান সাজিতে বসিল।

রামতারণবাবু জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুরুর মত কি ?"

"না, সে কিছুতেই রাজি হয় না।"

"রাজি হয় না কি ?"

"সে বলে, 'আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ব না' ?"

"বরাবরের জন্যে আইবুড়ো থাক্‌বে, কি এখন বিয়ে কর্‌বে না ?"

"এখন বিয়ে কর্‌বে না।"

"কেন বিয়ের বয়স হয়নি বুঝি ?"

"বিয়ের নাম কর্‌লেই সে আমার ছায়া মাড়ায় না।"

"তার মতলব কি—সে বলেছে ?"

"সে বলে, বিয়ের জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ? সময় হ'লে হ'বে। ও কথা

তুমি যদি আমায় বল তবে এখনি আমি বাড়ী ছেড়ে চলুম।"

"ভেবেছিলুম ছেলেটা লেখাপড়া শিখেছে, মতিগতি ফিরবে। বাপ মার প্রতি একটু শ্রদ্ধাবান হবে। তা যেরূপ গতিক দেখ্‌ছি তা'তে আমি চক্ষু মুদলে গোল্লায় যেতে বেশী দেরী লাগবে না।"

"তার আর এক আপত্তি টাকা নেওয়ায়।"

"এমন ছোকরা ত কোথাও দেখিনি। আমরা টাকা নেব কেন? তারা যে ওর গায়ে চার হাজার টাকার নোট বেঁধে দেবে। মেয়েটি দিব্যি ফুটফুটে, বাপ ডেপুটীগিরি ছেড়ে পেনসন্ পাচ্ছে। চেষ্টা কর্‌লে জামাইকে একটা ডেপুটি ক'রে দিতে পারবে না এমন নয়। অগাধ টাকার মালিক। টাকা যদি অমন পাশ-করা ছেলেকে না দেবে তবে কি হরে বাগ্দীকে দেবে না কি! আমার ছেলের প্রতি তার ভয়ানক ঝোঁক। হবে না? আমার ছেলেকে দশ হাজার টাকা দিয়ে যে পাবে তারও সৌভাগ্য। তুমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'লো।"

"আমি অনেকবার বলে দেখেছি; সে কথা কানে তুলতেই চায় না।"

ঠিক সেই সময়ে সৌরীন্দ্র একখানি পত্রহস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। সে পত্রখানি পিতার হাতে দিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময় রামতারণবাবু তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন, এবং পত্নীর হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলেন, "এই দেখ এর চেয়ে আর কি দেবে? এ সুযোগ ছাড়লে, কিন্তু এমন মেয়ে আর এমন ঘর পাবে না, তার উপর পাওনাটা কি আর কম?"

সৌরীন্দ্রের এ প্রসঙ্গ ভাল লাগিতেছিল না, তাই সে গৃহের বাহিরে যাইতেছিল। রামতারণবাবু বাধা দিয়া ডাকিল, সুরু?

"আজ্ঞে।"

"আমরা যে কাজটা ভাল বুঝি তার উপর তোর আবার কর্ত্তামি চাল কেন?"

"কই আমি ত কখন আপনার কথার প্রতিবাদ করিনি।"

"দীননাথ চাটুর্য্যের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে, তা তোর মার কাছে শুনেছিস্। তাতে তোর অন্যমত কেন?"

সৌরীন্দ্র নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রামতারণবাবু একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "কথা কচ্ছিস্ না যে ?"

"আমি এখন বিয়ে ক'রব না।"

"কেন ? অপছন্দ কিসে হ'ল।"

সৌরীন্দ্র একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পুত্রের প্রতিবাদ শুনিয়া রামতারণবাবুর চক্ষু জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। সে একে প্রতাপশালী ব্যক্তি, তাহার উপর সে সৌরীন্দ্রের পিতা। পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা তাহার সহ্য হইল না।

"তোর এ কুবুদ্ধি কি ক'রে হ'ল ? আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। তুই আমার উপর চাল চাল্‌তে শিখেছিস। তোকে বিয়ে কর্‌তেই হবে। আমি তাদের কথা দিয়াছি।"

হরিমতি পুত্রের দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'কেন সুরু এতে অমত কর্‌ছ ; মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দর ও সৎবংশের।"

"না মা, আমি কিছুতেই এখন বিয়ে কর্‌ব না।"

রামতারণবাবু ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বিয়ে করবি কেন ? আমার মুখে কালি দিবি। সুরেশ সরকারের বাড়ী যাওয়া ইস্তক তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, বেশ বুঝতে পেরেছি। যতদিন না সুরেশের ঐ আবাগী মেয়েটার শ্রাদ্ধ করি ততদিন তোর মতিগতি ফির্‌বে না। ফের যদি তাদের বাড়ী যাবি তবে মজাটা দেখবি। আমি যদি বামুনের ছেলে হই, তবে সুরেশ সরকারের কাউকে এ অঞ্চলে থাক্‌তে দেব না।"

সৌরীন্দ্র স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তাহার চারিদিকে যেন দেওয়ালগুলি ঘুরিতেছিল। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। সে দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে উত্তর করিল :—"বাবা আপনি কি বল্‌ছেন ? তার তো আর কেউ নাই। পিতৃমাতৃহীনা আশ্রয়হীনা বালিকার উপকার করা ত মানুষের ধর্ম্ম। আপনি তার পিতার সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে রাজা ; আর সে পথের ভিখারিণী, লাঞ্ছিতা, এবং আপনার করুণা-কণারও অযোগ্য !"

'তবে রে বেটা পাজী, তুই বল্‌তে চাস আমি তার বাপের সব বিষয় ফাঁকি

দিয়ে নিয়েছি"—এই বলিয়া রামতারণবাবু নিজের পাদুকা লইয়া সৌরীন্দ্রকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। হরিমতি স্বামীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সৌরীন্দ্র আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। প্রলয়ের বজ্রের মত রামতারণবাবুর গম্ভীর কর্কশ স্বর শ্রুত হইল,—"যদি আমি বামুনের ছেলে হই তবে সুরেন সরকারের বংশের কাউকে এদেশে রাখ্‌ব না।"

(৪)

আজ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর গাঢ় অন্ধকার বিশ্বের সব জ্যোতিটুকু নিভাইয়া ফেলিয়াছে। আকাশে কচিৎ দুই একটী নক্ষত্র দেখা দিয়া আবার মেঘের কোলে লুকাইয়া পড়িতেছে। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সৌরীন্দ্র মৃণ্ময়ীর কুটীরদ্বারে আসিয়া ডাকিল, "মেনু।"

"কে সুরু দা ?"

"হঁা, কপাট খোল।"

সৌরীন্দ্রের স্বর যেন একটু ব্যথাপূর্ণ ও কোমল। মৃণ্ময়ী ক্ষিপ্রপদে কপাট খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত রাত্রে ?"

"দরকার আছে।"

"আজ ঝি সন্ধ্যের পর চলে গেছে, তার বোন্ নাকি অনেকদিন পরে বাড়ী এসেছে, তাই সে কিছুতেই রইল না। আমার বড় ভয় কর্‌ছিল, তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।"

নিস্তারিণীর মৃত্যুর পর হইতে সৌরীন্দ্র আপন ব্যয়ে মৃণ্ময়ীর নিকট এক-জন ঝির বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

সৌরীন্দ্র বুঝিল, আজ ঝি নিশ্চয়ই তাহার পিতার চক্রান্তে সরিয়াছে। মৃণ্ময়ীর কথার উত্তর না দিয়া সে কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল ও মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িতেছিল।

মৃণ্ময়ী উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"সুরু দা, তুমি কাঁদছ ?"

"কই না! মেনু ?"

"আজ্ঞে।"

"আজ কি হবে জানিস ?"

কি হবে সুরু দা! তুমি অমন কর্‌ছ কেন ?"

মেনু! "তুই মর্‌তে রাজি আছিস!"

"কি বলছ সুরু দা, আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনা, তোমার হাতে পায়ে ধরি কি হয়েছে খুলে বল না।"

"এ বিশ্বে আর তোর দাঁড়াবার স্থান নাই! বাবার বিষ চক্ষু তোর উপর পড়েছে। মেনু আর বুঝি তোকে বাঁচাতে পার্‌ব না।"

"কি হবে সুরু দা, আমার বুক কাঁপছে, আমি কোথা যাব।"

"মৃত্যু ছাড়া আর উপায় নেই, কাকী মা যেখানে গেছেন সেইখানে যেতে হ'বে। মর্‌তে পার্‌বি মেনু?"

"জেঠ্যামশাই আবার কি করবেন!"

"মেনু, আর কথা বলবার সময় নাই। এখনই এ ভাঙ্গা কুঁড়েটা ধূ ধূ করে জলে উঠ্‌বে। ভগবান যেন মেনুকে বাঁচাতে পারি।"

"তবে কোথা যাব সুরু দা?"

"আমি যেখানে যাব?"

এই বলিয়া সৌরীন্দ্র মুক্তদ্বার কুটীর ত্যাগ করিয়া, মৃণ্ময়ীর হাত ধরিয়া বাহির হইল। নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি বাঁশীর ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। সৌরীন্দ্র বলিল "ঐ তারা আসছে।"

"কারা আসছে সুরু দা!"

"যারা তোর এই জীর্ণ কুঁড়েটুকু পুড়িয়ে দেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছে!"

"এখন তবে কোথা যাবে?"

"মর্‌তে।"

"তুমি কেন আমার জন্য মরবে; আমি হতভাগিনী। আমি বাপ মাকে খেয়েছি, আবার তোমায় খেতে বসেছি!"

"মনে পড়ে মেনু সেদিনের কথা।"

"কোন্‌দিন সুরু দা!"

"যেদিন কাকী মা আমার হাতের উপর তোর হাত রেখে বলেছিলেন, সুরু তোর হাতে আমার মেনুকে দিয়ে গেলুম।"

মৃণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

সৌরীন্দ্র বলিল, "মেনু কাঁদবার সময় নয়, তাঁর জিনিস আমি তাঁর হাতে

তুলে দেব। কাকী মা স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

নিকটেই গঙ্গার ঘাট, আজ কলনাদিনীর ভৈরবী মূর্ত্তি। উপরে মেঘ-গর্জ্জন, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার।

নদীতীরে একটী খোড়ো ঘরের সম্মুখে আসিয়া সৌরীন্দ্র ডাকিল।

"বদির।"

"কে?"

"আমি। শীগ্‌গির বাইরে আয়।"

বদিরুদ্দিন মাঝি বাহিরে আসিয়া সৌরীন্দ্রকে লম্বা সেলাম করিল ও বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এত রাত্রে?"

"এখনই আমায় পার করে দিতে হবে!"

"কোথা যাবেন?"

"সুন্দর বন"

মৃণ্ময়ী বুঝিল যে, সৌরীন্দ্র তাহাকে তাহার স্বামীর বাড়ী লইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে যে কখনও নৌকায় আরোহণ করে নাই, তাহার প্রাণ ফাটিয়া গেল! বদির কহিল, "বলেন কি! এত রাত্রে এ দুর্য্যোগে, সুন্দরবনে যাবেন? তাহলে ডুবে মর্‌তে হবে, আমি তা কিছুতেই পারব না!"

"বদির একশ টাকা বকসিস্।"

"আপনার কাছে বক্‌সিসের আশা করি না বাবু, আপনি কতবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তা নইলে আপনার বাবার রাগে আজকে আমার কবরের উপর এক হাঁটু ঘাস গজা'ত!"

"বদির আর কথা বলবার সময় নেই।"

"এখনি ঝড় উঠবে, আপনাকে মর্‌তে দিতে পারব না। সঙ্গে ইনি কে?"

"একটি স্ত্রীলোক।"

"ইনিও যাবেন?"

"হাঁ।"

"এ পাপের ভাগী আমায় হ'তে হবে!"

"তা নইলে বদির, আমাদের দাঁড়িয়ে মর্‌তে দেখবে।"

সৌরীন্দ্র বদিরের হাত ধরিয়া ফেলিল। মাঝি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া

একজন দাঁড়িকে ডাকিয়া নৌকায় উঠিল!—মৃণ্ময়ী কম্পিতচরণে সৌরীন্দ্রের পশ্চাতে নৌকায় গিয়া বসিল। পীরের নাম লইয়া বদির নৌকা ছাড়িয়া দিল।

এদিকে রামতারণ মৃণ্ময়ীকে দেশান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার গৃহদাহের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার বিশ্বাস আশ্রয়হীনা হইলে সে নিশ্চয়ই সুন্দরবনে তাহার মাসীর গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবে। তাই সে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া গৃহদাহের জন্য পাঁচজন লোক পাঠাইয়াছিল। তাহার পর দেখিল যে, সৌরীন্দ্রের শয্যা শূন্য। তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি রঘুদয়ালকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ দেখি. সুরেশ সরকারের বাড়ীতে সুরু আছে কি না।"

রামতারণ এমনভাবে আদেশ করিল যে, রঘুদয়াল যেন এ ষড়যন্ত্রের কিছু না বুঝিতে পারে কিংবা তাহার ব্যাকুল হৃদয়ের উদ্বেল ভাব কিছুই ঠিক করিতে না পারে।

রঘুদয়াল যেখানে বাহির হইত. বদিরুদ্দিন মাঝির বাড়ীতে তামাক টানিয়া যাইত। বদিরের বিবির নিকট তাহার যথেষ্ট খাতির ছিল। এত রাত্রিতে রঘুদয়াল নিদ্রায় বাধা পাইয়া একটু বিরক্তি অনুভব করিতেছিল, তাই বদিরের কথায় তাহার মেজাজটা ঠিক করিয়া লইবার আশায় সে বাঁকা রাস্তা ধরিয়া বদিরের কুঁড়ের নিকট আসিয়া ডাকিল. "এ বদির মিয়া।"

সৌরীন্দ্রের সহিত বদিরের কথাবার্ত্তা বদিরের স্ত্রী সমস্তই শুনিয়াছিল। রঘুদয়াল সিংকে দেখিয়া সে সব কথা খুলিয়া বলিল। রঘুদয়াল আর ধূমপানের আশায় মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া প্রভুর গৃহের দিকে দৌড়িল। রামতারণের নিদ্রা নাই। একে একটী বালিকার গৃহদাহের দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা। তাহার উপরে সৌরীন্দ্রের অন্তর্ধানে তাহার চিন্তা আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

রঘুদয়ালের মুখে এ সর্ব্বনাশের সংবাদ শুনিয়া রামতারণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! এতক্ষণে হয়ত সব শেষ!

বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির করাল মূর্ত্তি। ঝটিকার ভীষণ শব্দ। মাঝে মাঝে গম্ভীর জলদগর্জ্জনে রামতারণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রঘুদয়াল

আলো লইয়া অগ্রে অগ্রে দৌড়িল ও রামতারণ ব্যাকুলহৃদয়ে ভগবানের নাম করিতে করিতে ছুটিল।

তাহারা নদীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। প্রবল ঝটিকায় নদীতরঙ্গের ভীষণ আন্দোলন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ। ঠিক সেই সময়ে মৃণ্ময়ীর কুটীরে অগ্নি শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল। চারিদিক আলোকিত। নদীর বক্ষে আলোকের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রামের লোক অগ্নি নিভাইবার জন্য মৃণ্ময়ীর কুটীরের দিকে চীৎকার করিয়া দৌড়িল ও সেই দহ্যমান কুটীরের প্রধূমিত বহ্নিপ্রভায় রামতারণ দেখিল,—অনেকদূরে গঙ্গাবক্ষে একখানি নৌকা প্রবল বাত্যাবেগে ডুবুডুবু হইতেছে। তাহার স্থূল কলেবর ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভাগীরথীর সৈকতে আছাড়িয়া পড়িল।

* * * *

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল,—বদির মাঝির পান্‌সীখানি গঙ্গার ঘাটের প্রায় একক্রোশ দূরে নদীতীরে ঠেকিয়াছে, ভাগীরথীর প্রমত্ত তরঙ্গরাজি তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

প্রতিধ্বনি।

সাহিত্য—অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

১। ভারত্য-স্থাপত্য।

যে যুগে তাজমহল রচিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের ভাব-সমন্বয় যুগ। সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হইয়া গিয়াছিল,—কথোপকথনের ভাষা এক হইয়া গিয়াছিল,—উৎসব আনন্দ এক হইয়া গিয়াছিল,—ভাবস্রোত একই খাতে সম্মিলিত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছিল। সে যুগে কি কেবল ভারত-স্থাপত্যেই ভাব-সমন্বয়ের প্রভাব কিছুমাত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই? তাজ দেখিলে স্বতই মনে হয়,—তাজ 'হিন্দু'র নহে, 'মুসলমানের'ও নহে,—তাজ 'হিন্দু-মুসলমানের'। তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের রচনা-প্রতিভা বাহুতে বাহু বেষ্টন

করিয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-বন্ধনে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে। পরলোকগত ওকাকুরা লিখিয়াছিলেন;—শিল্পের ভাব-সম্পদে "সমগ্র এসিয়াই এক"। তাজ তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া কথিত হইতে পারে।

যে তাজ দেখিয়াছে, তাহাকেই আত্মহারা হইতে হইয়াছে। তাজ অদ্বিতীয় মর্ম্মর-স্বপ্ন,—যেমন সুন্দর, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। নিস্তব্ধ নিশীথে,—কৌমুদী-বিধৌত নীল নভোমণ্ডলের সুবিন্যস্ত চারু চন্দ্রাতপতলে,—তাজের শুভ্র সুষমা যখন ধীরে ধীরে স্বচ্ছশিশিরাবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে আপন অঙ্গলাবণ্যের আভাষ প্রদান করে, তখন তাহা যেমন অনির্ব্বচনীয়,—তাহার দীপ্ত-দিবালোক-পুলকিত প্রসাদ প্রফুল্ল সুবিমল হাসাচ্ছটাও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। উষায়, প্রদোষে প্রভাত-তপনের প্রথম কিরণপাতে, সায়াহ্নের স্তিমিত-রশ্মির আরক্তিম অন্তিম অন্তর্ধানে,—তাজের শোভাই তাজের শোভার একমাত্র তুলনাস্থল। সে শোভা কেবল অট্টালিকার শোভা নয়,—ভারতবর্ষের নীল নভোমণ্ডলের নৈসর্গিক শোভার সঙ্গে তাজতটবাহিনী কলিন্দনন্দিনীর নীলসলিলধারার নৈসর্গিক শোভাও, কৃত্রিমের সঙ্গে অকৃত্রিমের অপূর্ব্ব সম্মিলনে মোহবিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

এমন অদ্বিতীয় স্থাপত্য-সুষমার রচনা-গৌরব যদি কেবল ভারতবর্ষেরই প্রাপ্য হয়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মগৌরব-সংস্থাপনার অমোঘ অস্ত্র হইতে পারে। অধ্যাপক হাভেল বলেন, স্থাপত্য-বিজ্ঞানের প্রমাণে ভারতবর্ষই এই গৌরবের একমাত্র অধিকারী। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; তাহা বুঝিতে হইলেও, অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অধ্যাপক হাভেল বলেন, "তাজ ইসলামের নহে, তাজ ভারতবর্ষের'।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বিশেষ দুঃখ ও অভাব, ম্যালেরিয়া জ্বর, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বর্ত্তমান সামাজিক রোগ, বিলাসোন্মাদ, বিবাহে পণ, মামলাব্যসন। ধনীদিগের মধ্যে নিঃস্বার্থদানবিমুখতা অন্নজল-দান-কাতরতা, উপাধিপ্রিয়তা ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব, শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ ও পণ্ডিত্যাভিমানসর্ব্বস্ব ধর্ম্মচর্চ্চা।

ইহার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ ম্যালেরিয়া বিষয়টি লইলাম। ডিমস্থিনিস ম্যাসিডনের ফিলিপের উদ্যত আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য এথিনিয়ানদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বর্ক অত্যাচারী হেষ্টিংসকে দমন করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিসিরো ক্যাটলাইনের ষড়যন্ত্র বিদীর্ণ করিবার জন্য রোমকদিগকে উত্তেজিত করণার্থ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ম্যাটসিনি, ইতালীকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ইতালীর মধ্যে চতুর্দ্দিকে তাঁহার রচনাবলী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। আর আমাদের ভীষণ নির্দ্দয় শত্রু ম্যালেরিয়াকে

দমন করিবার জন্য, দূরীভূত করিবার জন্য আমাদের সাহিত্যিকগণ স্বদেশকে উত্তেজিত উৎসাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না কি? প্রবন্ধমালা লিখিবেন না কি?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মানসী—অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

সার গুরুদাসের জীবন-স্মৃতি।

১৮৭০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরের অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই-খানেই "বঙ্গদর্শন"-প্রকাশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি বঙ্গদর্শনের জন্য "গ্রাবুখেলা" ও "উদ্দীপনা" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় লিখিয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ সাহিত্য-যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করেন। * * *

"Bengal Peasant Life"-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময়ে (১৮৭০—৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভার সম্পাদক ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎ-কালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় "Indian Civilisation" সম্বন্ধে, সার গুরুদাস "Abused India vindicated" সম্বন্ধে, এবং মতিবাবু "Polygamy" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে সার গুরুদাস লিখিয়াছিলেন, If the tailor be the high priest of the regeneration cerme-mony of India, far be such regeneration from me and my countrymen" (ভারতের অভ্যুত্থান-যজ্ঞে যদি দর্জ্জি মহাশয়ই প্রধান ঋত্বিক হন, তবে কাজ নাই অমন উদ্ধারে)। দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে সার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেন্ট-পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্কিম বুঝিতেন। সার গুরুদাস বঙ্কিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে বঙ্কিম তাঁহাকে বলেন "করলেন কি?" ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়। অল্পদিন পরে লালবিহারী হুগলী কলেজে বদলি হন।

বঙ্কিমের অবস্থানকালে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ডাকঘরের কার্য্যোপলক্ষে মাঝে মাঝে বহরমপুরে আসিতেন। দীনবন্ধু আসিলে হাস্যের বন্যা আসিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন "He is only a Pri-mer-maker. (তিনি খানকতক ছেলেদের বই লিখেছেন বই ত' নয়)।

শ্রীগৌরহরি সেন।

গৃহস্থ—অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

সভাপতির অভিভাষণ।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষাই ইহার জননী। জননীর নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা জননীর স্ত্রীধনের আইনানুসারে চলিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে তাহা না হইবার কারণ কি? যখন আমরা সংস্কৃতের অনুসরণ করিব, তখন তাহার নিয়ম না মানিয়া চলিব কেন? সংস্কৃতশব্দের সহিত দেশজশব্দ মিলাইয়া 'গুরুচণ্ডালী' দোষের সৃষ্টি করিব কেন? নব্যলেখকদিগের লেখনী পাঠ করিয়া মনে হয় তাঁহারা যেন ইচ্ছা করিয়া নূতনত্বে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রলোভনে একটা নূতনের সৃষ্টি করিতে চান। অবশ্য প্রতিভা বা মনীষা ভাষার শব্দ-সম্পৎবৃদ্ধি-মানসে নূতনের সৃষ্টি করিবেই করিবে—ভাষাকে বলশালী করিবেই করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শোথের আ[illegible]সমৃদ্ধি বলের পরিচায়ক নহে। দুই চারিটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যটা একটু বিশদ করিতে চাই:—

"বসন্ত কুসুমফুলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না রঙাইয়া দিত, সন্ধ্যামণির হৃদয় পিষিয়া চরণ রঙাইত, হেনার পাতার রস গালিয়া হাত রঙাইত। আর মধুর হাসি, প্রিয়বচন, চটুল চাহনি দিয়া হৃদয় রঙাইতে চেষ্টা করিত—রূপসীদের হৃদয় তাহাতে রঞ্জিত কি না কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আফিম ফুলের মতো রাঙা মাদক ঠোঁট দুখানি, ডালিমফুলের মতো গাল দুটি, শিউলি রঙা বসন আর মেহেদি রাঙা চরণ নিজেদের সকল লালিমা জড়ো করিয়া বসন্তর তরুণ-কোমল হৃদয়খানি শোণিত রঙে রঙাইয়া তুলিতেছিল।"

এই স্থলে ছয়বার 'রঞ্জ্' ধাতুর বিকৃতি ত দেখিলেন। ইহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর 'লালিমা' শব্দের ন্যায় 'হরিতিমা,' 'ম্লানিমা,' 'শ্যামিমা' প্রভৃতি অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদ্ভট শব্দ অবাধে সাহিত্যে চলিতে সুরু করিতেছে। আর এই কয়ছত্রে দুইবার 'মতো' ও একবার 'জড়ো' শব্দ ওকার-সংযোগে লিখিত হইয়াছে। অবশ্য উচ্চারণগত বানান্ (Phonetic spelling) যখন উদার যুক্তরাজ্যেও চলিতেছে না তখন যে এই সংরক্ষণশীল বাঙ্গলাদেশে চলিবে সে ধারণা আমাদের নাই। আর যখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে উচ্চারণ-বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তখন একস্থলের উচ্চারণ লিখিত ভাষায় চালাইলে চলিবে কেন? সাহিত্যে এ ভেদনীতি সমর্থন করা যায় না। যদি বলেন অভিমতার্থক 'মত' ও তুল্যার্থক 'মত'-শব্দের প্রভেদ করিবার জন্য শেষের শব্দে 'ও'কার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে, কাল, ভাল, বল, মন ইত্যাদি কথার 'ও' সংযোগ করিয়া লেখা হয় না কেন?

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

পুস্তক পরিচয়।

বিল্বদল।—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী-প্রণীত। প্রকাশক, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০ আনা।

বিল্বদল—ছোট কবিতার বই। গ্রন্থকার ইহাকে তিন 'পর্ণে' বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম পর্ণে চৌদ্দটী, দ্বিতীয় পর্ণে ষোলটী এবং তৃতীয় পর্ণে আঠারটী কবিতা আছে। মোট আটচল্লিশটী—প্রায় অর্দ্ধশত। এতগুলি কবিতার মধ্যে প্রশংসার যোগ্য কবিতা দুই একটীর অধিক নাই। গ্রন্থকারের কবিতা-রচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এপথে অভিযান করিতে তাঁহাকে আমরা নিষেধ করি। প্রায় সকল কবিতাই সম্পূর্ণ প্রাণ-হীন, রস-ভাব-বর্জ্জিত। ছন্দোবদ্ধ শব্দসমষ্টি কবিতা নহে,—গ্রন্থকার এটুকু স্মরণ রাখিবেন। তাঁহার 'বিল্বদলে' দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে ইহা অর্পিত—সেই বঙ্গ-বাণী ইহা যে প্রত্যাখ্যান করিবেন, একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

—:•:—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের 'এলবাম্'।—কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী-প্রতিষ্ঠিত আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের নাম ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কবিরাজ মহাশয়ের এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রচারিত হয়। ইঁহাদের ঔষধালয়ের যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা এই বহুচিত্রভূষিত, সুমুদ্রিত 'এলবাম'-দর্শনে বুঝিতে পারা যায়।

———

এসিয়ার বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম।



এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আভাস দিব।

আমেরিকায় বৌদ্ধধর্ম্ম। বিদ্যালয় হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্ব কেহ অবগত ছিল না। M. de Quatrefages সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার Human Species নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেন,—যখন আমেরিকায় কৃষ্ণ, শ্বেত, পীতবর্ণের মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে উক্ত বর্ণত্রয়ের ব্যক্তিগণ তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ যুক্তি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ঐতিহাসিকগণ নানা অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপীয়গণ চৈন গ্রন্থ-অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। এই অধ্যয়নের ফলে কতিপয় য়ুরোপীয় পণ্ডিত চৈন সাহিত্যে ফুসাং (Fou-sang) নামক একটি স্থানের উল্লেখ দেখিতে পান। উক্ত স্থান-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—ঐ স্থান ২০,০০০ লি বিস্তৃত। এই স্থানটীর ভৌগোলিক অবস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া মতভেদ চলিয়াছিল। Klaproth নামক এক ব্যক্তি জাপানকে ফুসাং বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কারণ জাপান সাহিত্যে M. de Riamy ফুস্থ (Fou-so) নামক আর একটি দেশের উল্লেখ দেখিতে পান। শব্দতত্ত্ববিৎগণ

এই দুইটী শব্দকে একই দেশের নাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। জাপান-অধিবাসিগণের গ্রন্থে লিখিত আছে, ফুসু জাপান সাম্রাজ্য হইতে বহুদূরে উত্তরে অবস্থিত। তথায় ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রেরিত হন। এই দেশে লৌহ ব্যতীত স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া Arthur Little সাহেব অনুমান করেন যে, ফুসাং শব্দের দ্বারা আমেরিকাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা শুধু অনুমান নহে। Humboldt মেক্সিকোর জ্যোতিষবিদ্যা আলোচনা করিতে যাইয়া ভারতীয় জ্যোতিষের সহিত তথাকার জ্যোতিষের অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। তিনি দেখিতে পান যে, তথায় সর্প, মকর প্রভৃতি জন্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও বৌদ্ধ রাশিচক্রের অনুকরণে তথাকার রাশিচক্রে ঐ সকল জন্তুর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ইহা অপেক্ষাও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। Humboldt সাহেব বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণে নানা স্তূপের আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন কোন স্তূপের মধ্যে মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির মস্তকে সর্প, হস্তে পদ্ম, পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মেক্সিকোবাসী ইহাকে Xaca (শাকা) বলিয়া থাকে। M. Provey ইহাকে শাক্যমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ইজিপ্তে বৌদ্ধধর্ম্ম। গ্রিনার পর্ব্বত হইতে আবিস্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, একসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ইজিপ্তে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রিন্সেপ সাহেব বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে উক্ত লিপির উল্লেখ করেন। এতদ্ব্যতীত মহাবংশে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, অশোক কতকগুলি বৌদ্ধ প্রচারক আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠাইয়া দেন। ইহার পর একটী বিহার-প্রতিষ্ঠাকল্পে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কতিপয় বৌদ্ধপ্রচারক ভারতে উপনীত হন। ইজিপ্তের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে, তাহার উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। অনেকেই অবগত আছেন যে, এক সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় Gnosticism অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। Prof. Tullock বলেন, খৃষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাপার ঘটে। নানা কারণে তাঁহার মত যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। এই Gnosticismএর

সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য এতই অধিক যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—বৌদ্ধ শব্দের অনুকরণে উক্ত শব্দটী পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে Gnosticism ও বৌদ্ধধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ এক, উভয়ের অর্থই জ্ঞান। সবিশেষ আলোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে,—Gnosticism বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র।

বৌদ্ধধর্ম্মের মতে পরমেশ্বর এক অব্যক্ত, অবর্ণনীয়, নামহীন, কার্য্যহীন নিষ্কাম পুরুষ। তাঁহার শক্তিনিচয় পদ্মপাণি ও ধ্যানীই এই সুবিশাল জগতের পালন ও সৃষ্টিকর্ত্তা। নিবৃত্তিশক্তির কোন ক্ষমতাই নাই। প্রবৃত্তিশক্তি কর্ত্তৃক সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলগত স্থূল কথা। Gnosticism আলোচনা করিলে আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। Gnosticগণ বলিয়া থাকেন, Basilides নিষ্কাম পুরুষ। তিনি সৃষ্টি ও পালন-ইচ্ছার অতীত। এই মহাপুরুষ-প্রসূত Pleroma বা প্রবৃত্তিবশে Æons নামক পঞ্চদেবতার সৃষ্টি করেন। তাঁহারাই স্রষ্টা পাতা ও ধাতা। খৃষ্ট Gnosticism হইতেই তাহার ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করিয়াছেন। Sophia Gnosis বা প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্তির উপায় জানিতে হইবে, ইহা উভয় ধর্ম্মেরই শিক্ষা।

য়ুরোপে বৌদ্ধধর্ম্ম। য়ুরোপের মধ্যে গ্রীস, রোম ও আয়র্লণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাবংশে লিখিত আছে যে, অশোক মহাচরিত নামক একজন বৌদ্ধপ্রচারককে গ্রীসে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। গ্রীসের দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তাহার উপর বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। গ্রীকগণের সহিত এক সময়ে ভারতের সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে। এসম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু না বলিয়া "Isis Unveiled" নামক পুস্তক হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব :—

It is the philosophy of Sidhartha Budha again that Pythagoras expounded, when asserting that the ego was eternal with God and that the Soul only passed through various stages (Hindu Rupa-locas) to arrive at the devine excellence ; meanwhile the thumos returned to the earth and even the phrem was eliminated. Vol II. P. 286.

আয়র্লাণ্ডের নানাস্থানে বৌদ্ধনিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া Rev. Dr Luondy প্রচার করেন যে, ফোনেসীয় ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক এই নিদর্শন ভারত হইতে তথায় আনীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু Charles সাহেব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন,—এক সময়ে তথাকার অধিবাসিগণ যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আয়র্লাণ্ডের নানাস্থানে আজিও শত শত বৌদ্ধস্তূপ এবিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে, নানা রূপকথা (Legends) সেই পুরাতন স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, একসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম রোমে প্রচারিত হইয়াছিল। Bury নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারক রোমের ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। Father Hue বলেন,—ক্যাথলিক ধর্ম্মে আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ততটা সাদৃশ্য না থাকিলেও উহার বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের নানাবিষয়ে সাদৃশ্য আছে। পোষাক, ক্রুশ, মন্ত্রোচ্চারণ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লাসেন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতও ইহারই অনুরূপ। কেবল Hardwick নামক জনৈক য়ুরোপীয় পণ্ডিত ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, ভারতের সহিত রোমের সংশ্রব থাকার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। হণ্টার সাহেব বলেন, Josephineএর জীবনী অনেকটা বুদ্ধের জীবনের অনুরূপ। কিন্তু ভারতের সহিত রোমসাম্রাজ্যের সংশ্রব থাকার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা অত্যন্ত অলীক কথা। ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, Cladiusএর রাজত্বকালে সিংহল হইতে একদল সিংহলবাসী ইজিপ্ত হইয়া রোমরাজ্যে উপনীত হয়। Marcus Aurelius Autonimusএর রাজত্বকালে কতিপয় রোমবাসী টনকিং হইয়া চীনরাজ্যে গিয়াছিলেন। এ সকল ঐতিহাসিক কথা। এতদ্ব্যতীত Letronne সাহেব বলেন যে, রোম ও ভারতের সহিত সংশ্রব এককালে ছিল। উভয় সাম্রাজ্যের সহিত যে ভারতের আদান-প্রদান চলিত, তাহা হিন্দু জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় বণিক-দল একসময়ে রোমরাজ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য গমনাগমন করিত। এই সকল সূত্রে বৌদ্ধধর্ম্ম রোমরাজ্যে প্রচারিত হওয়া একান্ত অসম্ভব নয়।

এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম চীন, শ্যাম, সিংহল, আরব, প্যালেস্টাইন, ব্যাবিলন, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। বারান্তরে এই সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সিন্ধুপারে।

নরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার কল্পনা করিতেছিল; কিন্তু বহুদিন পরে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির অপার্থিব শোভা-সম্পদ্-দর্শনের বেগবতী আকাঙ্ক্ষা ভেদ করিয়া বহুকাল সঞ্চিত ছাত্রজীবনের এক উদ্দাম কামনা মাঝে মাঝে তাহাকে অভিভূত করিতেছিল।

যখন সে কলেজে প্রতাপশালী বিজয়ী রোমরাজ্যের লুপ্তগৌরবের ইতিহাস পাঠ করিত, তখন তাহার চক্ষু দুইটী অশ্রুভারে নিমীলিত হইয়া আসিত। রোমের জগদ্বিশ্রুত প্রভাব, কঠোর স্বদেশব্রত, প্রভৃতি কৌতূহলকর পুরাতত্ত্ব পাঠ করিয়া তাহার মনে হইত যে, জীবনে কি কখন এ দেশের লুপ্ত গৌরবচিহ্ন দেখিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিব না? তাহার উপর নরেন্দ্র শুধু একজন ঐতিহাসিক নয়, কাব্যে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। সে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বড় বড় ইংরাজ কবির সমাধিক্ষেত্রে প্রায় প্রতি মাসে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প ঢালিয়া আসিত। আজ স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পথে অমর ইটালীয় কবিদের পুণ্যসমাধিক্ষেত্রে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের লোভ সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না। নরেন্দ্র স্থির করিল যে, সে ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় কিছুকাল ইটালীতে অবস্থান করিবে।

নরেন্দ্র কলিকাতার সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী বিভূতিভূষণ হালদারের একমাত্র পুত্র, শৈশবে মাতৃহীন। বিভূতিবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু সমপাঠী অজিতকুমারের সহিত পাঠদ্দশায় এক প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়ের সর্ব্বপ্রথম সন্তানকে পরিণয়-

সূত্রে আবদ্ধ করাইয়া তাঁহারা বন্ধুতার বন্ধন আরও অবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন। যথাসময়ে বিভূতিবাবুর পত্নী এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন, ঠিক তাহার প্রায় তিন বৎসর পরে অজিতবাবু সুকুমারী কন্যামুখ দর্শন করিলেন। সদ্যপ্রসূতা কন্যা অজিতবাবুর ঘর আলো করিয়া বসিল, তিনি কন্যার নাম রাখিলেন সুষমা।

প্রস্তাব হইল যে, কন্যার অন্নপ্রাশনের সময়ে উদ্বাহকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে; কিন্তু বিভূতিবাবুর কোন সাংসারিক গোলযোগের জন্য তখন সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। যখন তাহারা পরিণত হয়, তখন নরেন্দ্রের বয়স সাত বৎসর ও সুষমা চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু সুষমার জননীর অদৃষ্টে পরিবারযুগলের মিলনসুখ অধিক দিন ঘটিল না। বিবাহের সাত মাস পরে একমাত্র আদরিণী সুষমাকে রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন।

বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিবে? কোথায় বন্ধুযুগল আশৈশব ভালবাসার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিবে, কোথায় পরস্পরের মধ্য হইতে সামান্য স্বার্থচিন্তাগুলি অপসারিত হইয়া আদর্শ বন্ধুত্বের জ্বলন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিবে, তাহা না হইয়া ব্যবসায়ের একটি হিসাবের ভুল লইয়া দুই বন্ধুতে একটু বাক্‌বিতণ্ডা হয়, পরে সেই ধূম কুলোকের প্ররোচনায় প্রবল বহ্নিতে পরিণত হইয়া বহুকালের সঞ্চিত অনুরাগের পবিত্র স্তূপ ভস্মীভূত করিয়া দেয়। অজিতবাবুর মূলধন ছিল না, সে কায়িক পরিশ্রম করিয়া বিভূতিবাবুর ব্যবসায়ের এক চতুর্থাংশ লাভ করিত। বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ও আপনার সঙ্গতিবিহীন অবস্থার উপর কঠোর ও ঘৃণিত সমালোচনা শুনিয়া অজিত বাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়া একমাত্র মাতৃহীনাকন্যা সুষমাকে লইয়া সংসারস্রোতে ঝাঁপ দিলেন। বিচ্ছেদের অন্ধকার এরূপ ঘনীভূত হইয়াছিল যে, আর কেহ কাহারও খবর লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিত না। তাহার উপর অজিতবাবু একটু স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি অনাহারে কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মরিতে হয় তবুও নরেন্ হালদারের দ্বারস্থ হইব না।

বিভূতিবাবু সংবাদ পাইলেন যে, অজিতকুমার সরকার ও তাহার কন্যা সুষমা বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের পরিবারের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। সেইদিন বাল্য প্রণয়ের ছবি বিভূতির হৃদয়ে এরূপ সুস্পষ্ট

ভাবে জাগিয়া উঠিল যে, তাহার বুকের মধ্য হইতে কাল বৈশাখীর মত একটী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

নরেন্দ্র আজ ইটালীতে পৌঁছিয়াছে। সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন স্মৃতির আধার রোম নগরের একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে কিছুক্ষণ এই হোটেলে অবস্থান করিয়া জানিতে পারিয়াছে, হোটেলের কর্ত্তা, প্রভুপত্নী ও দ্বারবান ব্যতীত সকল অধিবাসীই বৈদেশিক। তাহাদের মধ্যে একজনও ইংরাজ ছিল না যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করে ও তাহার অতীত কল্পনার চরিতার্থতা লাভ করে।

কিন্তু রোমের নামেই তাহার আনন্দ, সেখানকার প্রত্যেক ছবিটী তাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়া দিত। বিলাতে সে প্রায় চারি বৎসর কাটাইয়াছে, কিন্তু এত অনাবিল আনন্দ সে একদিনও উপভোগ করে নাই।

যখন সে নিজ আবাস-কক্ষের নদীতটমুখ উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া পুরোবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ টাইবার নদীর কম্পিত বক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিত, তখন সে ভাবিত ইহা অপেক্ষা আর কিছু সুন্দর বোধ হয় ইউরোপে নাই। প্রতিদিন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য-উপভোগের মধুর কল্পনা তাহার হৃদয়ে নূতন নূতন কৌতূহল বহিয়া আনিত।

হোটেলে পদার্পণ করিবার দুই দিন পরে নরেন্দ্র ভ্রমবশতঃ তিনবারের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত ঘণ্টা দুইবার নাড়িয়া দিল, দ্বারবানের পরিবর্ত্তে একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতী দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবতীকে একটি অযত্নপালিতা ইংরাজ বালিকা বলিয়া বোধ হইল, তাহার রুগ্ন দেহযষ্টি মলিন রুক্ষ বেশে আবৃত ছিল।

তাহার বিশীর্ণ ও বিবর্ণ মুখমণ্ডল, দীর্ঘকাল ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদপ্রান্ত, অসংস্কৃত অঙ্গাচ্ছাদন, ঈষৎ পাটলাভ অযত্নস্খলিত কেশকলাপ দেখিয়া নরেন্দ্র বুঝিল, এ ক্ষীণাঙ্গী নিশ্চয়ই হোটেলের সর্ব্বকর্ম্মক্ষমা, কঠোরক্লেশসহ্যশীলা হতভাগিনী দাসী। নিয়তির গাঢ় কালিমার মধ্য হইতে যুবতীর বদনমণ্ডলে এমন একটী সৌন্দর্য্য, সারল্য ও মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, বাক্য-বিনিময়ের পূর্ব্বে যুবক নির্নিমেষনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ও কোমল বাঙ্গালী-হৃদয় সহানুভূতির নীরব প্লাবনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

যুবক সলজ্জভাবে বলিল, "মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি ভুল করেছি। আমি দারোয়ানকে চাই।"

যুবতী ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। আপনি আদেশ করুন। আমি সেজন্য সদাই প্রস্তুত।"

যুবতীর সহিত ইংরাজীতে কথা বলিয়া তাহার প্রাণে অনেকটা শান্তি আসিল।

বালিকার সরল, সহজ ও মধুর উত্তরে যুবকের অধর প্রফুল্লতার স্মিত-হাস্যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

যুবতীও ঈষৎ হাসিল, যুবতীর মুক্তাধবল দন্তপংক্তির কান্তিতে সে হাস্য আরও সুন্দর হইয়া উঠিল।

যুবক এ অপ্রত্যাশিত হাস্যের কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে নরেন্দ্র তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। যুবতী স্বভাবসিদ্ধ ক্ষীণ ও মধুরকণ্ঠে উত্তর করিল, 'বিউটি'। যুবতী নিষ্ক্রান্ত হইল, নরেন্দ্রের দৃষ্টি তাহার গমনপথবর্ত্তিনী হইল।

এই সুবৃহৎ হোটেলের প্রাণান্তকারী কঠোর কর্ম্মভার বহন করা কি এই কঙ্কালসার হতভাগিনী বালিকার পক্ষে সম্ভব? যুবক বিস্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতেছিল। যখন সে শুনিল যে, তাহাকে দ্বিতলস্থিত সমূহ কক্ষের সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হয় ও অন্যান্য ভৃত্যগণ কঠোর কর্ম্মক্লিষ্টা বালিকার খর্ব্বাকৃতি ও শারীরিক ক্ষীণতার জন্য উপহাসচ্ছলে "আগ্‌লী" (কুরূপা) বলিয়া ডাকে, তখন যুবক হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইল।

যুবক দেখিত, বালিকা বাহু-যুগলের মধ্যে মলিন বস্ত্রের বোঝা লইয়া নীচে নামিতেছে, গুরুভারে তাহার পতনোন্মুখ ক্ষীণ দেহযষ্টি বাঁকিয়া গিয়াছে। কখনও কখনও দেখা যাইত, পরিশ্রান্তা হতভাগিনী বিশ্রামলাভের জন্য সোপানে বসিয়া নেত্রনীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। হতভাগিনী কঠোর পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিত; কিন্তু প্রতিদিন প্রভাতে নরেন্দ্রের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ-মধুরহাস্যে জিজ্ঞাসা করিত, "আপনার ঘরটি পরিষ্কার ক'রে দিব কি?"

সহৃদয় যুবক বিনীত ও কোমল সৌজন্যে তাহাকে বাধিত করিত, বিউটি

নিজকর্ম্মে দ্বিগুণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ও যুবককে আপনার গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়া তাহার প্রতিদান করিত। যুবতী নরেন্দ্রের শান্তিভঙ্গের ভয়ে এরূপ সতর্কতার সহিত গৃহকর্ম্ম করিত যে, যুবক লিখিবার সময় নিজগৃহে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিত না। সম্মার্জ্জনা-সঞ্চালনের ক্ষীণ শব্দ, বাসন ও জলপাত্রাদির মৃদু ঝঞ্চনা, স্থানান্তরিত চেয়ারগুলির অস্পষ্ট শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইত; কিন্তু যুবক কখনও তাহার শ্বাসগ্রহণ বা পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। যেন একটা ছায়া-মূর্ত্তি আসিয়া নীরবে তাহার সকল কাজ করিয়া যাইত।

একদিন বিউটীকে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে টাইবার-তরঙ্গের দিকে চাহিতে দেখিয়া নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিউটী, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে কি? তোমার মনে বড় দুঃখ হয়েছে? না?"

বালিকা হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া সহাস্যে বলিল, "না না, আমার কোন কষ্ট হয় নি; আমার কিছু মাত্র দুঃখ নেই।"

যুবতী পুনরায় স্ফূর্ত্তির সহিত নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। যুবক আন্তরিক সহানুভূতির বশে তাহার জন্মস্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিল। এই অপ্রত্যাশিত, মধুর প্রশ্ন প্রণয়ীর সুখস্পর্শের ন্যায় যুবতীর কমনীয় কপোল দুইটী আরক্তিম করিয়া তুলিল।

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অত্যধিক প্রফুল্লতার সহিত বিউটী উত্তর করিল, "আমি ম্যানচেষ্টারের এক কারিকরের কন্যা। যৌবন উন্মেষের পূর্ব্বেই মাতৃহীন। মায়ের মৃত্যুর পর আমার উপর দুঃখের বোঝা নেমে পড়্‌ল। বাবা আমায় দেখ্‌তে পার্‌তেন না। আমার আর দুটী ভাই ও একটী ভগিনী ছিল। তারাই বাবার সমুহ স্নেহ অধিকার করে থাকৃত। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন ততদিন বাবার ক্রোধ আমার উপর কেবল নিষ্ফল গর্জ্জন করিত। মাও চক্ষু মুদ্‌লেন, আমিও ভুবন অন্ধকার দেখ্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ত্রুটিতে বাবার হাতে আমার দেহ বেত্র-জর্জ্জরিত হয়ে উঠ্‌ল। জনৈক ইংলণ্ড-প্রবাসী ইটালীয় ভদ্রলোকের সহিত পালিয়ে এই হোটেলে এসে আশ্রয় পেয়েছি। এখন আমার দাসীবৃত্তি ব্যতীত অন্য উপায় নেই।"

যুবক অশ্রুবেগ সংযত করিতে পারিল না।

মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া বালিকা বলিল, "আমি আপনাকে আমার ভাই ভগিনীদের দেখাতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

বিউটী দৌড়িয়া গেল ও দুই মিনিট পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ের একখানি চিত্র ঈষৎ গর্ব্বভরে সম্মুখের টেবিলটার উপর রাখিল।

নরেন্দ্র চিত্রে তিনটি স্বভাবচঞ্চল ইংরেজ বালকের ছবি দেখিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারা খুব সুখে লালিত। নয় কি?"

যুবতী সৌজন্যস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, এরা আমার চেয়ে কত সুখী!"

যুবক চিত্র প্রত্যর্পণকালে বলিল, "বিউটী তোমার ভাই-ভগিনীদের দেখে বড়ই প্রীত হ'লাম।"

যুবতী বলিল "আমি আরও সুখী হলাম যে, আপনি দয়া করে দেখ্‌লেন, আপনি খুব ভাল লোক।"

সেইদিন হইতে যুবক সর্ব্বদা লক্ষ্য করিত, যুবতীর দৃষ্টি কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত ও যুবকের অনুগামিনী। দিন দিন বিউটী যুবকের কার্য্যে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

একদিন বর্ষা-প্রভাতে যুবক বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, বিউটী কোমল ও মৃদু প্রতিবাদব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "এ বর্ষায় ওয়াটারপ্রুফ্‌ না নিয়ে বাহির হওয়া ঠিক নয়।"

আর একদিন নরেন্দ্রের নেকটাই একটু কলারের উপর উঠিয়া গিয়াছিল দেখিয়া বিউটী হাত বাড়াইয়া তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিল ও আত্মস্মৃতি হঠাৎ জাগ্রত হওয়ায় এরূপ সম্মানের সহিত সুন্দরভাবে হাত সরাইয়া লইল যে, তাহাতে নরেন্দ্র তাহার সরল ভদ্রোচিত কথোপকথন অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ লাভ করিল।

যুবকের সহিত এইরূপ ঘন ঘন বাক্যালাপ করিয়া বিউটী যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করিত ও সাতিশয় আগ্রহের সহিত আপনার ক্লেশময় জীবনের কাহিনী-গুলি নিবেদন করিত। নরেন্দ্রের চিত্ত বালিকার করুণ কাহিনী মধ্যে মধ্যে

উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রহেলিকাপূর্ণ স্বপ্নসুন্দর মুখমণ্ডলে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিত।

এই ক্ষীণ, নীরস, রুক্ষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে কোথায় যে, এই মনোরম সারল্য লুক্কায়িত ছিল তাহা নরেন্দ্র কিছুতেই স্থির করিতে পারিত না। এ মুখ কেন তাহার হৃদয় মধ্যে ধীরে ধীরে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে তাহা সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না।

নরেন্দ্র লক্ষ্য করিত, বিউটী বাক্যালাপকালে উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া দূরে কলনাদী টাইবার নদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। সে টাইবারকে আপনার অতীত জীবনের বিষাদময় চিত্রের স্পষ্টতা দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া জানাইত ও তাহার এ দুর্ব্বল জীবনপ্রবাহ কবে কোন্ অজানিত রহস্যময় সাগরে গিয়া মিশিবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিত। এইরূপে টাইবার-তরঙ্গের দিকে চাহিতে চাহিতে যখন তাহার কথা ফুরাইয়া আসিত, তখন সে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিত। তাহার চিন্তা ও দুঃখের কথা তুলিয়া বালিকা-হৃদয়ে ব্যথা দিতে নরেন্দ্রের প্রাণে বড়ই লাগিত। সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "বিউটী তোমায় সকলে কুরূপা বলিয়া ডাকে কেন।"

দুঃখের হাসি হাসিয়া বালিকা বলিল, "আমি কুরূপা তাই তারা আমার নাম কুরূপা রেখেছে।"

কিছুক্ষণ থামিয়া বালিকা বলিল, "আপনি আমায় কি বলে ডাকবেন?"

"কেন বিউটী বলে।"

"তা হলে আমি বড় সুখী হই।"

"কেন বিউটী?"

"তা জানি না।"

যুবকের সহিত কথা কহিতে কহিতে বালিকার রুদ্ধ হৃদয় যেন উন্মুক্ত হইয়া আসিত। একটী কথা বলিতে গিয়া অনেক কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত। সে নরেন্দ্রের নিকট তাহার ক্লেশের কথা আর গোপন করিত না।

একদিন নরেন্দ্র বিউটীর চক্ষু দুটী অশ্রুভারে অবনত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে বিউটী?"

বিউটীর বুক আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। তাহার দুঃখের কথা শুনিতে, তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসে দীর্ঘনিঃশ্বাস মিশাইতে জগতে একজনও এখন আছে ভাবিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

আজ দুই দিন বিউটী কর্ম্মভারে বড়ই কাতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আঠারটী কক্ষের সকল কার্য্য করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি বিউটী কোনরূপে সম্পন্ন করিতে পারিত, কিন্তু হোটেলের অতিথিগণ তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। সকলে ত আর যুবকের মত করুণহৃদয় নয়। কেহই হতভাগিনীর প্রতি করুণা দেখাইত না। কেহ কেহ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইত। বিউটী তাড়াতাড়ি সোপান বাহিয়া উপরে আসিলে কেহ জানালার কবাট বন্ধ করিতে বলিত, কেহ বা তাহার "আগ্‌লী" নাম ধরিয়া খেপাইবার জন্য ডাকিত, কেহ গৃহের এধারের জিনিসটী ওধারে করিয়া রাখিবার জন্য আদেশ দিত। হতভাগিনীর পক্ষে ইহা বড়ই ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু কি করিবে, উদরান্নের অন্য উপায় ছিল না।

স্বজনহীনা বিউটীর কর্ম্মক্লান্ত মুখমণ্ডল বিষাদের কালিমায় ক্রমশই শ্রীহীন হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্রের ভাবনা বিউটী কিরূপে সুখ পায়। সে বালিকার ক্লেশময় জীবনে শান্তিদানের উপযুক্ত, সুললিত বাক্য খুঁজিয়া না পাইলে বড়ই ব্যথিত হইত।

বালিকা যুবকের মুখদর্পণে আত্মহৃদয়ের পুঞ্জীভূত গভীর বেদনার সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিত।

একদিন নরেন্দ্র প্রভাতে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিউটী, তোমার মুখ যেন আজ বড়ই বিষণ্ণ বোধ হচ্ছে।"

বালিকা হর্ষজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি জানেন যারা সর্ব্বদা পরিশ্রম করে তাদের মেজাজ একটু খিট্‌খিটে হয়। তা ছাড়া আমি দিনকয়েক বেশ সুখে আছি। এখানকার বাতাস খুব মিষ্ট ও স্ফূর্ত্তিজনক। দেখুন আজ জেলে ডিঙ্গিগুলি কেমন সারি সারি চলেছে।"

বিউটী মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আজ কি দরকার ?"

যুবক কৃতজ্ঞতাভরে বালিকার ক্লেশ-লাঘবের জন্য বলিল, "কিছুই চাই না।"

এরূপ স্নেহ ও করুণপূর্ণ কথা ত বিউটী আর কাহারও নিকট কখনও শোনে

নাই। লজ্জা, বিস্ময় ও আনন্দে বালিকার মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিত। যুবক লক্ষ্য করিত যে, তাহার ক্ষুদ্র এক একটী কথা বিউটীর ঈষন্নিমীলিত চক্ষুদুটীকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিপুল হর্ষের উজ্জ্বল দৃপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত।

*   *   *

একদিন বৈকালে হঠাৎ নরেন্দ্রের এক ইংরাজ বন্ধু হোটেলে উপস্থিত হইল। লণ্ডনে অবস্থানকালে থিয়েটারে তাহার সহিত নরেন্দ্রের আলাপ হইয়াছিল। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া বড়ই প্রীত হইল। পরদিন নরেন্দ্র তাহার সহিত নৌকাযোগে টাইবার-বক্ষে ভ্রমণে বাহির হইল।

নদীবক্ষে ভাসমান নৌকা হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে নরেন্দ্র দেখিল যে, বিউটী তাহার আবাস-গৃহের খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পথের দূরত্ব হেতু তাহার দৃষ্টির গতি ঠিক অনুমিত না হইলেও যুবক বুঝিয়াছিল যে, বিউটী নিশ্চয়ই বন্ধুর সহিত তাহার নদীভ্রমণ লক্ষ্য করিতেছে। নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিউটী ক্ষিপ্রভাবে তাহার গৃহ-পরিষ্কার করিতেছে। তাহাকে অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ যেন একটু অধিকতর প্রফুল্ল দেখাইল। তাহার মনে যেন কি একটা দৃঢ় সঙ্কল্প। বালিকার রক্তিম কপোল এক অস্বাভাবিক হাস্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার এরূপ হাস্য নরেন্দ্র কখনও লক্ষ্য করে নাই, তাহার অসাধারণ বাক্যপ্রয়োগ-কৌশল অপেক্ষা ইহা যুবকের হৃদয়ে অধিকতর বিস্ময়ের উদ্রেক করিল।

আর একদিন বিউটী হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নরেন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে একটী সুন্দরী রমণীর চিত্র দেখিতেছে। নরেন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, বিউটীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার বিশুষ্ক মুখমণ্ডলে যেন কালিমার গাঢ় রেখাপাত হইয়াছে। যুবক কারণ অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "এ আমার মার ছোট বেলার ছবি।" পর মুহূর্ত্তে নরেন্দ্র বিউটীর হৃষ্ট ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল।

বালিকা ছবিটী ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "বেশ সুন্দর চেহারা।" যুবক আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বিউটী আমরা যাকে সৌন্দর্য্য বলি, রমণীর মুখ-পদ্মে যে স্বপ্নময়ী সুষমা থাকে—সেতা' নিজে দর্পণের সাহায্যে অনুভব করতে পারে না।"

বিউটী তাহার দিকে না চাহিয়া বলিল, "যখন সে তার সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পায় না, তখন তা যে আছে সে কিরূপে বিশ্বাস কর্‌তে পারে।"

"সে বিশ্বাস করতে পারে এজন্যে যে, তার প্রিয়জনের নয়নপ্রান্তে সে সৌন্দর্য্য-চিত্রটুকু মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে।"

বিউটী সব বুঝিতে পারিল। যুবকের দিকে চাহিয়া কৃতজ্ঞতা ও নিরাশা-ব্যঞ্জক হাসির সহিত মস্তক অবনত করিল। ক্রমে ক্রমে যুবকের হৃদয়ে সন্দেহের একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়িল ও পরদিন তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইল।

বালিকার আনীত বস্ত্রস্তূপের উপর হাত রাখিয়া যুবক একখানি বই পড়িতেছিল। বিউটী স্তূপমধ্য হইতে একখানি বস্ত্র বাহির করিবার সময় হঠাৎ তাহার হাতে যুবকের হাত লাগিল।

বিউটী অতি ক্ষিপ্রতার সহিত হাত টানিয়া লইল ও যুবক দেখিল যে লজ্জায় তাহার কেশের মূলদেশ পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

কখনও কখনও নরেন্দ্র দেখিত যে, বিউটী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারি চক্ষু মিলিত হইলে বালিকার দুর্ব্বল চক্ষু দুইটী আনত হইত। যুবকের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। হতভাগিনী বিউটী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

বালিকার সরমব্যঞ্জক ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে নরেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, তাহার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। সে তাহার সরল স্বভাবসিদ্ধ ও করুণ কাহিনী ব্যতীত অন্য কোনরূপ কথার অবতারণা করিত না। যুবক ভাবিল, হায় অভাগিনী আত্মীয়বন্ধুহীনা হইয়া সুদূর বঙ্গবাসী একজনকে হৃদয় দান করিয়া ভুল করিল। আমি ইহার কি করিতে পারি? কিছুই না। কেবল দুই চারি দিন দুই একটা দীর্ঘশ্বাস ও দুই চারি ফোঁটা অশ্রুজল। তার পর বাঙ্গালায় বসিয়া উন্মত্তের ক্ষণিক জ্ঞানবিকাশের ন্যায় মাঝে মাঝে হতভাগিনীর কথা মনে আসিতে পারে।

সময়ে সময়ে বিউটীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নরেন্দ্রের আকুল আবেগে বালিকার কোমল করপল্লবটি আপন হাতের মধ্যে টানিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিত, সে বহুকষ্টে উত্তেজনা দমন করিত। কে যেন তাহার আত্মার

আঘাত করিয়া বলিয়া যাইত যে, তাহার এ ভালবাসা ও আবেগ সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভের ন্যায় দুইদিন পরে নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন উজ্জ্বল, তেজোময় বস্তুর সম্মুখে হস্ত রাখিলে যেমন হস্তের ছায়া তাহার উজ্জ্বলতাকে কিঞ্চিত মলিন করিয়া তুলে, তদ্রূপ যুবকের এই ক্ষণিক উত্তেজনামূলক আকর্ষণে হতভাগিনীর যাহা কিছু মধুর, সুন্দর ও উজ্জ্বল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।

অত্যধিক স্নেহ ও আদর দেখাইবার প্রবল উত্তেজনা যখন যুবককে আক্রমণ করিত তখন বিউটী তাহা বেশ বুঝিতে পারিত। কারণ সে দৃশ্যে ও কল্পনায় বালিকার মুখমণ্ডল লজ্জাবিদ্ধ হইয়া উঠিত। যুবকের বহুকষ্টে আবেগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভও বালিকার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। কারণ তখন তাহার মুখে একটা স্বাভাবিক দুঃখ ও বিষণ্নতার গাঢ় ছায়া পতিত হইত।

যুবকের হৃদয়ে আবেগের ভীষণ বন্যা বহিতেছিল; কিন্তু বিউটীর ব্যবহারে যুবকের প্রতি ভালবাসার কোন চিহ্ন পরিস্ফুট থাকিত না। প্রথম সাক্ষাতের দিনের মত আজও তাহার কণ্ঠস্বর ভীতিপূর্ণ ও আগ্রহ-তাড়িত। আজও সে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে "আপনার ঘরটি পরিষ্কার করে দি? রাত্রে আপনার ঘুম হয়েছে ত?"

যতক্ষণ না নরেন্দ্র তাহার সহিত বাক্যালাপ করিত, ততক্ষণ বিউটী গৃহে প্রবেশ করিয়া একই প্রশ্ন ভিন্ন দ্বিতীয় কথা উত্থাপন করিত না। যুবকের মনের গুপ্তভাবগুলি জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত না। তাহার দৃষ্টিতে বোঝা যাইত যে, বালিকা যেন বুঝিয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ টাইবার নদের মত একটা অলঙ্ঘনীয় স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে।

দুই একটী বিষয়ে বিউটীর কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। তাহার বেশ পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুবিন্যস্ত ও কেশরাশি যত্নের সহিত রক্ষিত। সে সর্ব্বদা একটি পরিচ্ছন্ন অঙ্গাবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিত এবং পূর্ব্বের ন্যায় যদি কচিৎ চারি চক্ষুর সম্মিলন ঘটিত তাহা হইলে বিউটী লজ্জাহত মুখখানি অতি সুন্দরভাবে ফিরাইয়া লইত।

যুবক তাহার সহিত কথা কহিলে সে এখন নদীবক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিত ও নির্নিমেষনেত্রে নৌকার পাইলগুলি নিরীক্ষণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ হাস্যরেখা যুবকের অলক্ষ্যে তাহার ওষ্ঠে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিত।

যেন যুবকের সুমধুর বাক্যসঙ্গীতের স্নিগ্ধ ঝঙ্কার নদীশীকরসম্পৃক্ত শীতল সমীরণে ভাসিয়া আসিয়া তাহার কর্ণমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। যুবকের কথা শেষ হইলে বিউটী স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় ধীরে ধীরে আপনাকে বলিত, "হায় হতভাগিনি!" তাহার করুণ ও হতাশ ক্ষীণকণ্ঠস্বরে যেন প্রকাশ পাইত যে, "এ একটা অলীক স্বপ্ন! আকাশ কুসুম!"

যুবকের উদ্দাম আবেগ তাহার হৃদয়কে ঝঞ্ঝার মত কাঁপাইয়া যাইত। কিন্তু বিউটীর নিকট আত্মপ্রকাশ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার ইচ্ছা হইত, বিউটীর মস্তকটী আপনার দুইটী হাতের মধ্যে ধরিয়া তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনে।

* * * * *

এইরূপে পাঁচমাস কাটিয়া গেল। বাড়ী হইতে মায়ের পত্র আসিয়াছে। নরেন্দ্রের গৃহ-প্রত্যাগমনের সময় আসিল। সে বিউটীকে এ সংবাদ জানাইবার সুযোগ খুঁজিয়া পাইল না। আর দুই দিন পরে তাহাকে বিউটীর সঙ্গত্যাগ করিতে হইবে। জীবনে হয়ত আর সে তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সে নিজেই তাহার জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। যাত্রার দিন প্রভাতে সে হতভাগিনীর করুণ উৎকণ্ঠা-জড়িত মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঠিক নিয়মিত সময়ে যুবক গৃহদ্বারে মৃদু করাঘাত ও কোমল কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, "আপনার ভাল ঘুম হয়েছে ত?"

যুবক বলিল, "হাঁ, তোমার?"

বালিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, হাঁ, আমি আপনার গৃহটী পরিষ্কার"—কথা শেষ হইতে না হইতে যুবতী দেখিল গৃহতলে নরেন্দ্রের বাক্স, ব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্য গোছান রহিয়াছে। বিউটীর যেন মাথা ঘুরিয়া গেল, সে বহুকষ্টে নিজের বিস্ময় ও দুঃখ চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এস্থানের মায়া কাটিয়ে চল্লেন?"

যুবক ধীরভাবে উত্তর করিল, "বিউটি তোমায় জানাবার সাহস হয় নাই, কি করি মা'র চিঠি পেলুম, তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কি কর্ব বিউটী উপায় নাই। তোমার জন্য এস্থানের প্রতি আমার কেমন একটা মায়া বসে গেছে। আমি জীবনে তোমায় ভুলতে পার্ব না।"

যুবকের এ আশ্বাসে বিউটীর কালিমাপূর্ণ ও অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল হইতে বিষাদের ছায়া কিছুমাত্রও অপসারিত হইল না। বালিকার উদাস স্থির পলকবিহীন চক্ষুদুটী উন্মুক্ত গবাক্ষপথে সুদূর দিঙ্‌মণ্ডলে সন্নিবদ্ধ। দুই কপোল দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

নরেন্দ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আসবাবপত্র লইবার জন্য মুটে আসিল। বালিকা তখনও অচঞ্চলভাবে টাইবার-বক্ষের ডিঙ্গীগুলির দিকে চাহিয়াছিল।

যুবক বলিল, "বিউটী আমি কিরূপে তোমায় ধন্যবাদ দিব ঠিক করে উঠ্‌তে পারছি না। তুমি আমায় প্রভূত অনুগ্রহ দেখিয়েছ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি জীবনে শান্তি পাও।"

নরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে আপনার পকেট হইতে চারিটী স্বর্ণমুদ্রা হাতে করিয়া রাখিয়াছিল। বিদায়কালে সে বালিকার হাতে দিবার জন্য বিউটীর হাত ধরিয়া তুলিল। বিউটী ব্যস্ততার সহিত হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি কিছুতেই নেব না।"

যুবক মুদ্রাগুলি বিউটীর জামার পকেটে ফেলিয়া দিল। যুবতী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ক্ষিপ্রভাবে বাহির করিয়া সেগুলি নরেন্দ্রের পকেটের মধ্যে রাখিয়া বলিল, "না, আমি প্রাণ গেলেও নেব না।"

যুবক তারপর আপনার অঙ্গুলি হইতে নিজের প্রস্তর-খচিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টী খুলিয়া বিউটীর হাতে পরাইবার জন্য তাহার হাত টানিল। সে পূর্ব্বের ন্যায় তাহার অনিচ্ছা জানাইয়া বলিল, "না, এ চাকরাণীর হাতের যোগ্য নয়।"

নরেন্দ্র বলিল, "বিউটী, ইহা পুরস্কার বা প্রতিদান মনে ক'রো না, এ কেবল সামান্য স্মৃতিচিহ্ন। তুমি কি আমার স্মরণচিহ্নটুকুও গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক? তুমি কি আমায় জন্মের মত ভুলে যেতে চাও।"

যুবতী দ্বিরুক্তি করিল না। নরেন্দ্র যত্নের সহিত তাহার ক্ষীণ কম্পিত করপল্লব তুলিয়া অঙ্গুরী পরাইয়া দিল। বিউটী অঙ্গুরীর দিকে না চাহিয়া উহা গ্রহণ করিল। তখনও সে মুগ্ধনেত্রে দূর টাইবার-প্রবাহের দিকে চাহিয়াছিল। শুধু রোদনোন্মুখ বালিকার মত তাহার ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

"তবে বিদায় বিউটী"—যুবক কাঁদিয়া ফেলিল ও বিউটীর মস্তকে নরেন্দ্র হাত-

খানি রাখিবার পূর্ব্বে বালিকা বিপুল আগ্রহে টানিয়া লইয়া ঘন-চুম্বনে তাহার হৃদয়-নিহিত অপ্রকাশিত ভালবাসার গভীরত্ব জানাইয়া দিল।

যুবক আর একবার "বিদায়! বিঁউটী মাঝে মাঝে পত্রের উত্তর দিতে ভুলিও না" বলিয়া নিজের ঠিকানাটি টেবিলের উপর রাখিয়া নিস্ক্রান্ত হইল।

আর হতভাগিনী বিউটী করতলে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারে বসিয়া অবারিত তপ্ত অশ্রুপ্রবাহে বসন সিক্ত করিতে লাগিল।

* * * * *

নরেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সহরের কর্ম্মচঞ্চল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে হতভাগিনী বিউটীর স্নিগ্ধ করুণ ছবিটী তাহার হৃদয় হইতে প্রায়ই মুছিয়া গিয়াছে। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কয়েকবার উপরে উঠিবার নিষ্ফল প্রয়াস দেখাইয়া চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়, সেইরূপ রোমের হোটেলের অভাগিনী বালিকার স্মৃতি যুবকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দুই চারিবার প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন লুকাইয়া গিয়াছে।

সে আজ নবপরিণীতা পত্নীর অগাধ ভালবাসায়, স্নেহশীল জনকজননীর বিপুল স্নেহে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর ভাবিতেছে। সুখের ও শান্তির পুষ্প-শয্যায় শয়ন করিয়া দীনের কণ্টকময় শয্যার কথা কেনই বা তাহার মনে পড়িবে!

আজ এক বৎসরের অধিক হইল, সে বিউটীর কোনও খবর পায় নাই। প্রথম প্রথম দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু একখানিরও উত্তর নাই। তার পর নবাগতা পত্নীর বিপুল প্রেমে সে আর বিউটীর খবর লইতে পারে নাই।

আজ ছুটীর দিনে বসিয়া নরেন্দ্র কবিতাময়ী পত্নীর মধুর রূপ-প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া মাসিক পত্রের জন্য "পরাজয়" কবিতা লিখিতেছিল। পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র ও একটী প্যাকেট দিয়া চলিয়া গেল।

পত্রের আবরণের উপর রোমের মোহর অঙ্কিত দেখিয়া বিউটীর বিস্মৃত মুখ-খানি তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল।

নরেন্দ্র পড়িতে লাগিল, "মহাশয়, আমার হোটেলের "আগ্‌নী" নাম্নী চাক-রাণীকে বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন নাই। তাহার অনুরোধে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আপনার হোটেল ছাড়িবার দুই দিন পরে সে জ্বরে শয্যাশায়িনী হয়। তাহার মুখে জল দিবার কেহ ছিল না। তাহার হাতে একটীও পয়সা

ছিল না, আমি সাধ্যমত তাহার অভাব দূর করিবার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলাম; কিন্তু ক্রমশই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিল, ডাক্তার আশা ত্যাগ করিল। আমি যতক্ষণ তাহার নিকট থাকিতাম, তাহার চক্ষু দুইটী কখনও অশ্রুহীন দেখি নাই। সে একটি হীরক অঙ্গুরী সর্ব্বদা চুম্বন করিত। আমি একদিন সেটীকে বিক্রয় করিয়া তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিলে সে আমার পায়ে ধরিয়া নিষেধ করিল। সেই দিন হইতে আমি তাহার ব্যয়ভার বহন করিতেছিলাম। কিন্তু ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হতভাগিনীর উপর পড়িল না। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সে আমার হাতে ধরিয়া বলিল "জগতে আমায় একজন ভালবাসত।" সে আপনার ঠিকানাটী দেখাইয়া বলিল,—'ইনি।' আমার মৃত্যুর পর আপনি এই অঙ্গুরী ও আমার ব্যাগ তাঁহার নিকট পাঠিয়ে দিলে আমার সব সাধ পূর্ণ হবে। হতভাগিনীর এই শেষ আশা কি আপনি রক্ষা করিবেন না?" এই বলিয়া সে হীরক অঙ্গুরিটী ও আপনার নাম-লিখিত কাগজখানি বার বার চুম্বন করিতে করিতে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। মৃতার শেষ অনুরোধে আপনাকে এই পত্র লিখিলাম ও ব্যাগের চাবিটী পত্রের মধ্যে দিলাম।

আপনারই অনুগত
ব্রাউন
হোটেল-কর্ত্তা।"

নরেন্দ্রের অশ্রুস্রোত বর্ষার পূর্ণ নদীপ্রবাহের ন্যায় তাহার কপোলের দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিল। ব্যাগের চাবি খুলিয়া দেখিল, পাঁচখানি রুমাল, চারিখানি সাবান, তিনটী জ্যাকেট ও তাহার নিজের অঙ্গুরী অতি সুন্দরভাবে ব্যাগের মধ্যে গোছান রহিয়াছে। তাহার উপরে কাগজের টুকরায় ইংরাজীতে অস্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, "এ ব্যাগটী আমার মৃতা জননীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার শেষ দান। ইহাতে আমার একমাত্র অধিকার ছিল। অবশিষ্ট জিনিষগুলি সবই আমার। ইহা আপনার বিবাহের সময় হতভাগিনীর প্রীতি-উপহার।

হতভাগিনী
বিউটী।"

নরেন্দ্র জিনিসগুলি ব্যাগের মধ্য হইতে বাহির করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ব্যাগের আবরণ-বস্ত্রের নিম্নে পার্শ্বের দিকে তাহার হাতে কি একটা লাগিল। বহুকষ্টে পার্শ্ব হইতে মধ্যে আনিয়া বুঝিতে পারিল যে, একখণ্ড কাগজ।

ব্যাগের মধ্যস্থিত বস্ত্রের সেলাই খুলিয়া বহুকষ্টে নরেন্দ্র পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিল। একি তাহার মুখমণ্ডল হইতে সমস্ত শোণিতটুকু অপসারিত হইল কেন? ও কি! তাহার মাথা ঘুরিতেছে কেন? তাহার বক্ষস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে কেন?

পত্রখানি ম্যানচেষ্টারের সেই কারিকরের মৃতাপত্নীর পত্র। সেই পত্রে তিনি বিউটীর জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"বিউটী আমার প্রকৃতা কন্যা নয়। উহার পিতা অজিতকুমার সাহা হাওড়ায় আমার স্বামী ষ্টিফেনের অধীনে কর্ম্ম করিত। বালিকা শৈশবে মাতৃহীনা। অজিতের বাসা আমাদের বাসার খুব নিকটে ছিল। সে বৎসর হঠাৎ বিসূ'চিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। আমার বড় ভয় হইল। কিন্তু আমার স্বামী খুব সাহসী পুরুষ, তিনি বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তার পর শুনিতে পাইলাম যে, অজিত বাবুকে বিসূচিকায় ধরিয়াছে। তার পর দিনেই জানালার মধ্য হইতে দেখিলাম যে, তাঁহাকে মেথরে লইয়া গেল। ছোট বালিকাটির করুণ ক্রন্দনে ক্ষুদ্র গৃহটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। আমি তাহাকে আমার আয়ার বাড়ীতে কিছু টাকা দিয়া পাঠাইলাম। তার সঙ্গে চুক্তি রহিল যে, একমাস পরে সে তাহাকে আমার বাসায় আনিয়া হাজির করিবে। তাহাই হইল। বিউটী বলিলে বালিকার নামের অর্থ বোঝায় সেইজন্য আমিই তাহার ঐ নাম রাখিয়াছিলাম। সাহেব প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বলিলেও বাঙ্গালীর মেয়েকে আমার গৃহে ও কোলে দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইতেন ও সময়ে সময়ে আমায় মেয়েটী পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। আমি কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে তাহার প্রতি বড়ই স্নেহ দেখাইতে লাগিলাম। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার ঠিক ঐরূপ একটি মেয়ে আমার কোল শূন্য করিয়া গিয়াছে। মেয়েটী ঠিক সাহেবদের মেয়ের মত সুন্দর। পরবৎসর স্বামী স্বদেশে আগমন করিলেন, আমিও মেয়েটীকে লইয়া

দেশে আসিলাম। একদিন দুইজন লোক আসিয়া আমার হাওড়ার বাসায় অজিতবাবুর মেয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিল। আমার চাকর বলিল, সে তার বাপের পরেই কলেরায় মারা গিয়াছে। আমিই তাহাকে একথা শিখাইয়া দিয়াছিলাম; কারণ ভয় হইতেছিল যদি অজিতবাবুর কোন বন্ধু আসিয়া আমার কোল হইতে মেয়েটীকে কাড়িয়া লইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, অজিত বাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে মেয়েটীর বিবাহ হইয়াছে। আমি তাঁহার একথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। আমিও বালিকার ভাবী জীবনের শান্তি-ভঙ্গের ভয়ে তাহার নিকট এসব কথা প্রকাশ করি নাই।"

নরেন্দ্র নিজের বিগত জীবনের ইতিহাস জানিত। সমস্ত ঘটনা দিবা-লোকের ন্যায় তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অবারিত অশ্রুজলে পত্রখানি সিক্ত হইয়া উঠিল। এক বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস কক্ষের রুদ্ধ বায়ুকে কম্পিত করিয়া দিল।

নরেন্দ্রের যুবতী পত্নী গবাক্ষের কবাট ঈষন্মুক্ত করিয়া এতক্ষণ স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, ইহা বোধ হয় স্বামীর কোন মানস-সুন্দরীর নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান, নতুবা কেনই বা স্বামীর চক্ষু হইতে অবারিত অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে, কেনই বা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইবে?

স্বামীকে হাতে হাতে ধরিবার উদ্দেশ্যে গৃহে প্রবেশ করিয়া একটু ব্যঙ্গপূর্ণস্বরে নরেন্দ্রের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার পত্র এতক্ষণ ধরে পড়া হচ্ছিল?"

নরেন্দ্র কম্পিতকরে পত্রখানি তাহার হাতে ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহের বাহির হইয়া গেল এবং একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস সিন্ধুপারে হত-ভাগিনীর অনির্দ্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে যেন ছুটিয়া চলিল।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

তুকারাম।

তখন দু'পর বেলা,
শ্যামল ক্ষেত্রে চড়ে ধেনুগুলি
বাছুরেরা করে খেলা।
বৃহৎ বটের ছায়
গোপালকগণে বাজায় বাঁশরী,
মেঠো সুরে গান গায়।
ঘুঘুর ঘু-ঘু-ঘু তান
অদূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া
আকুল করিছে প্রাণ।
তুকা সে তখন আক বোঝা ঘাড়ে
ফিরিছে আপন বাসে,
চিন্তায় তা'র মগন পরাণ
কত কথা মনে আসে।
কোন্ দিন কা'রে কোন্ খানে হয়
দেখেছে অভাবাপন্ন,
অভাব মোচন করিয়া তাহার
কেমনে হইবে ধন্য।
পরের বেদন সহিত না প্রাণে,
পর-উপকারে ব্রতী;
পর সেবা ক'রে কেটে যেত দিন
সংসারে নাহি মতি।

* * *

সেদিন তুকারে গৃহিণী তাহার
কহেছিলা বড় রাগি',—

"ভাবনা তোমার নাহি এক তিল
নিজ সংসার লাগি।
কিছু নাই ঘরে মাঠ হতে ত্বরা
আক এক বোঝা আন।
বেচে তা বাজারে হবে তবে জেন
আজ দিন গুজরান।"
তাই আজি তুকা বিষাদিত মনে
লইয়া আকের বোঝা
আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে
ফির্‌ছিল বাড়ী সোজা।
মাঝ পথে তা'রে রাখাল বালকে
কহে, 'তুকারাম ভাই,
খান দুই ক'রে আক দিয়ে যাও
তৃষ্ণায় ম'রে যাই।'
তুকা তাহাদের দেখিয়া শ্রান্ত
তৃষায় তৃষিত প্রাণ,
খান দুই ক'রে সাদরে তা'দের
করিল ইক্ষু দান।
গাঁয়ের ভিতরে ঢুকিতে তাহারে
ঘেরিল ছেলের ঝাঁক,
এইরূপে সব ভাগ করে দিয়ে
বাকী একখান আক।
তাই নিয়ে তুকা হরষিত মনে
ঢুকিল আসিয়া বাড়ী;
পত্নীর তার ক্ষুধার আগুনে
জল্‌ছিল পেট ভারী।
ব্যাপার শুনিয়া স্বামীর পিঠেতে
লইয়া ইক্ষুদণ্ড,

আচ্ছা করিয়া দিল এক বাড়ি
হ'ল তাহা দুই খণ্ড।
তুকারাম হাসি' কহিল, "প্রেয়সি!
লও এক ভাগ আক,
দু'খান হইল ভাগে সে মিলিল,
এই খেয়ে থাকা যাক্।"
গৃহিণী তাহার মধুর বচনে
লজ্জা পাইলা মনে;
সহিষ্ণুতা হেরি বিস্মিতা হ'য়ে
চাহিলা তুকার পানে।
তুকার হৃদয়ে অবসাদ কোথা?
অন্তর-ভরা মমতা,
ভাবিলা পত্নী পতি কি আমার
মানব? না, না দেবতা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক সঙ্কলন।

প্রাচীন রোম ও ভারত।

বাণিজ্য-পরিচয়।

ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপের সম্বন্ধ কতদিন পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা যথাযথভাবে নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে এ কথা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে রোম যখন মিশর অধিকার করেন, সেই সময়ে ভারতের সহিত ইউরোপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। রোমকগণ বাণিজ্যশীল জাতি ছিলেন না। বাণিজ্য-ব্যবসায় করিবার পদ্ধতিও তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তাঁহারা বাণিজ্যদ্রব্যের গুণোপলব্ধি করিতে পারিতেন। ভারতজাত বিলাসদ্রব্যসম্ভার তখন প্রচুর পরিমাণে রোমে রপ্তানি হইত। রোমকেরা সেই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম শিল্প-কৌশলে মোহিত হইয়া সেই-গুলি ব্যবহার করিতেন। ভারতের রেশম, ভারতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্লীন, ভারতজাত সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ না হইলে তখনকার রোমক অভিজাতবর্গের তৃপ্তি হইত না। রোম তখন উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত, তখন তাহাকে প্রতীচ্য-খণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। রোমের সভ্যতা তখন অপর জাতির আদর্শ। সুতরাং রোম যাহা করিত, তাঁহার অধীন রাজ্যসমূহের অধিবাসিবর্গও তাহার অনুসরণ করিত। ভারতের এই সকল বিলাসদ্রব্য সিরিয়া ও মিশরের বণিকগণ রোমে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত। ভারতের এই সকল বিলাসদ্রব্য ক্রয় করিতে রোমকে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে হইত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি বলেন যে, প্রতিবর্ষে সুগন্ধি দ্রব্য ও বস্ত্রালঙ্কারাদির জন্য রোমকে ১০ কোটী সেস্তারতাই অর্থাৎ প্রায় ১৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। রোম সম্রাট নিরোর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত রোমে ভারতজাত দ্রব্যের ব্যবহারাধিক্য ও সমাদর বিদ্যমান ছিল।

এই সময়ে এক বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার জন্য য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে যে সকল অর্ণবযান ভারতের

বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ য়ুরোপের দক্ষিণখণ্ডে লইয়া যাইত, তাহাদিগের তথায় পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিত। পথও বিপদ-সঙ্কুল ছিল। উপকূলের নিকট দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে যাইতে হইত। উপকূল-সন্নিহিত স্থানে জল-দস্যুর আক্রমণ হইতে অতি অল্পসংখ্যক পোতই রক্ষা পাইত। এই সময়ে ভারত-মহাসাগরে দুই প্রকার বায়ুর গতিবিধি নাবিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই বায়ু বৎসরের প্রথমার্দ্ধ অংশে পূর্ব্ব হইতে এবং অপরার্দ্ধ অংশে পশ্চিম হইতে বহিতে থাকে। মিশরের পোত-চালকগণই ইহা প্রথমে লক্ষ্য করে। কারণ, তাহারা ঘন ঘন মুক্ত-সমুদ্রে বাহির হইত, সুতরাং বায়ুর এই গতি-বৈচিত্র্য যে সর্ব্বপ্রথমে তাহারাই অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বায়ুর এই প্রবাহ-বৈচিত্র্যই মৈসুম বায়ু বা মনসুন (Monsoon) নামে কথিত। এই অত্যাবশ্যক আবিষ্ক্রিয়ার পর হইতেই ভারত ও য়ুরোপের মধ্যে পোত-পরিচালন-কার্য্য সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং বাণিজ্যের আদান-প্রদানও বর্দ্ধিত হইল। পোতসকল ৩০ দিনে ভারত হইতে মিশরে ও মিশর হইতে ভারতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। তখন-কার বাণিজ্য-পোত সকলের বিপদের অবধি ছিল না। জলদস্যুদিগের ভয়ে প্রত্যেক পোতেই একদল করিয়া ধনুকধারী নিযুক্ত রাখিতে হইত। দক্ষিণ-ভারতে যখন পাণ্ড্য রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে মিশরের বাণিজ্য-পোত-সমূহ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত। যে বন্দরে তাহাদের পোতসমূহ আসিয়া দাঁড়াইত, তাহার নাম বাকের। ইহা পাণ্ড্যরাজদিগের রাজধানী মাদুরা হইতে অল্প দূরে অবস্থিত ছিল। ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনা করিলে রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি মাদুরা ও কোইম্বাটোর জেলার নানাস্থানে বহু রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ভারতের এই অংশ হইতেই রোমে মসলা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, হস্তিদন্ত, সূক্ষ্ম মসলীন, মূল্য-বান প্রস্তর প্রভৃতি রপ্তানি হইত।

ভারতের রেশম এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদি রোমে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক রোমকই ইহা ব্যবহার করিত। এই সময়ে চীনদেশে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হইত। চীন দেশের রেশমও ভারতের বাণিজ্যদ্রব্যের সহিত রোমে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। রোমকেরা এই সকল রেশম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত

করিত এবং তাহা হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইত। উহা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তাহা পরিধান করিলে শরীরের গঠন ও বর্ণ পর্য্যন্ত অবিকল দেখা যাইত। সম্রাট সীজর প্রচুর পরিমাণে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রঙ্গালয়েও বহুল পরিমাণে রেশমী পরিচ্ছদাদি ব্যবহৃত হইত। রোমের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলাকুল অতি সূক্ষ্ম ও এইরূপ স্বচ্ছ রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ভালবাসিতেন, এমন কি এইরূপ পরিচ্ছদ-ব্যবহারই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই রীতি সুরুচি ও শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া রোমে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্লিনিও এই রীতির অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন।

এই সকল রেশমের মূল্যও রোমে অত্যন্ত অধিক ছিল। ১২ আউন্স স্বর্ণের বিনিময়ে এক পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের রেশম পাওয়া যাইত। ভারতজাত সুগন্ধি দ্রব্যাদিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। একমাত্র সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহারেই যে রোমের অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। এইরূপ অর্থব্যয় হেতু রোমক রাজপুরুষগণ ভারত-জাত সুগন্ধি দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্যে এই সকল বিক্রয় হইতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদের গৃহ, গৃহসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদে সুগন্ধি দ্রব্য মাখাইত। রঙ্গমঞ্চ এবং স্নানাগারসমূহ সুগন্ধি দ্রব্যে পূর্ণ করা হইত। সুগন্ধি ধূপ ইত্যাদি দগ্ধ করা হইত। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই ভারত হইতে প্রেরিত হইত এবং ভারতজাত দ্রব্যের আদরই সমধিক ছিল। ভারতের হীরক ও মুক্তার মর্য্যাদা রোমক মহিলাগণের নিকট অত্যন্ত অধিক ছিল। ভারতের হীরক ও মুক্তা পাইলে তাহারা একেবারে তাহা লইবার জন্য পাগলিনীর মত হইত।

রোমের সহিত যে ভারতের এই ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, সেই ভারত আজও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহার বাণিজ্য-দ্রব্যের সে গৌরব নাই, তাহার শিল্পজাত সামগ্রীর সে মর্য্যাদা নাই। আপন দেশজাত দ্রব্যের গৌরব ও মর্য্যাদা হারাইয়া ভারত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিধ্বনি ।

——:•:——

অর্চ্চনা—পৌষ, ১৩২০ ।

বঙ্গভাষার গৌরব ।

বঙ্গভাষাকে ইংরেজ-নবীশদের অবজ্ঞার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দেশে যে কয়জন মহাত্মা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম,—বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয়,—আশুতোষ। আর তৃতীয়,—রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম "আপন প্রবল-প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।" তাঁহার সুতীব্র কশাঘাতে এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সদুপদেশে অনেক ইংরেজ-নবীশেরই নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। অনেককেই তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মাতৃ-ভাষা কাজের ভাষা না হইতে পারে, কিন্তু ভাবের ভাষা বটে। ইহার দ্বারা পেট ভরিতে না পারে, কিন্তু যখন মানসিক ক্ষুধার তাড়নায় আহার খুঁজিতে হইবে, তখন এই ভাবের ভাষার শরণাপন্ন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে ও শাসনে অনেক শিক্ষিত লোকেই বাঙ্গালা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমের প্রতিভা পাঠক ও লেখক সৃষ্টি করিল বটে; কিন্তু তবুও বিস্তর বাকী পড়িয়া রহিল। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সখের হিসাবে লিখিতে পড়িতে লাগিলেন। সে সেবার মধ্যে ভক্তি বা প্রীতির লক্ষণ বা আকর্ষণ বিশেষ কিছু দেখা গেল না। বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত বাঙ্গালা বহির কোন সম্পর্ক ছিল না। ছেলেদের হাতে বাঙ্গালা বহি দেখিলে অভিভাবকের দল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন।

আশুতোষ দেখিলেন যে, "মাতৃসম-মাতৃভাষা" কথাটা পোড়া বাঙ্গালী বুঝে না। এ জাতিকে বঙ্গভাষা পড়াইতে হইলে উপদেশে হইবে না, মিষ্ট কথায় চলিবে না। কান ধরিয়া পড়াইতে পারিলে তবেই পড়িবে। তাই তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায়, তাঁহারই উদ্যমে বঙ্গভাষা আজি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভের অধিকার পাইয়াছে। যে কার্য্য করিতে বঙ্কিম, আনন্দমোহন ও গুরুদাসের চেষ্টা একদিন বিফল হইয়াছিল, সেই কার্য্যসাধনে পুরুষসিংহ আশুতোষের চেষ্টা আজি সফল হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও আমাদের তৃপ্তি হইল না। যে কাজে ইংরাজের 'বাহবা' নাই, সে কাজটাকে বড় বলিয়া—কর্ত্তব্য বলিয়া, বাঙ্গালী-স্বভাব কিছুতেই মানিতে চাহে না; কিন্তু আজি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালীর সে মোহ ঘুচিয়া গিয়াছে। মাতৃভাষার সেবা যে সম্মানের কার্য্য, ইহা এক্ষণে বুঝিতে শিখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভাবরাজ্য

জগন্নাথদেবের সার্ব্বজাতিক ভূমি। এখানে জাতিভেদ নাই। এখানে একদিক, আর এক-দিকের সহিত নিঃসঙ্কোচে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। ভাবের এই নূতন রপ্তানি দেখিয়া এখন কেবল আশা হইতেছে যে, বঙ্গের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিও এবারে ভাষান্তরিত হইয়া দেশ-বিদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতে পারিবে। মনে হইতেছে যে, বিদেশীয়গণ বঙ্গীয় কাব্য-সুধার রস আস্বাদন করিবার জন্য এবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে। বঙ্গভাষাকে তাহারা যতটা দীনহীনা মনে করিত, বঙ্গভাষা যে ততটা দীনহীনা নহে, এবারে তাহা বুঝিতে পারিবে। তাই মনে হয়, শুভক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলেন। শুভক্ষণে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গদর্শন,—পৌষ, ১৩২০।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

[ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টীয়-সংস্কার ও হিন্দুর পুনরুত্থান]

ইংরাজী শিখিয়া প্রথমে এ দেশের লোক খৃষ্টীয় মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের উপরে যে কঠোর আঘাত করিতে আরম্ভ করে, তাহার ফলে দেশের ইংরেজীনবিশেরা খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, এই আশঙ্কা এককালে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ সেই আশঙ্কা নিবারণ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রভাবকে প্রতিহত করিতে যাইয়াই, ব্রাহ্ম-সমাজকে বহুল পরিমাণে একদিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের এবং অন্যদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, না করিলে ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা এ কাজটী কখনই হইতে পারিত না। ভাষ্যকার শঙ্করকে যে অর্থে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন, সেই অর্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান্ বলা যাইতে পারে। যে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম-আচার্য্যগণ এ দেশে খৃষ্টীয় মতের প্রভাব প্রতিহত করেন, সেই যুক্তিবাদের ও ধর্ম্মনীতির আঘাতেই তাঁহারা আবার প্রাচীন এবং প্রচলিত হিন্দুসিদ্ধান্ত এবং হিন্দু সংস্কারকেও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। যে যুক্তিতে বাইবেলের প্রামাণ্য নষ্ট হইল, সেই যুক্তির সম্মুখে বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যও টিকিতে পারিল না। যে যুক্তিবলে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব নষ্ট হইল, সেই যুক্তির সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বও রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও নষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রাহ্মচিন্তা এবং ব্রাহ্মভাব দেশময় ছাইয়া পড়িল। কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই প্রভাব প্রতিহত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আর

পথে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টীয় প্রভাব প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, সেই পথে যাইয়াই এই নব্য হিন্দুত্বও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। যে অর্থে ভগবান্ ভাষ্যকারকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং দেবেন্দ্রনাথকে ও কেশবচন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান্ বলা যাইতে পারে, সেই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নব্য-হিন্দু-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম বলা অসঙ্গত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্বে" যে অনুশীলন-ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। আর যে ভিত্তির উপরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সনাতন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অপেক্ষা আধুনিক যুক্তিবাদের সম্বন্ধই বেশী ঘনিষ্ঠ। যে প্রণালীতে মেথু আর্ণল্ড এবং রেনী প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদিগণ যীশুখৃষ্টের জীবন ও চরিত্রকে খৃষ্টীয়ান্ কিম্বদন্তীর জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও মোটের উপরে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই, তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং "কৃষ্ণচরিত্র" যতটা পরিমাণে যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মনোমত হইয়াছে, সেই পরিমাণে কিছুতেই ভক্তিবাদী বৈষ্ণব-দিগের মনঃপূত হয় নাই; ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। ব্রাহ্মমতের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বের" এবং "কৃষ্ণচরিত্রের" যতটা মিল আছে, হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে ততটা মিল নাই। তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যা" সম্বন্ধেও মোটের উপর এই কথা বলিতে পারা যায়। তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় আধুনিক ইংরেজী শিক্ষালাভ না করিয়াও কতটা পরিমাণে যে ইংরেজীভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন, তাঁর "ধর্ম্মব্যাখ্যাই" ইহার প্রমাণ। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়-বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন শিক্ষা ও সাধনার আলোকে প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। আর তিনি কতটা পরিমাণে যে, আধুনিক যুক্তিবাদের এবং নব্য ব্রাহ্মভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, এ সকলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণেই হিন্দু পুনরুত্থানের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম বলা কিছুতেই অসঙ্গত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কোনও নিন্দার কথাও নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ যে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের শরীর-রক্ষকদিগকে সেই অস্ত্র সাধন করিয়াই এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অনুশোচনা।

সুখে যবে ছিনু ব'সে তোমারে ডাকিনি কভু;
বিপদে পড়িয়া পায়ে শরণ ল'য়েছি, প্রভু!
সুসময়ে অহঙ্কারে ভুলি দয়া বারে বারে
ডাকিয়াছি অসময়ে নিরাশ করনি তবু।

আড়ালে বসিয়া তুমি করায়েছ যত কাজ
যশঃটুকু নিজে ল'য়ে ফেলে রেখে দিছি লাজ;
সে লাজ তোমার কাছে সগৌরবে ফিরিয়াছে,
অপার করুণা দিয়া তাহারে ঢেকেছ, বিভু।

কেহ কহে দয়াময়—কেহ কহে দয়াহীন,
তুমি রহ অবিচল উদাসীন বদাসীন;
তুমি যা' করেছ দান করি কত অসম্মান,
নির্ব্বিকার তুমি দেব বিরাগে ফেরনি তবু।

প্রাণে তুমি দেছ, শান্তি, মনে তুমি দেছ বল,—
তবু তুচ্ছ কথা ল'য়ে করি মিছে কোলাহল,
সত্যরে হেরি না সত্য অহঙ্কারে আছি মত্ত
তোমারে ভুলেছি ব'লে আমারে ভোলনি, প্রভু।

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কথা ও কার্য্য।

প্রাবৃটে নীরবে মেঘ বর্ষে জলধার,
শরতে সলিলহীন শব্দমাত্র সার;
নীচের বচন সার কার্য্য নাহি করে,
সদা কর্ম্মে রত সাধু, বাক্য নাহি সরে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।

পুস্তক-পরিচয়।

পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর-প্রণীত। ঢাকা নয়াবাজার হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৷৹ বার আনা। পুস্তকখানি ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত।

ঢাকায় অধুনা যে কতিপয় নবীন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হইয়াছে, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর তাঁহাদের অন্যতম। ঢাকার পুরাতত্ত্বালোচনায় ইঁহারা যে ভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বস্তুতই প্রশংসনীয়। সমালোচ্য পুস্তকখানির সর্ব্বত্র আমরা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুশীলনের পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তকখানিতে বহু ঐতিহাসিক স্থানের চিত্রও আছে।

মৃত্যু-বিভীষিকা। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত। প্রকাশক,—পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৷৵৹ মাত্র।

গ্রন্থকার ডিটেক্‌টিভ পুস্তক-রচনায় সিদ্ধহস্ত। এ বিভাগে তাঁহার সুনাম বহুদিন পূর্ব্বেই বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থে তাঁহার সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ ত আছেই, বরং বাড়িয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মালঞ্চ। খণ্ডকাব্য। শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ-প্রণীত। চুঁচুড়া আলোচনা সমিতি হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৹ আট আনা।

'মালঞ্চে' পঁচিশটী কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই সদ্ভাবপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ভাষা ও ভাবের জটিলতা দেখিতে পাইলাম না। প্রায় সকল কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। রচনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানা না থাকিলেও কবিতাগুলি যে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার দাবী করিতে পারে, একথা নিঃসঙ্কোচে আমরা বলিব।

পরাজয়।

—ঃ(০)ঃ—

(১)

শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দত্ত ডাক্তারী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন। এত অল্পবয়সে ডাক্তারীতে এরূপ পশার-প্রতিপত্তি-লাভ সকল ডাক্তারের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুবোধচন্দ্র ত্রিশ বর্ষ বয়সেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও তাহার ফলস্বরূপ প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। কেবল দুর্গাপুরে কেন, আশপাশের পাঁচ সাতখানা গ্রামেও তাঁহার মত হাতযশওয়ালা ডাক্তার আর ছিল না।

কিন্তু সুবোধচন্দ্রের অর্জ্জিত অর্থরাশি ভোগ করিবার কেহ ছিল না। পত্নী যৌবনোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া চিতা-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাহার অত্যল্পকাল পরেই মাতাও পুত্রের স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরোলোকের পথিক হইয়াছিলেন! পিতা তো বহুদিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া গিয়াছেন! ভ্রাতা ভগিনী কেহই নাই! সুতরাং সুবোধচন্দ্রের সংসার পরিজনশূন্য। এক্ষণে তাঁহার পরিজনের মধ্যে একমাত্র কম্পাউণ্ডার উমাচরণ, আর একটা সাদা ঘোড়া।

উমাচরণ স্বগ্রামবাসী ও স্বজাতীয়। বাল্যে মাতৃপিতৃহীন হইয়া উমাচরণ ডাক্তারবাবুর নিকট আশ্রয় পায়। সুবোধচন্দ্র তাহাকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া আপনার ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। উমাচরণ এপর্য্যন্ত যত্নসহকারে সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। সে সুবোধচন্দ্রের গৃহস্থলী দেখে, তাহার হিসাব রাখে, কম্পাউণ্ডারী করে, প্রত্যহ ঘোড়ার দানা হিসাব করিয়া দেয়, আর তেড়ী কাটিয়া বেশভূষা

করিয়া মাঝে মাঝে দুই একজন বন্ধুর সহিত গ্রামের এদিক সেদিকে বেড়াইয়া আসে।

সুবোধচন্দ্র সারাদিন রোগী দেখিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান অবসরকালে উমাচরণের সহিত গল্প করেন, ঘোড়াকে একটু আদর দেখান, অথবা এনাটমি বা অস্থিবিদ্যার দুরূহতত্ত্বে মনোনিবেশ করেন।

সুবোধচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। কেন না তিনি স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ গম্ভীরপ্রকৃতি। লোকে ভাবিত, সেটা তাঁহার অহঙ্কার-সম্ভূত; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। তিনি এক চিকিৎসা বিদ্যা ছাড়া জগতের আর সকল তত্ত্বেই একপ্রকার উদাসীন ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। হাস্যালাপ বা আমোদ-প্রমোদও যে মনুষ্য-জীবনে সবিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার, ইহা তাঁহার মাথায় আসিত না।

তা ছাড়া সুবোধচন্দ্রের সহিত কাহারও মতের মিল হইত না। সুবোধ বলিতেন, "বিধবার বিবাহ দাও।" বন্ধুরা বলিত, "তাহা হইলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে।" তাঁহার মত—বিলাতফেরতদিগকে সমাজের ভিতর টানিয়া লও। সমাজ বলিত, "ইহাতে হিন্দুর হিন্দুয়ানী লোপ পাইবে, জাতিবিচার উঠিয়া যাইবে।" সুবোধ বলিতেন, "বাল্য বিবাহ দিও না।" সমাজ বলিত, "তাহা হইলে শেষে কোর্টশিপ প্রথা চলিবে; ছুরিছোরাও যে না চলিবে এরূপ নয়।"

মতের মিল না হইলেও অনেকে সুবোধচন্দ্রকে ভালবাসিত। সুবোধ-চন্দ্র দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। রোগীর আর্থিক অবস্থা দেখিয়া তিনি দর্শনীর ব্যবস্থা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার পকেটের টাকাও রোগীর পকেটে যাইত।

সুবোধচন্দ্র আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় গুণবান্ পাত্র ইচ্ছা করিলে ইহার মধ্যে অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে ভীষণ দায় হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অনুরোধ করিবারও তেমন কেহ নাই। কোন কোন বন্ধু দুই একবার অনুরোধ করিয়াছিল। সুবোধচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন, "যে দিন ইচ্ছা হইবে, সেই দিনই বিবাহ করিব। এত তাড়াতাড়ি কেন?"

লোকে ভাবিয়াছিল, ডাক্তারবাবু বিধবা বিবাহ করিবেন। সমাজ পতিরা বলিয়াছিলেন, 'তাহা হইলে উহার ডাক্তারখানায় আগুন ধরাইয়া দিব।' কথা সুবোধচন্দ্রের কানে আসিয়াছিল, শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

বাস্তবিক সুবোধচন্দ্রের আন্তরিক অভিপ্রায় এইরূপই ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন পত্নীহীন হইয়া যদি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হয়, তবে পতিহীনারই পাণিগ্রহণ করিব। নতুবা বিবাহ করিব না কিন্তু বিধবা বিবাহে বাধা অনেক। ভাবিয়া চিন্তিয়া সুবোধচন্দ্র চুপ করিয়াছিলেন! স্থির করিয়াছিলেন, বিবাহই করিব না। কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁহার এই স্থির সঙ্কল্পকে বিচলিত করিয়া দিল। কিরূপে করিল তাহা পরে বলিতেছি।

(২)

জ্যৈষ্ঠের শেষ অপরাহ্ণ। কিছু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আকাশ নির্ম্মেঘ, নির্ম্মল; অস্তগমনোন্মুখ রবির রক্ত কিরণজাল সে নীল সমুদ্রে সাঁতার দিতেছিল; বর্ষণসিক্ত শ্যাম বৃক্ষপত্রে পড়িয়া হাসিতেছিল, নাচিতেছিল; ধীর বায়ু বনফুলের গন্ধের সহিত সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ মাখিয়া পল্লীপথ আমোদিত করিতেছিল, সমুচ্চ অর্জ্জুন বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়া শ্যামা, দহিয়াল মধুর স্বরতরঙ্গে গোধূলির আকাশ প্লাবিত করিতেছিল। সুবোধচন্দ্র অশ্বারোহণে বামুনগাছির পল্লীপথ ধরিয়া দুর্গাপুরের দিকে ফিরিতেছিলেন। অশ্ব ধীর 'কদমে' চলিতেছিল।

সহসা অশ্বের গতিরোধ হইল। পথপার্শ্বস্থ বনান্তরাল হইতে সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায় এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরী বাহির হইয়া অশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইল। পশ্চিমাকাশের সুবর্ণচ্ছটা আসিয়া কিশোরীর গৌর মুখমণ্ডল আলোকিত করিল। সুবোধচন্দ্র সে মুখের দিকে একবার চাহিলেন; চাহিয়া সেই সুবর্ণকিরণপ্লাবিত গোধূলির নীলাকাশতলে যে অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলেন, তাহা আর ভুলিতে পারিলেন না।

কিশোরী কথা কহিল, সে স্বর সপ্তস্বরার মূর্চ্ছনার ন্যায় সুবোধচন্দ্রের-

শ্রবণে সুধার ধারা ঢালিয়া দিল। কিশোরী বলিল, "আপনি কি ডাক্তার বাবু ?"

সুবোধচন্দ্র আত্মসংযম করিয়া বলিলেন. "হাঁ, তোমার কি দরকার ?"

কিশোরী। আমার মার বড় শক্ত ব্যারাম।

সুবোধ। কোথায় তোমাদের বাড়ী ?

কিশোরী চম্পকাঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ওখানে।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন. "চল।"

কিশোরী মাটীর দিকে মুখ নামাইয়া বলিল, "আমরা কিন্তু আপনার ভিজিট দিতে পারব না।"

সুবোধ। কেন ?

কিশোরী। আমরা বড় গরীব।

কিশোরীর মুখ যেন আরও নত হইয়া পড়িল; স্বরের ভিতর যেন কত অশ্রু সঞ্চিত হইয়াছিল। সুবোধচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে তখন দেখা যাবে, এখন পথ দেখাও।"

কিশোরী ধীরপদে আগে আগে চলিল, সুবোধচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

একখানি ভাঙ্গা বাড়ী; বাড়ীতে একখানি অর্দ্ধভগ্ন গৃহ। সেই গৃহে ছিন্ন মলিন শয্যায় এক অস্থিকঙ্কালসার বিধবা শায়িতা। কিশোরী তাহার কাছে গিয়া কলিল. "মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

ক্ষীণকণ্ঠে বিধবা বলিলেন, "আঃ পাগলী আমার জন্যে আবার ডাক্তার কেন ?"

ততক্ষণ সুবোধচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিধবা কষ্টে মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "কুমু" ডাক্তার বাবুকে আসন দে।"

মেয়ের নাম কুমুদবালা। কুমুদ একখানি ছেঁড়া আসন পাতিয়া দিল। সুবোধ তাহাতে বসিয়া রোগীর রোগপরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পরীক্ষা-শেষে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বিধবা ক্ষীণস্বরে বলিলেন,

"ডাক্তারবাবু, আমার পাগলী মেয়ে না বুঝে আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়েছে। কিছু মনে করবেন না, আমি ওষুধ খাব না।"

বিস্মিত ভাবে সুবোধ বলিলেন, "সেকি, ব্যারাম হয়েছে ওষুধ খাবেন না?"

বি। না, আমার এখন ওষুধ খাবার সময় নয়। তা ছাড়া—

সু। তা ছাড়া কি?

বি। ওষুধপত্র কিনিবার পয়সাও আমার নাই।

সু। ওষুধের দাম আপনাকে দিতে হবে না।

বিধবার কোটর-প্রবিষ্ট নেত্রদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সুবোধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আর কে আছে?"

বিধবা অঞ্চলপ্রান্তে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "ঐ মেয়ে ছাড়া চারকুলে আর কেউ নাই।"

সু। মেয়েটী বোধ হয় বিবাহিতা?

কথাটা বলিতে যেন মুখে বাধিয়া যাইতে লাগিল। বিধবা বলিলেন, "এখনও বিয়ে হয় নি।"

সুবোধের বুকটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল, বলিলেন, "এখনও বিয়ে হয় নি? কেন?"

কুমুদ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। বিধবা বলিলেন, "গরীবের মেয়েকে বিনা পয়সায় কে ঘরে নেবে?"

বিধবাকে ঔষধ খাইতে স্বীকৃত করিয়া এবং অচিরাৎ ঔষধ পাঠাইয়া দিবার আশ্বাস দিয়া সুবোধচন্দ্র সে দিন চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, কায়স্থ, স্বজাতি, সুন্দরী—অপূর্ব্ব সুন্দরী, গরীব বলে বিয়ে হয় না; দূর হউক যখন বিবাহ করিব না, তখন এসকল ভাবনায় কাজ কি? কিন্তু কুমুদ বড় সুন্দরী!

কয়েক দিন ধরিয়া যাতায়াত করিয়া, ঔষধ ও পথ্য যোগাইয়া সুবোধচন্দ্র প্রাণপণে বিধবার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহার কালের ডাক পড়িয়াছে, তাহাকে কে ধরিয়া রাখিবে? প্রায় এক পক্ষকাল পরে বিধবা, কন্যার কোলে মাথা রাখিয়া গঙ্গোদক পান করিতে করিতে অনন্তের পথে

যাত্রা করিলেন। তিনি ডাক্তারের ঋণ রাখিয়া গেলেন না; যাইবার পূর্ব্বে ডাক্তারের পারিশ্রমিকস্বরূপ কন্যারত্নকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিয়া গেলেন।

নববধূর আগমনে সুবোধচন্দ্রের অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত হইল। সমাজপতিরা আপাততঃ বিধবা-বিবাহের অপ্রিয় সমলোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এরূপে বিনা 'যৌতুকে' বিবাহ করায় গ্রামের বুদ্ধিমান্ লোকেরা সুবোধচন্দ্রের অনেকে নিন্দা করিল, আর নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহার প্রশংসা করিল।

(৩)

চিরদরিদ্রা কুমুদবালা যখন রাজরাণীরূপে সুবোধচন্দ্রের অট্টালিকার অধিকারিণী হইল, তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না! কিন্তু তাহার সেই আনন্দের সহিত একটু গর্ব্বও মিশ্রিত ছিল। সে গর্ব্ব আপনার সৌন্দর্য্যের। এই সৌন্দর্য্যই ত বিবাহ-বিমুখ সুবোধচন্দ্রের হৃদয়ে বিবাহের লালসা জাগাইয়া দিয়াছিল! সুতরাং সে গর্ব্বিতা না হইবে কেন? রূপের ফাঁদে পুরুষ-মাতঙ্গকে বাঁধিতে পারিলে কোন্ রূপবতী ভামিনী গর্ব্ব অনুভব না করে!

সুবোধচন্দ্র কুমুদিনীর সুখস্বচ্ছন্দতার সকল বন্দোবস্তই করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কিছুই করিতে পারিলেন না, উমাচরণই গৃহস্থালীর সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করিল। ইহা সম্পন্ন করিতে উমাচরণের কয়দিন বড় কাজের ভিড় পড়িয়া গেল। প্রভুপত্নীর মনের মত করিয়া ঘর সাজাইতে. নূতন দাস-দাসী নিযুক্ত করিতে, তাহাদিগকে ভাল করিয়া কাজ শিখাইতে সে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কুমুদিনী দেখিল উমাচরণ বড় কাজের লোক, যেমন চতুর, তেমনই কথাবার্ত্তায় সুনিপুণ। সে যদি না থাকিত, তাহা হইলে কুমুদ এই নূতন ঘরে আসিয়া যে কি করিত, কি হইত, বলা যায় না।

তা ছাড়া উমাচরণের দ্বারা কুমুদের আর এক ভয়ানক অভাব পূর্ণ হইল। সুবোধচন্দ্র দিবারাত্রের অধিকাংশ সময়ই বাহিরে রোগী দেখিয়া বেড়ান, এ অবস্থায় কুমুদের সঙ্গীহীন সময়টা অসহ্য হইয়া উঠিত। দাসী আছে বটে. কিন্তু কোন্ সম্ভ্রান্ত রমণী ইতর-জাতীয়া দাসীর সহিত গল্প করিয়া সময়

কাটাইতে পারে? কুমুদও পারিত না; ছিঃ দাসীর সঙ্গে গল্প! এই সময়ে উমাচরণ আসিয়া তাহার সঙ্গীর অভাব পূর্ণ করিয়া দিত। সে প্রভুর অনুপস্থিতিকালে হাস্যালাপপূর্ণ কথোপকথন দ্বারা প্রভুপত্নীর মনস্তুষ্টি সাধন করিত। কুমুদ তাহাকে লজ্জা করিত না. সুবোধচন্দ্রেরও এবিষয়ে নিষেধ ছিল। উমাচরণ ঘরের ছেলে; ঘরের ছেলেকে দেখিয়া আবার লজ্জা কি!

এইরূপে সুখে দুঃখে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। দুঃখে—কেন না, কুমুদ ঐশ্বর্য্য সুখে সুখিনী হইলেও আপনাকে স্বামিসুখবঞ্চিতা বলিয়া মনে করিত। সে এতদিনের মধ্যে একদিনও গম্ভীরপ্রকৃতি সুবোধচন্দ্রের মুখে ভালবাসার একটা কথাও শুনে নাই, তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ের একটুকু উচ্ছ্বাসও দেখিতে পায় নাই। ইহাতে গর্ব্বিতা কুমুদের গর্ব্বে আঘাত লাগিত; ভাবিত আমি দরিদ্র বলিয়া আমাকে দয়া করিয়া যে বিবাহ করিয়াছে, সে আমায় ভালবাসিবে কেন?

স্বামীর ভালবাসার অভাবের আরও অনেক প্রমাণ কুমুদ পাইয়াছিল। কোন দিন রাত্রিকালে সুবোধের ডাক আসিল। তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন। কুমুদ বলিল, "আজ আর তুমি যেতে পাবে না।"

সুবোধ বলিলেন, "তাও কি হয়? রোগীর প্রাণ আমার হাতে; না গেলে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা হবে।"

কুমুদ মুখ ভার করিত; সুবোধচন্দ্র সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেলেন।

কোনদিন কুমুদ বলিল, "বুড়ী রাঁধুনীটাকে তাড়িয়ে দাও, আমি একটা ভাল রাঁধুনী আনব।"

সুবোধ বলিলেন, "ও অনেক দিন এখানে আছে; এখন ছাড়িয়ে দিলে খাবে কি? যাবে কোথায়?"

এইরূপ শতসহস্র প্রমাণ কুমুদের হস্তগত। সুতরাং তাহার স্থির বিশ্বাস যে, স্বামী তাহাকে ভালবাসে না। এইরূপ বিশ্বাসের ফল এই হইল যে, সেও স্বামীকে ভালবাসিতে পারিল না। শেষে এমন দাঁড়াইল, কুমুদ স্বামীর সান্নিধ্য অপেক্ষা উমাচরণের সহিত গল্প করিবার জন্য অধিক আগ্রহান্বিত হইত।

আমি যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে কি না, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, আপনার মনের নিকটেই ইহার নিশ্চিন্ত উত্তর পাওয়া যায়। সুবোধচন্দ্রও মনের নিকট প্রায়ই এইরূপ উত্তর পাইতেন, কিন্তু তাহাতে তিনি ততটা দুঃখ অনুভব করিতেন না। তিনি ভাবিতেন, কুমুদ স্বেচ্ছায় আমাকে বিবাহ করে নাই, আমিই স্বেচ্ছায় তাহাকে বিবাহ করিয়াছি। আমার রূপ তাহার রূপের নিকট কিছুই নহে। এ অবস্থায় কুমুদ আমাকে ভালবাসিতে পারে না। নাই বাসুক, ক্ষতি কি, আমি তো তাহাকে ভালবাসিয়া সুখী।"

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতেন, "আমার সুখে কুমুদের সুখ কি? আমি নিজে সুখী হইলাম, তাহাকে তো সুখী করিতে পারিলাম না? কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর উপায় নাই। এখন আমি প্রাণ দিলেও যদি কুমুদ সুখী হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত।"

হায় হতভাগিনী কুমুদ!

(৪)

লালসা-পরায়ণ যুবকের সহিত লালসা-পরায়ণা যুবতীর সাহচর্য্যের কথা যেরূপ দাঁড়াইতে পারে, এক্ষেত্রেও তাহাই দাঁড়াইল। ক্রমে উভয়ের মন উভয়ের না হউক, কুমুদের মন উমাচরণের উপর সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইয়া পড়িল। কুমুদ ভাবিল, ইহাতে আর দোষ কি? আমি তো আর পাপের পথে পদার্পণ করছি না। কেবল ভালবাসায়—বন্ধুত্বের ভালবাসায় দোষ কি? দোষ কি তাহা কুমুদ ক্রমে বুঝিতে পারিল, কিন্তু তখন আর ফিরিবার সামর্থ্য নাই; সামর্থ্য থাকিলেও ততটা ইচ্ছাও বুঝি ছিল না। কুমুদ ভাবিল, যে ইহকালের সুখে বঞ্চিত, তাহার আর পরকালের সুখের আশা কেন? দাবানলে দগ্ধ দেহের পক্ষে সুশীতল জলাশয়ের আর কি উপকারিতা, কি শোভনীয়তা আছে?

উমাচরণ? উমাচরণ যখন বুঝিল যে, কুমুদবিহঙ্গী তাহার অনুরাগ-ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন সে মনে মনে বেশ একটু আনন্দগর্ব্ব অনুভব করিল। একবার ভাবিয়াছিল, কাজটা বোধ হয় ভাল হইতেছে না; কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ কি? সে তো ইচ্ছা করিয়া কুমুদকে মজায় নাই,

কুমুদ আপনিই মজিয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথাটা উমাচরণের অভিধানে লিখে না। তবে কেন নিজেও কুমুদের রূপের ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহা ভাবিয়া দেখিত না।

সুবোধচন্দ্রের নিকট এই অনুরাগ গোপন রহিল না। তিনি সমস্ত বুঝিলেন, বুঝিয়া হৃদয়ে আঘাত পাইলেন, কিন্তু সে আঘাতের বেদনা তাঁহার কথায় বা আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল না।

সুবোধচন্দ্র একদিন প্রভাতে উমাচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "কয়েকটা বিশেষ দরকারী ঔষধের আর একখানা ডাক্তারী কেতাবের প্রয়োজন। তুমি নিজে কলিকাতায় গিয়ে নিয়ে এস। এই মুহূর্ত্তেই যাও, নতুবা ৮টার ষ্টিমার ধরতে পারবে না।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধচন্দ্র টাকা ও ঔষধের ফর্দ্দ উমাচরণের হাতে দিলেন। ডাক্তারখানাতেই উমাচরণের কাপড়-চোপড় থাকিত। উমাচরণ কাপড় ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল। যাইবার সময় সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "কাল সকালের ষ্টীমারেই ফিরিও, দেরী করিও না।"

উমাচরণের কলিকাতা যাওয়ার কথা সুবোধচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ জানিলেন না।

সমস্ত দিন উমাচরণকে না দেখিয়া কুমুদ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। চাকরকে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। চাকরাণী কিছুই জানে না। সে দিন রাত্রিটা কুমুদ বড় অস্থিরভাবে কাটাইল। রাত্রেতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিল, কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল, উমাচরণের কোন সংবাদ নাই। কুমুদ আর থাকিতে পারিল না, সুবোধচন্দ্র মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য বাটীর ভিতর আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। সুবোধচন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ম্লান গম্ভীরবদনে বলিলেন, "মারা গেছে।"

মারা গেছে! কুমুদের সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; অবসন্নভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মারা গেছে?"

সুবোধচন্দ্রের অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল; বলিলেন, "না, যায়া যায় নি, আমি তাকে জবাব দিয়েছি।"

কুমুদিনী একটা হাঁফ ছাড়িয়া, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, "কেন জবাব দিলে ?"

সু। কাজকর্ম্ম ভাল দেখ্‌ত না ব'লে। তুমি কি তাকে রাখ্‌তে চাও ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধচন্দ্র কুমুদের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কুমুদের মুখ লাল হইয়া উঠিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর অস্ফুটস্বরে কেবলমাত্র বলিল, "না।"

কুমুদ বেগে গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইল।

সুবোধচন্দ্র দাসীর নিকট শুনিলেন, শরীর অসুস্থ বলিয়া কুমুদ সেদিন কিছুই খায় নাই।

সন্ধ্যার পর যখন উমাচরণ ফিরিয়া আসিল, তখন কুমুদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার ম্লানমুখে আবার হাসি ফুটিল, কিন্তু স্বামীর এরূপ পরিহাসের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এক সপ্তাহ পরে সুবোধচন্দ্র একখানা উইল হাতে করিয়া ঘরে আসিলেন। কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কিসের কাগজ ?"

সু। উইল।

কু। কার উইল ?

সু। আমার নিজের।

কু। এত তাড়াতাড়ি উইল কেন ?

সু। জীবন-মৃত্যুর কথা কে জানে ?

সুবোধচন্দ্র বাক্সের মধ্যে উইল রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিলেন।

(৫)

উইল করিবার কয়েক দিন পরে সুবোধচন্দ্র জ্বরে পড়িলেন। জ্বর প্রথমে সামান্য ছিল, কিন্তু ক্রমে প্রবলভাব ধারণ করিল। উমাচরণ ডাক্তার আনিতে চাহিল, সুবোধচন্দ্র নিষেধ করিয়া নিজের ব্যবস্থামত ঔষধ খাইতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর না কমিয়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুবোধের অসুখ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। যন্ত্রণায় সুবোধ ছটফট করিতে লাগিলেন, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। উমাচরণ ছুটিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোন বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইয়াছে। তিনি সুবোধচন্দ্রকে সে কথা বলিলেন। শুনিয়া সুবোধ বহুকষ্টে বলিলেন যে, আজ দুই তিন ঘণ্টা আগে ডাক্তারখানায় ঔষধ খাইতে গিয়াছিলাম। তখন উমাচরণ ছিল না, নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাইয়াছি। জ্বরের প্রকোপে আমার মাথার ঠিক ছিল না, বোধ হয় ভুলিয়া আমি অনেকটা ষ্ট্রীক্‌নিয়া খাইয়া ফেলিয়াছি।

উমাচরণ ডাক্তারখানা খুলিয়া দেখিল, বাস্তবিকই ষ্ট্রীকনিয়ার শিশি অনেকটা খালি। নবাগত ডাক্তারবাবু শুনিয়া মাথায় হাত দিলেন। তিনি দুই চারিটা প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই সুবোধচন্দ্রের প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ু-সাগরে বিলীন হইয়া গেল।

অবশেষে উইল পড়া হইল। সে সময়ে গ্রামের দুই চারিজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, উমাচরণও ছিল ; কুমুদ দ্বারের অন্তরালে বসিয়াছিল। উইলে অন্যান্য কথার পর লিখিত হইয়াছিল,—

"আমি চিরদিনই বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ; কিন্তু আমি নিজে সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইবার অবসর পাই নাই। অতএব আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদবালা দাসী মনোনীত পাত্রে পুনরায় শাস্ত্রানুসারে আত্মদান করিতে পারিবেন। যদি তিনি পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি আমার নগদ ও ভূসম্পত্তি প্রভৃতি যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। নতুবা তিনি কেবল বার্ষিক এক হাজার টাকার ভূসম্পত্তি পাইবেন। অবশিষ্ট আমার দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।"

বিধবাবিবাহের নাম শুনিয়া ভদ্রলোকেরা নাক-মুখ সিট্‌কাইয়া চলিয়া গেলেন। কুমুদ বাহিরে আসিল। উমাচরণ হর্ষবিকম্পিত স্বরে বলিল, "তবে কুমুদ—" উমাচরণ কুমুদের হাত ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমুদ উইল হাতে

লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা বুঝেছি, কাল তার উত্তর পাবে।"

উমাচরণ কতকটা আশায়, কতকটা আনন্দে সে স্থান ত্যাগ করিল। সে দিন আর সে কুমুদের সাক্ষাৎ পাইল না।

পরদিন উমাচরণ যথাসময়ে কুমুদের নিকট উপস্থিত হইলে কুমুদ বলিল, "বল্‌তে পার, কোন্ কাজ কর্‌লে সাধারণের খুব উপকার হয়?"

উমাচরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি? তবে কি তুমি আর বিয়ে করবে না?"

কুমুদ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

উমা। কেন?

কুমুদ। আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমার স্বামী আমায় যে কতদূর ভালবাসতেন তা এখন বুঝেছি।

উমা। কিসে বুঝ্‌লে?

কুমুদ। তুমি কি মনে কর, তিনি আমাদের গুপ্ত অনুরাগের কথা জান্‌তে পারেন নি?

উমাচরণ মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "তা জানলেও জান্‌তে পারেন।"

কুমুদ। তুমি কি মনে কর, অত বড় বিচক্ষণ ডাক্তার হ'য়ে তিনি ভুলে ষ্ট্রীক্‌নিয়া খেয়েছেন?

উমা। তা বটে, তা বটে।

কুমুদ। শুন, তিনি সকলই জান্‌তে পেরেছিলেন; জেনে বুঝিয়াছিলেন, হয় তো তোমার সঙ্গে মিলন হ'লে আমি সুখী হব। তাই তিনি বধবা বিবাহের বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছেন।

উমাচরণ শিহরিয়া উঠিল। কুমুদ তাহাকে বিদায় দিল, আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

স্বামীর অর্থে কুমুদ গ্রামের মধ্যে এক দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিল। নিবৃত্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তির পরাজয় হইল।

সুবোধ নিবৃত্তি, কুমুদ প্রবৃত্তি।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যবন শব্দের ব্যুৎপত্তি।

সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানে যবন শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এই যবন শব্দের দ্বারা কোন্ জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েক স্থান হইতে এই যবন শব্দ উদ্ধৃত করিয়া তাহার দ্বারা কোন্ জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহার পর য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামত উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিব। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতের বহুস্থানে যবন শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। আদিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধকালে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ কর্তৃক বশিষ্ঠের নন্দিনী বলপূর্ব্বক গৃহীত হইলে, নন্দিনী যবনদিগকে উদ্ভূত করিয়া শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন ; যথা—

অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্ দ্রবিড়াঞ্ছকান্

যোনি দেশাচ্চ যবনান্ স কৃতঃ শবরান্ বহুনাঃ (১)

নন্দিনীর যোনিদেশ হইতে যবন জাতির উৎপত্তি। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব এই যবনজাতির যুদ্ধকৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। (২) এই জাতি যবন-দেশোদ্ভব বলিয়া ইহাদিগকে যবন নামে অভিহিত করা হয়, মহাভারতে এই ভাবের কথাও দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—

যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।

দ্রুথোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ (৩)

কর্ণপর্ব্বে যবন জাতিকে অসভ্য জাতিসমূহের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মৎস্য পুরাণে যবন-দেশের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহাকে বর্ব্বর বা অসভ্য জাতির আবাসভূমি বলিয়াই মনে হয় ; যথা,—

১। আদিপর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায়॥

২। তথা যবন-কাম্বোজা মথুরামভিতশ্চযে।
এতে নিযুক্ত কুশলা দক্ষিণাত্যাসিপাণয়ঃ॥

৩। ১।৮৫।৮৪।

তান্ দেশান্ প্লাবয়তি স্ম ম্লেচ্ছা প্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ।
স শৈলান্ কুকুরান্ রৌধ্রান্ বর্ব্বরান্ খসান্॥ (৪)

রামায়ণ-পাঠেও বুঝিতে পারা যায় যে, এই যবন প্রভৃতি দেশ হিমালয়ের সন্নিহিত উত্তর দেশে বিদ্যমান ছিল। (৬) মহাভারতের মতে নকুল সমগ্র পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে শাসক শক্তি বিস্তার পূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভস্থ দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব ও যবন প্রভৃতি জাতিকে স্ববশে আনিয়াছিলেন।(৭) মহাভারতের দিগ্বিজয়-প্রকরণের এই অধ্যায় পাঠ করিলে, যবনদিগকে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন সুদূর দেশবাসী বলিয়া মনে হয় (৮)

মনুসংহিতার বহুস্থানে যবন শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যবন কাহারা এই প্রশ্ন সমাধানোপযোগী কোন শ্লোকই পাওয়া যায় না। মনুর একস্থানে লিখিত আছে যে, সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়া যে সকল জাতি অধঃপতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যবনজাতি অন্যতম। (৯) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আবার কোন কোন স্থলে ইহাদিগকে ব্রাত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (১০) ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে যবনদিগকে দস্যু ও ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (১১)

বিষ্ণুপুরাণের মতে যবনদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (১২) ভারতের সন্নিহিত এই যবন জাতিগণ মধ্যে মধ্যে ভারতের নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন এবং কখনও বা ভারতের অংশবিশেষের উপরও আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতেন, এরূপ ভাবের কথাও কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ পদ্ম-

---

৪। মৎস্যপুরাণ ১২০।৪৩। ৫। যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ—বালকাণ্ড, ৫৫ সর্গ, ৫ম শ্লোক। ৬। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৩ সর্গ—১-১৩ শ্লোক। ৭। সভাপর্ব্ব ৩২ অধ্যায়। ৮। বিশ্বকোষ ১৫শ ভাগ ৬৩৩ পৃষ্ঠা। ৯। মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়, ৪৩।৪৪ শ্লোক। ১০। Elsewhere they are called Vratyas or mulattoes—Indio-Aryans Vol. II. P 178.

১১। Hang's Aitareya Brahmana.

১২। Wilson's Vishnu Puran II. 37.

পুরাণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সগর রাজার পুত্র বাহু, হৈহয়, যবন প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির দ্বারা হৃতরাজ্য হইয়া বন গমন করেন। (১৩) পরে সগর রাজার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, যবনদিগকে পরাজিত, তাহাদের মস্তক-মুণ্ডন ও ধর্ম্মচ্যুত করেন। (১৪)

ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত ব্যাকরণ, কাব্যে ও স্মৃতিগ্রন্থেও যবন শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। পাণিনি কাম্বোজ ও যবনদিগকে এক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে যবনানী লিপি পঞ্জাবে প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একটি সূত্রের ভাষ্যে যবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (১৫) অমরকোষে যবনাশ্ব নামক এক জাতীয় অশ্বের উল্লেখ আছে। অনেকে ইহাকে যবন-দেশীয় অশ্ব বলিয়া মনে করেন। (১৬)

বহু কাব্যগ্রন্থে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধে এইবার কয়েকটী উদাহরণ দিব। মালবিকাগ্নিমিত্রে লিখিত আছে যে, রাজা অগ্নিমিত্র একশত পুত্র পরিবৃত হইয়া, কুমার বসুমিত্রকে রক্ষা করিয়া যজ্ঞীয় অশ্বকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিলে, যজ্ঞীয় তুরঙ্গ নানাদেশ পর্য্যটনের পর সিন্ধুনদের দক্ষিণ কূলে অশ্বসেনাসমাবৃত এক যবন কর্তৃক ধৃত হয়। অনন্তর উভয় সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। (১৭) রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় রঘুবংশে যবন সৈন্যের বীরত্বের

১৩। স্বর্গখণ্ড—১৫শ অধ্যায়।

১৪। সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কম্বোজানাং তথৈবচ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবা শ্মশ্রুধারিণঃ
নিঃস্বাধ্যায়বষটকারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

(হরিবংশ ১৪ অধ্যায়)

১৫। পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে লঙ বক্তব্যঃ। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্ যবনাঃ মাধ্যমিকান্।

১৬। বিশ্বকোষ ১৫শ ভাগ ৬৩২ পৃষ্ঠা।

১৭। রাজা (উপবিশ্য বাচয়তি) স্বস্তি, যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্প-মিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎপরিষজ্যানুদর্শয়তি। বিদিত-

কথা দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুবংশে যবন শব্দের দ্বারা পারসিক জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে. যথা,—

পারসীকাং স্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়খ্যানিব বিলুপ্তত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনী মুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
কালাতপমিব বাব্জানাম কলি-জলদোদয়ঃ॥ (১৮)

দশকুমার-চরিতে একস্থলে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। মিথিলায় জনৈক নৃপতি একজন যবন ব্যবসায়ীকে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ঠকাইয়া লইয়াছিলেন এইরূপ এক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। (১৯) শকুন্তলার দুষ্মন্তের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত যবনীর উল্লেখ আছে। (২০) এই যবনী-শব্দের দ্বারা পারসিক রমণীকে বুঝাইতেছে। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে বনপুষ্পমালা-ধারিণী যবনা প্রতিহারিণীর উল্লেখ আছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় যে, যবনগণ হিন্দু অধিবাসিবৃন্দের সহিত একত্র বসবাস করিত।

স্মৃত্যাদি গ্রন্থেও যবন শব্দের উল্লেখ ও তাহাদিগের কদাচারের কথা দেখা যায়। মনু যবনদিগকে ম্লেচ্ছ ও দস্যু বলিয়াছেন। (২১) বৌধায়নের স্মৃতিতে ধর্ম্মাচারহীন গোমাংসখাদক জাতিমাত্রকে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (২২) বৃদ্ধ চাণক্যে যবনদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট

মস্ত্য যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতং পরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য ব্যৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তু রঙ্গমো বিসর্জ্জিতঃ। স সিন্ধোর্দ্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্ম্মহাসীৎ সংমর্দঃ॥ পঞ্চম অঙ্ক ১১৮

১৮। রঘুবংশ ৪।৬০।৬৯। ১৯। দশকুমারচরিত তৃতীয় অধ্যায়।

২০। ২য় সর্গ ৩৫ শ্লোক।

২১। পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনা কিরাতা দরদা খশাঃ॥
মুখবাহুরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছা বাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ (১০।৪৪ ৪৫)

২২। গোমাংস খাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥ (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত বৌধায়ন বচন)

জাতি বলা হইয়াছে, ইহারা অস্পৃশ্য। (২৩) কিন্তু বৃহৎ সংহিতায় আবার যবনদিগকে ঋষিগণের ন্যায় পূজ্য বলা হইয়াছে। (২৪) কেন না তাহারা শাস্ত্রবিৎ। এই কারণে অনেকে অনুমান করেন যে, যবনগণ কোন বিশেষ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত তিথিতত্ত্বেও যবন শব্দের উল্লেখ আছে। (২৫)

বরাহমিহির যবনাচার্য্য নামে একজন জ্যোতিষীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকের একটী শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, যবনেশ্বর স্ফূর্জ্জিধ্বজ শককালের জন্য অন্য জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করেন।(২৬) আবার স্ফূর্জ্জিধ্বজের গ্রন্থেও "যবনাঃ উচুঃ" প্রয়োগ থাকায় অনুমান হয়, ইহার পূর্ব্বেও যবনজাতীয় জনৈক গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন। ডাক্তার কার্ণ (Dr. Kern) অনুমান করেন যে, যবনাচার্য্য জনৈক পারসিক গ্রন্থকার হইবেন।

এইরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার দ্বারা যবনগণের প্রকৃত পরিচয় নির্দ্ধারণ করিবার কোনই উপায় নাই। সুতরাং যবন শব্দের দ্বারা কোন্ জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার মীমাংসা না হওয়ায় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিয়া গিয়াছে। বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত যবন শব্দের দ্বারা গ্রীক জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই বিশ্বাসের মূলে সাধারণতঃ চারিটী যুক্তি দেখা যায়; যথা--

১। গ্রীক Ionia, পারশ্য জুনান, হিব্রুর জবন ও সংস্কৃত যবন শব্দের উচ্চারণের সাদৃশ্য থাকায় যবন শব্দের দ্বারা Ionia বা গ্রীকগণকেই বুঝাইয়া থাকে।

২৩। চাণ্ডালানাং সহস্রৈশ্চ সুরিভিস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ।
একোহি যবনঃ প্রোক্তো ন নীচো যবনাৎ পরঃ॥

২৪। ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতং।
ঋষিবৎ তোপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্ব্বেদবিদ্ দ্বিজঃ॥ (২।১৫)

২৫। জাতং দিনং দুষয়তে বশিষ্ঠশ্চাষ্টৌ চ গর্গো যবনো দশাহম্।
জন্মাখ্যমাসং কিল ভাগুরিশ্চ ব্রতে বিবাহে ক্ষুর কর্ণবেধে॥

২। একজন Ionia বা গ্রীক নরপতিকে পালি ভাষায় যোনা বা যবন বলা হইয়াছে।

৩। সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থে যবন-জাতক গ্রন্থকারগণের উল্লেখ আছে এবং গ্রীকগণ জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী থাকায় বুঝা যায় হিন্দুগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে যবনাচার্য্য বলায়, যবন শব্দের দ্বারা গ্রীকগণকেই বুঝাইয়া থাকে।

৪। গ্রীকগণের সহিত ভারতবাসীর বহুদিন ধরিয়া সংস্রব থাকায়, সম্ভবতঃ হিন্দুগণ তাহাদিগকেই যবন নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

আমরা এই যুক্তি-চতুষ্টয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে য়ুরোপীয় বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মতামত উদ্ধৃত করিব।

ডাক্তার কার্ণ (Dr. Kern) বলেন যে, যবন শব্দে নিঃসন্দেহ গ্রীক জাতিকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অপর কোন জাতিকে নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বৃথা। (২৭)

ডাক্তার স্মিথ (Dr. Smith) সাহেবও উক্ত মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, যবন ও Ionia এই শব্দের উচ্চারণ-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে কাহারই মতভেদ থাকিতে পারে না। (২৮) পাণিনীতে যবন-লিপির উল্লেখ দেখিয়া, বেবার সাহেব বলেন যে, ইহা দ্বারা গ্রীক-লিপিই বুঝাইয়া থাকে। (২৯) গোল্ডষ্টাকার (Goldstucker)

২৭। Yavans, however, never denotes an Arab as such, neither formerly nor now-a-days. It is never a name for a nation. The only nation Called Yavans were the Greeks.—Preface, Vrihat Sanhita p. 32.

২৮। There can be no doubt that Javan was regarded as the representation of the Greek race; the similarity of the name of that branch of the Hellenic family with which the Orientals were best acquainted. Dictionary of the Bible P. 936.

২৯। Ind. H IV P 88.

সাহেব বলেন যে, যে যবন-লিপি দ্বারা পারসিক লিপি বুঝাইতেছে।.(৩০) অধ্যাপক মোক্ষমুলার সাহেব বলেন যে, যবন শব্দ দ্বারা কেবল গ্রীক বা Ionian জাতি বুঝাইতে পারে না, সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা সেমেটিক জাতিগণকে বুঝায় (৩১) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, যবন শব্দ দ্বারা প্রথমে আরব প্রভৃতি জাতি ও পরে গ্রীক ও মুসলমানদিগকে বুঝাইতেছে। (৩২) মুয়র সাহেব বলেন যে যবন শব্দ দ্বারা ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত অসভ্য জাতিদিগকে বুঝাইত। শক, পহ্লব বা পারসিক ইহাদিগের অন্যতম। (৩৩) ল্যাসেন বলেন যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দারিয়স্ নামক জনৈক পারসিক রাজা সিন্ধুদেশ জয় করেন এবং এই সূত্রে পঞ্জাবে পারসিকগণ আসিয়া বাস করেন। যবন বলিতে প্রথমতঃ এই পারসিকগণকেই বুঝাইত। (৩৪) হণ্টার সাহেব বলেন, অশোক কর্ত্তৃক খোদিত গিরিলিপিতে আন্তিয়াকো বা আণ্টিয়াকস্ নামক গ্রীক্ নৃপতির দেখা যায়। (৩৫) ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, অশোকের সময় হইতে যবন শব্দের দ্বারা ব্যাকট্রিয়াস্থিত গ্রীকগণকে বুঝাইত। (৩৬)

৩০। It denotes the writing of the Persians, probably the Cunieform writing which was already known before the time of Darius and is peculiar enough in its appearance and different enough from the alphabet of the Hindus to explain the fact that its name called for the formation of a new word.—Manav Kalpa Sutra. Introduction, P 16.

৩১। Yavani Lipi most likely means that vareity of the Semetic alphabet which, previous to Alexander and previous to Panini, became the type of the Indian alphabet.—Ancient Sanskrit Literature p. 521.

৩২। Indo—Aryan, Vol II.

৩৩। Sanskrit Texts I 391, 398, 482. Ed. 1868.

৩৪। Indische Alterthumskunde I. 422. II. 112-113.

৩৫। Princep's Essays II 15-18.

৩৬। From the time of Asoka, therefore, 250 B. C. the word Yovana becomes distinctly individualised and may be

প্রবন্ধ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং আর অন্যান্য মত উদ্ধৃত করিয়া ফল নাই। অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিবেচনায় যবনশব্দের দ্বারা ভারতবর্ষে অবস্থিত গ্রীকগণকেই বুঝায়। তাঁহাদিগের যুক্তিতর্ক কতদূর নিরপেক্ষভাবে গ্রহণীয় তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের তৎকালীন ইতিহাস আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ঐতিহাসিক সঙ্কলন।

১। শের সাহ ও গোয়ালিনী।

মুঙ্গের বা সংস্কৃত মুদ্গলপুরী জেলায় সেখপুর পর্ব্বতে "গোয়ালিনী খন্দ" নামে একটি পার্ব্বত্য পথ আছে। পথটী সামান্য বটে; কিন্তু এই সামান্য পথের সহিত যে অসামান্য মাতৃত্বের, স্নেহের, আতিথ্যসৎকারের ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে, একবারও কেহ তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই সামান্য পথটী একদিন অজেয় বীর সেরশাহ এক দরিদ্রা গোয়ালিনীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং পথটি সামান্য হইলেও ইহা সেই অদ্বিতীয় বীরের চিরস্মরণীয় মহিমা-বিঘোষক। কিরূপে কোন অবস্থায় পতিত হইয়া সম্রাট্ শেরসাহ এই পার্ব্বতীয় পথটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার আগে আমরা একবার শেরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

শেরসাহের পূর্ব্ব নাম ফরিদ। যৌবনে এক মুষ্ট্যাঘাতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন বলিয়া সুলতান মহম্মদ তাঁহাকে শের খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তদনন্তর কনৌজের যুদ্ধে সম্রাট্ হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া

---

safely taken to mean Graco-Bactrian or some representiatives of the Asiatic Greek. Orissa Vol II, P. 212.

শের "সাহ" বা সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। শের সাহ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন না। সাসারমে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জায়গীর ছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শের সাহ কিন্তু এই সামান্য জায়গীরে আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার স্বদেশবাসী আফগানগণ তাঁহার যুদ্ধ-কৌশল, বল, বিক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মোগলের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করেন। শেরও নায়ক-পদ-লাভে অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইলেন এবং সমগ্র ভারতের রাজ-সিংহাসনে বসিবার দুরাশা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তিনি ভারতের অধীশ্বর হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, শেষে কনৌজের নিকটে সম্রাট্ হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মী শের সাহেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন।

শের সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইবার পর বিদ্রোহ-দমনার্থ একবার বঙ্গদেশে আগমন করেন। পথিমধ্যে মুঙ্গেরে প্রায় এক সপ্তাহের জন্য অবস্থান করেন। আমাদের আখ্যায়িকারও আলোচ্য বিষয়, এই তাঁহার মুঙ্গের অবস্থান। তিনি যখন মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন, তখন বৈশাখ মাস। নব বর্ষের মৃদুল সমীরণ তখন সুগন্ধি কুসুমের হৃদয়োন্মাদকারী গন্ধ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মঞ্জরিত চ্যুতশাখে কোকিলকুল মধুময় কূজন করিতেছিল, আর নব বর্ষের সাদর সম্ভাষণের জন্যই যেন প্রকৃত অভিনব চারুবেশে সজ্জিতা হইয়াছিলেন। সম্রাট্ বসন্ত ও গ্রীষ্মের এই শুভ সন্ধিক্ষণে মৃগয়া করিতে অভিলাষী হইলেন। অমনি সুবাদার মিয়া সুলেমান হস্তী, অশ্ব এবং মৃগয়োপযোগী দ্রব্যসমূহের যথাযথ বন্দোবস্ত করিলেন। সেখপুরার পাহাড় সম্রাটের মৃগয়া-স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্রাট্ আপন শিবির হইতে যাত্রাকালে এক বৃহদাকার হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হস্তীর সন্নিকটে সম্রাটের পরম স্নেহের পাত্র, প্রভুভক্ত একটি অশ্ব দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাট্ কোনদিনও তাঁহার প্রিয় অশ্বটীকে অবমাননা করিয়া অন্য পশুতে আরোহণ করেন নাই। আজ সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম-দর্শনে অশ্ব করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, সে স্বর সম্রাটের কর্ণ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি লম্ফ দিয়া হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চিরানুগৃহীত অশ্বে

আরোহণ করিয়া তীরবেগে অশ্ব চালনা করিলেন। একটি অনুচরও তাঁহার অনুগমন করিতে পারিল না। এদিকে সম্রাট্ ছদ্মবেশে—সিপাহীর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যাইতেছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া চিনিতে পারিল না।

মিয়া সুলতান প্রমুখ কর্ম্মচারিবর্গ সেখপুরা পাহাড়ে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলেন,—সম্রাট্ নাই; চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সম্রাট্কে পাওয়া গেল না। তখন সকলেই স্থির করিলেন, সম্রাট্ হয়ত দীনদুঃখী প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার মানসে অথবা স্বভাবের শোভা দেখিবার জন্য যাইয়া থাকিবেন। সত্য সত্যই সম্রাট্ শের সাহ তখন প্রান্তরে প্রান্তরে নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, কোন গ্রামাভ্যন্তরে যাইয়া কৃষাণদিগের স্তূপীকৃত শস্য দেখিতেছিলেন এবং কখনও বা মেষরক্ষকগণের নিকট গিয়া তাহাদের সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছিলেন। আবার কখনও বা "মহুয়া" বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া মহুয়া-পুষ্পচয়নে নিযুক্তা রমণিগণের সুখদুঃখের কাহিনী শুনিতেছিলেন। ধীরে ধীরে প্রাতঃকাল যে সম্রাটের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইতেছিল—মার্ত্তণ্ডের সুস্নিগ্ধ কিরণ যে এখন অনল বর্ষণ করিতেছিল এবং সুশীতল বসুন্ধরা যে মধ্যাহ্ন দিনকরের অগ্নিবর্ষণে অনলবৎ হইয়াছিল, এতক্ষণ সম্রাট্ শের সাহের তাহা আদৌ ধারণা ছিল না। এখন বলবতী তৃষ্ণার উদ্রেক হওয়ায় সম্রাট্ ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশে আর সেই তরুণ অরুণের সোনার মূর্ত্তি নাই, তাহা এখন অগ্নিপিণ্ড-বৎ মধ্যগগনে যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। কাননে আর পিককুলের "কুহূ" "কুহূ" ধ্বনি নাই, বায়সের কর্কশ কণ্ঠ এখন সেই মধুর ধ্বনির স্থান অধিকার করিয়াছে, আরও দেখিলেন দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে বিন্দুমাত্র সলিল নাই। অনন্যোপায় শের সাহ তখন অদূরবর্ত্তী কয়েকজন মেষরক্ষকের নিকট গিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিলেন। তাহারা কিন্তু একজন সিপাহীর অতর্কিত আগমনে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ শের তাহাদিগকে অভয় দেওয়ায় তন্মধ্যে একজন শেরকে সঙ্গে লইয়া একটী কূপের অভিমুখে চলিল এবং আর এক-

জন তাঁহার অশ্বটীকে ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ চালাইতে লাগিল। পুষ্করিণীর পঙ্কিল সলিলে পঙ্কজিনী প্রস্ফুটিতা হয়। কূপটীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক অশ্বত্থ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া মহুয়া ফুল শুকাইতেছিল। যে বালকটী সম্রাট্‌কে কূপ প্রদর্শন করিতে লইয়া যাইতেছিল, সে সেই স্ত্রীলোকটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া শেরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল যে, এই লোকটী বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত। দয়াবতী রমণী অমনি সযত্নে কূপ হইতে জল তুলিয়া সম্রাট্‌কে দিল—সম্রাট্ তাহা পান করিয়া যেন নূতন জীবন পাইলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি সম্রাট্ সেই রমণীর পিত্তলনির্ম্মিত গাত্রাভরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রমণী গোপ-জাতীয়া। অনন্তর সেই সৌম্যমূর্ত্তি রমণীর আদেশে কয়েকজন কৃষক-পুত্র সম্রাটের অশ্বটীকে নবতৃণ-দল খাইতে দিল। অশ্বটী সানন্দে তাহা খাইতে লাগিল। পথশ্রান্ত অতিথিকে শুধু পানীয় জল দিয়াই গোয়ালিনী ক্ষান্ত হইলেন না। ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার একটি পয়স্বিনী গাভী দোহন করিয়া আপন কুঁড়ি হইতে ছোলা ও গুড় লইয়া কিংশুক-পত্রে তাহা স্থাপন করিয়া সম্রাট্‌কে খাইতে দিলেন। সম্রাট্ ততক্ষণ বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে সেই স্নেহময়ী রমণীর কার্য্য দেখিতেছিলেন, এখন সস্নেহে সেই সামান্য ভোজ্যদ্রব্য-গ্রহণে আহূত হওয়ায় পাছে সেই আতিথ্য গ্রহণ না করিলে মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করা হয়, এই বিবেচনায় অতীব আগ্রহের সহিত দিল্লীশ্বর সম্রাট্ শের সাহ সেই ছোলা ও গুড় আহার করিলেন। সম্রাটের আহার-সমাপ্তির পর দয়াময়ী রমণী মাটীতে একখানি কম্বল বিছাইয়া সম্রাট্‌কে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন, মাতৃবৎসল পুত্র যেরূপ বিনয়ের সহিত মাতার আদেশ পালন করে, এ ক্ষেত্রে সম্রাট্‌ও সেইরূপ করিলেন।

সম্রাট্‌কে আতিথ্যপ্রদর্শন করিয়াই যে রমণী স্থির হইল, তাহা নহে; সে একে একে পূর্ব্ববৎ স্নেহের সহিত আপন লোটায় জল তুলিয়া মহিষ-দিগকে স্নান করাইল। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে সম্রাট্ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং সূর্য্যদেব অস্ত যায় দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! তোমার স্নেহে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, তোমার আমি কি উপকার করিতে পারি বল?" সদাশয়া রমণী বলিল,

"আমি তোমার জন্য মাত্র এক লোটা জল তুলিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমি প্রতিদিনই করি।" কিন্তু সম্রাট্ শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে কিছু প্রার্থনা করিতে সম্মত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উভয়ে যখন উপরোক্ত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন সুবাদার মিয়া সুলেমান আসিয়া সম্রাট্‌কে সেলাম করিলেন। সুলেমানের পরিচ্ছদ-দর্শনে রমণী একেবারে ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। আর ছদ্মবেশে থাকা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া সম্রাট্ রমণীকে বলিলেন, "মা! আমি এই রাজ্যের বাদশাহ, বল আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?" বাদসাহের আদেশ অমান্য করিতে সাহস না হওয়ায় সেই রমণী ভয়-বিজড়িত স্বরে বলিল, "যদি আমাদের কিছু উপকার করিতে চান, তবে এই পর্ব্বত কাটিয়া আমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত একটী সরল রাস্তা কাটিয়া দিন, কেন না, এই পর্ব্বত ঘুরিয়া রোজ বাটী যাইতে আসিতে বড়ই কষ্ট পাই।"

কৃতজ্ঞ সম্রাট্ শের সাহ গোয়ালিনীর আশা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেইস্থানে একটি পার্ব্বত্য পথ নির্ম্মাণ করেন এবং সেই স্নেহশীলা গোয়ালিনীর নামানুসারে রাস্তাটীর নাম "গোয়ালী খন্দ" রাখেন। কত দিন হইল, সেই গোয়ালিনী নশ্বর ধাম ছাড়িয়া অবিনশ্বর ধামে গিয়াছে; কিন্তু গোয়ালীখন্দ অদ্যাপি তাহার মাতৃত্বের ভেরী সঘনে নিনাদ করিতেছে।*

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

২। প্রাচীন কলিকাতা।

(আরাইস-ই মহাফিল অবলম্বনে)

উর্দ্দু ভাষায় আরাইস-ই-মহাফিল নামে একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থ শের আলি সাফরি কর্ত্তৃক গবর্ণর জেনারেল বার্লোর শাসনকালে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। মেয়োর শাসনকালে ইহা মেজর হেন্‌রি কোর্ট কর্ত্তৃক (Mejor Henry Court) ইংরাজীভাষায়

* প্রসিদ্ধ East and West নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত "Sher Sah and Goalini" শীর্ষক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত—লেখক।

অনূদিত হইয়াছে। শের আলি বিভিন্ন পারসিক ও আরবী গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের সম্বন্ধে এক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থার একটী ভাস্বর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 'অর্ঘ্যে'র পাঠকগণের নিমিত্ত তাহা নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল।

কলিকাতা নগরী পূর্ব্বে একটী গ্রামমাত্র ছিল। এইস্থানে এক হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি আছে তাহার নাম কালী, বঙ্গভাষায় প্রভুকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে; এই 'কালী' এবং 'কর্ত্তা' উভয় শব্দ একত্র মিলিত হইয়া 'কালীকর্ত্তা' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ কালকাত্তা (বা কলিকাতা) শব্দের গঠন হইয়াছে। ইহার জনবহুলতা এবং এইস্থানে ইংরাজগণের প্রাসাদ, আড়ত প্রভৃতি স্থাপিত হইবার কারণ এই ঃ—

নবাব জাফর খাঁর শাসনকাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আড়তগুলি হুগলিতে অবস্থিত ছিল। একদিন সহসা মৃত্তিকা বসিয়া যাইতে লাগিল, সেই সময় ইংরাজগণ পানাহারে প্রবৃত্ত ছিলেন; তাঁহাদের প্রধান প্রধান লোক পড়িতে পড়িতে অতিকষ্টে পলায়ন করিলেন, কিন্তু গৃহের যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার এবং বহুসংখ্যক পশু গৃহের সহিত নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। কোনও কোনও ইংরাজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এই ঘটনার পর তাঁহাদের মধ্যে চার্ণক নামে এক ব্যক্তি চার্ণাসি উদ্যান ক্রয় করিলেন এবং বৃক্ষাদি কর্ত্তিত করিয়া এক আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল; গৃহের দেওয়াল নির্ম্মিত হইলে ছাদে কড়ি লাগান হইতে লাগিল। এই সময় এই স্থানের প্রধান প্রধান মোগলগণ আসিয়া ফৌজদার মীর নাসিরের নিকট অনুযোগ করিলেন,—"এই সকল বিদেশী লোক এরূপ উচ্চবাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলে আমাদের অন্তঃপুর দেখা যাইবে এবং ইজ্জতের হানি হইবে।" উল্লিখিত মর্ম্মে ফৌজদার এক আবেদনপত্র লিখিয়া মোগলগণকে নবাব জাফর খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন. তাঁহারা মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া নবাব বাহাদুরের নিকট আপনাদের আবেদন উপস্থিত করিলেন।

জাফর খাঁ তৎক্ষণাৎ ইংরাজগণকে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন। ফৌজদার সেই পত্র পাঠ করিয়া আদেশ করিলেন,—কোনও মিস্ত্রী যেন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে না যায় এবং তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

এই বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিশিষ্ট ইংরাজ ভদ্রলোকটী অতিশয় বিরক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য এবং একখানি মাত্র জাহাজ থাকায় তিনি দেখিলেন অগণিত মোগলসৈন্যের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি যুদ্ধ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং একখানি দর্পণ দ্বারা তীরবর্ত্তী গৃহসমূহ দগ্ধ করিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন। যদিও ফৌজদার তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল, ইংরাজের পোত নদী ছাড়িয়া সাগরে উপনীত হইল এবং দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সময় ঔরঙ্গজেব দক্ষিণদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার শত্রুগণ রসদ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল এবং রাজকীয় সেনাদলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। কর্ণাটস্থ ইংরাজ উপনিবেশের প্রধান ব্যক্তি একখানি জাহাজ শস্যপূর্ণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই উপকারে ও ইংরাজগণের রাজভক্তি-দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বস্তুতঃ সম্রাট্ ঈদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি এক ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচারিত করিয়া দিলেন ইংরাজগণ বিনাশুল্কে আবাস ভবনাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিবে।

এই ঘটনার পর চার্ণক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে পুনরায় বঙ্গদেশাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন এবং একজন অনুচর দ্বারা নবাবের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

অবশেষে সম্রাটের সম্মতিক্রমে চার্ণক একখানি মালঘর নির্ম্মাণ করিলেন এবং অতি সুন্দররূপে ব্যবসায়কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেই গুদামঘর এখনও বিরাজ করিতেছে, তাহা এক্ষণে "পুরাতন ঘর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ বলিতে কি, এই সহর আয়তনে খুব বৃহৎ, প্রশস্ত এবং ভাগীরথীর তীরভূমির

উপর সুন্দরভাবে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্যা দর্শনীয় বস্তু; এখানকার বাটীসকল চীন এবং ইস্পাহানের হর্ম্ম্যনিচয় হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। প্রাসাদরাজির নির্ম্মাণপদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রত্যেকটী বিভিন্ন আকারের। বাটীসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত, অধিকাংশই ইষ্টকের এবং রাজপথসমূহ প্রশস্ত ও সমতল। এই স্থানের আয়তন নন্দন কাননেরও ঈর্ষার উদ্রেক করে এবং স্নিগ্ধ মারুতহিল্লোল প্রভাতের বাসন্তী-পবনেরও গৌরব অবনত করে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজপথসকল সুন্দরী ললনাবৃন্দের গতায়াতে রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রত্যেক বিপণি বিভিন্ন দেশীয় দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ থাকে।

প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা এই নগরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য রাজকোষ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ব্যয় করিয়াছেন, ইহাই এই নগরীর ঋদ্ধিশ্রীর প্রধানতম কারণ।

বহুপূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থাৎ 'পূর্ব্বভারত-বণিক্-সমিতির' প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী ধনিগণ এবং শিল্পিগণ এইস্থানে বাস করিতেছেন। কলিকাতায় সর্ব্ববিধ সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখানকার প্রস্তুত রঞ্জিতবস্ত্রসমূহ বিশেষতঃ লোহিতরাগ রক্তবস্ত্র শীঘ্রই বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং অধিক দিন ব্যবহারযোগ্য থাকে না। মৃত্তিকার লবণাক্ততা, সিক্ততা এবং রসপ্রাচুর্য্য বশতঃ সরাপ-মিশ্রিত পানীয়—যেমন সরবৎ, খমির ও মোরব্বা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। এখানকার নিম্নতলস্থ কক্ষসমূহ আর্দ্র এবং বাসের অনুপযুক্ত। সহরের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ দীর্ঘিকার বা বৃষ্টির জল পান করিয়া থাকে; দুই একটা দীর্ঘিকা বিশিষ্ট নামে অভিহিত হয় যথাঃ—লালদীঘি, চৌরঙ্গী ইত্যাদি। এইস্থানের স্বাস্থ্য এক প্রকার মন্দ নয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। শীতকালেই স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অধিক ভাল থাকে। তবে এই প্রদেশে অর্শ, পাঁচড়া, দাউদ, আমাশয়, নাসিকার প্রদাহ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

সহরের আর্ম্মেনীয় পল্লীতে একটী বৃহৎ বাজার আছে; চীনাবাজারের

মধ্যভাগে আর্শ্মেনীয় গির্জ্জা। ইহা অতিশয় উচ্চ এবং বৃহৎ। কলিকাতায় সকল গির্জ্জা অপেক্ষা এই গির্জ্জা বৃহৎ। আর্শ্মেনীয়গণের অধিনায়ক আগানাজির ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। যদিও সহরের অন্যান্য পল্লীতে ইংরাজগণের, পর্ত্তুগিজগণের, এবং অপরাপর খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের গির্জ্জা আছে, তথাপি ইহারই বেশী নাম শুনা যায়। ইহার ঘটিকাযন্ত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

রামজানি নামক একজন দর্জ্জি সুতালহাটিতে নয়টী খিলানবিশিষ্ট চতুষ্কোণ ইষ্টকনির্ম্মিত মসজিদ স্থাপন করে, এই মসজিদ অন্যান্য সকল মসজিদ অপেক্ষা সমধিক প্রশংসার যোগ্য।

কলিকাতায় অনেক ইমামবাড়ী আছে, সেগুলি খুব ক্ষুদ্র এবং উচ্চতায় দুই বা তিন হস্তের অধিক নয়।

হিন্দুদিগের মধ্যে দুর্গা, কালী এবং কার্ত্তিকের পূজা হইয়া থাকে। তাহারা মোমদ্বারা প্রতিমা গঠন করিয়া ভূমির উপর বসাইয়া রাখে এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে গীতবাদ্যাদি উৎসবসহকারে নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া আইসে।

দুর্গাপূজা অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে এবং এই পূজায় ধনবান্‌গণ প্রভূত অর্থ ব্যয় করে। মাসের প্রথম শুক্লপক্ষের সপ্তমদিবস হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম, নবম ও দশম দিবস পর্য্যন্ত পূজা হয়, দশম দিবসে প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ইহাকে 'ভাসান' বলে। ধনিগণ এই দিবস মুসলমান এমন কি ইংরাজ-দিগকে পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া থাকেন। সর্ব্বশ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

দেশের ধনবান্‌গণ পূজাস্থানে শামিয়ানা খাটাইয়া তাহার নিম্নভাগে ভূমির উপর বিভিন্ন বর্ণের কার্পেট্ বিস্তৃত করিয়া দেন; কাচনির্ম্মিত ঝাড়, ফানুস (shades) এবং বর্ত্তিকাসমূহ সর্ব্বস্থান আলো করিয়া তুলে। স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত তাম্বুল এবং আতরদান সভাস্থলে সজ্জিত থাকে। পাত্রপূর্ণ কুসুমসম্ভার মিষ্টগন্ধে বাতাসকে আমোদিত করিয়া তুলে কবির দল, নর্ত্তক এবং বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতে সকলের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।

সুরম্য কার্পেটের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে মনোহর বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ এবং আর্ম্মেনীয় ললনাবৃন্দ উপবিষ্ট হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। পূজার সময় সভাস্থলে আসনশ্রেণী বিরাজ করে। পূজার কয় দিবস রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নৃত্যগীতাদির আয়োজন হয় এবং বহুসংখ্যক লোক আগমন করে।

নগর হইতে কিয়দ্দূরে দক্ষিণে ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ বিরাজমান রহিয়াছে। পলাশী যুদ্ধের পর কর্ণেল ক্লাইব কর্ত্তৃক এই দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়; আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয় যেন ইহা সদ্যঃ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গঠনপ্রণালী অদ্বিতীয় এবং আকার সম্পূর্ণ নূতন। ইহা অতিশয় সুরক্ষিত এবং সুদৃশ্য। এই দুর্গের মধ্যে পরিভ্রমণ করিলে দর্শকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

দুর্গের পশ্চিমে নদীর অপর পারে তীরের সন্নিকটে কোম্পানির উদ্যান আছে, ইহা অতিশয় মনোরম কিন্তু প্রাচীরে বেষ্টিত নহে। ইহার মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক কুসুমশয্যা (Flowerbed) এক একটী স্বতন্ত্র গোলাপ-উদ্যানের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই বাগানের লোহিতবর্ণ পথসকল অতীব মনোহর, এই সকল পথের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ লতাপাদপ শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বাগানে এমন সকল অদ্ভুত নামবিশিষ্ট ফুল ও ফলের গাছ আছে যে, তাহাদের নাম এদেশের কেহ শুনে নাই। যথা :— লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, কাবাবচিনি, কর্পূর ইত্যাদি। উদ্যানের মধ্যে অনেক কৃত্রিম হ্রদ উৎখাত হইয়াছে। চারিটী পথের সম্মিলনস্থলে জেনারেল কিডের সমাধি বিরাজ করিতেছে।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

আগত।

ওরে দাম্ভিক ওরে অবিনয়ী
ওরেরে বিপথগামী,
ওরে মোহান্ধ ওরে সংশয়ী
এসেছি এসেছি আমি।
নদী-কল্লোলে বিহগের গানে
গিরিসংযমে জলধির প্রাণে
জগতের শতকোটী-কল্যাণে
প্রকাশি' এসেছি নামি;
ভক্তিবিহীন ওরে সংশয়ী
ওরেরে বিপথগামী!

প্রভাতে কি কভু চোখে নাহি লাগে
আমার অরুণ-রেখা?
সন্ধ্যার ঘন সিন্দুর-রাগে
পাওনি আমার দেখা?
বরষাধারায় সিক্ত শিশিরে,
কোমল মলয়ে উষ্ণ সমীরে,
আমার করুণা অনুভূত কিরে
হয়নি দিবস-যামি'?
ওরে মোহান্ধ ওরে সংশয়ী
ওরেরে বিপথগামী!

শোননি কি সবে বজ্রের ভাষে
আমার ন্যায়ের ভাষা?
শ্যামল শস্যে প্রভাতে প্রদোষে
ফুটে কি উঠেনি আশা?
যাহা কিছু তব জ্ঞানের অতীত
তব পরিমাণে নহে পরিমিত,
তাহার বিচারে আমারে দূষিত
ক'রোনা স্বার্থকামী,
ওরে মোহান্ধ ওরে অবিনয়ী
ওরেরে বিপথগামী!

এতটুকু শোকে হ'য়ে অসহন
আমারে করিছ দায়ী
এতটুকু সুখে করনা স্মরণ
কোমল-শয্যাশায়ী?
জ্যোতিমণ্ডলে ওরে দীপশিখা,
বিশ্বের মাঝে ওরে পিপীলিকা,
কতটুকু দেখ? এত অহমিকা
উপজে দিবস-যামি'।
ওরে দাম্ভিক ওরে অবিনয়ী
এসেছি এসেছি আমি।

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিধ্বনি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের বাল্যস্মৃতি 'সাহিত্যে' "সেকালের কথা"-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। অতি সুন্দর প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য ভাষায় পণ্ডিতরাজ তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার এই স্মৃতিকথা বলিয়া যাইতেছেন। সেকালে আমাদের জীবনযাত্রা কত সহজ ও অনাড়ম্বর ছিল, সেকালের মানুষ কেমন ধর্ম্মভীরু ছিল, ছেলেরা অভি-

শ্রাবকদিগের নিকট হইতে কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া কেমন ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা লাভ করিত, এই সকল বিষয় তর্করত্ন মহাশয় "সেকালের কথা"য় অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিতেছেন। আর এক কথা, তাঁহার ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের আদর্শ ভাষা। এ ভাষায় পণ্ডিতজনসুলভ 'গোঁড়ামি' একেবারেই নাই, আবার ইংরাজীনবিশের অবলম্বিত কলিকাতাবাসীর কথোপকথনের ভাষা, বা পূর্ব্ববঙ্গের লেখক বলিয়া প্রবন্ধের মধ্যে "লইয়া" প্রভৃতির পরিবর্ত্তে "নিয়া" প্রভৃতি প্রাদেশিকতা-বিশিষ্ট ভাষাও তাঁহার প্রবন্ধে স্থান পায় নাই। তিনি যে ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, আজি কালিকার নবীন লেখকগণ সেই ভাষার অনুসরণ করিলে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। এখন ভাষার উপর যথেষ্ট অত্যাচার চলিতেছে, ইহা অত্যন্ত অসহ্য। এইজন্য আমরা নিম্নে "সেকালের কথা" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বিধবারা রুক্ষ স্নান করিতেন; তাঁহাদিগের মাথা ও গা ঘষিবার রীতি ছিল না; তাঁহাদিগের মাথায় লম্বা চুলও থাকত না। তাঁহাদের অনেকেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান করিতেন; বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে সকলেরই প্রাতঃস্নান করার নিয়ম ছিল। * * * বিধবারাই ছিলেন গৃহকর্ত্রী। প্রত্যেক বাড়ীতে মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা, মাসীমা, কাকীমা, জেঠাইমা, ভগিনী, বা শাশুড়ী, কেহ না কেহ থাকিতেন। সেকালে কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, বাড়ীর সেই বিধবার ভয়ে কর্ত্তা ও গৃহিণী সর্ব্বদা জড়-সড় থাকিত। একালের মত সেকালের বিধবারা পাচিকার কার্য্য করিতেন না; তাঁহাদিগেরই হুকুমে সেকালের বধূরা দিনরাত খাটিত। সেকালের বিধবারা গরদ বা তসর পরিয়া, গায়ে নামাবলী দিয়া, ঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা, জপ ও তপস্যায় দিন কাটাইতেন। তাঁহাদিগের মুখে ও শরীরে কেমন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত, দেখিলে পাষণ্ডেরও মনে ভয় ও ভক্তির উদয় হইত।"

———o———

বিগত "মাঘ ও ফাল্গুন" সংখ্যা "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" নামক মাসিকপত্রে 'আয়ুর্ব্বেদের গৌরব' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন লিখিয়াছেন ঃ—

"এখন দেখা যাউক হিন্দুগণ অস্ত্রচিকিৎসার কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন। ডাক্তার রয়েল (Rayle) সাহেব বলেন যে, হিন্দুদিগের গ্রন্থে ১২৭ প্রকারেরও অধিক অস্ত্রের নাম লিখিত আছে। ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা ছেদন, ভেদন লেখন, বেধন, এষণ, আহরণ, বিস্রবণ ও সীবন

প্রভৃতি অষ্টবিধ কার্য্য সংসাধিত হইত। ডাক্তার উইলসন (Wilson) বলেন, এই সকল কার্য্য নিম্নলিখিত শ্রেণীর অস্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হইত যথা—যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, অলাবু, এবং জলৌকা; অস্ত্রসকল ধাতু নির্ম্মিত ছিল।"

অস্ত্রচিকিৎসার উন্নতির যে বিবরণটুকু তিনি প্রদান করিয়াছেন. তাহা অতি অল্প। এত অল্প যে তাহা পাঠ করিয়া অতৃপ্ত থাকিতে হয়। হিন্দু ভিষকগণ যে শল্যতন্ত্র বা অস্ত্রবিদ্যার প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন, একথা অসত্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সভা'য় কলিকাতার অস্ত্র-চিকিৎসকগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্রবিদ্যা-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তৎসহ তিনি কতিপয় প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রও সভাস্থলে দেখাইয়াছিলেন। অস্ত্রবিদ্যার উন্নতির যুগ বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সম্রাট্ অশোকের সময়ে রাজকীয় আদেশে শবব্যবচ্ছেদক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতেই অস্ত্রচিকিৎসার অবনতির সূত্রপাত হয়। এখন ত আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসকগণ অস্ত্র-চিকিৎসার দিক্ দিয়াও যান না। যাহা হউক, আশা করি অতঃপর 'আয়ুর্ব্বেদ বিকাশে' অস্ত্রচিকিৎসার গৌরবের বিশদ বিবরণ আমরা দেখিতে পাইব।

———:০:———

গত মাঘ মাসের 'অর্চ্চনা'য় সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'আদি প্রাণ' শীর্ষক এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। জীবকে কেন উদ্ভিদ বা উদ্ভিদভোজী প্রাণী খাইতে হয়, এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি তাহা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"জীব জড়পদার্থ পরিপাক করিয়া আপনার শরীর পুষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ তাহা পারে। উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। শিকড়ের সাহায্যে উদ্ভিদ ভূমি হইতে নিজ শরীরে জল টানিতে পারে এবং পত্রের ভিতর দিয়া নিজদেহে বায়ু প্রবিষ্ট করিতে পারে। বায়ুতে দাহ্যঙ্গার বিদ্যমান। ক্লোরোফিলে সূর্য্যালোক পাড়লে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। দাহ্যঙ্গারও অম্লজান ও অঙ্গারে বিশ্লিষ্ট হয়। জলের অম্লজান উদ্ভিদদেহে প্রবিষ্ট দাহ্যঙ্গারচ্যুত অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া যায়। তাহাতে হাইড্রোকার্ব্বন বা উদঙ্গারের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ এই উদঙ্গার নিজ দেহমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে। উদঙ্গারের দ্বারা দেহের প্রাণকোষের পুষ্টি হয়। উদ্ভিদ উদঙ্গার নির্ম্মাণ করিতে পারে, জীবদেহ সে কার্য্য সাধিতে অপারক। তাই জীবকে উদ্ভিদ খাইতে হয় বা উদ্ভিদভোজী অপর জীব খাইতে হয়। জীবদেহে ক্লোরোফিল নাই বলিয়াই জীবকে প্রাণধারণের জন্য উদ্ভিদ-জগতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

———

আমাদের দরিদ্রতা ও পরনির্ভরতা।



আমরা যে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি, তাহা বিগত বর্ষের আমদানী-রপ্তানীর সরকারী বিবরণী পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। এই দারিদ্র্য ক্রমশঃ আমাদের মজ্জাগত, জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে আমরা যে কতদূর পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছি এবং দিন দিন আরও হইতেছি তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির জন্য আমরা যেমন বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকি, এমন বুঝি পৃথিবীর আর কোন জাতি থাকে না। বিদেশের বস্ত্রে আমরা প্রধানতঃ লজ্জা নিবারণ করি, বিদেশের আলোকে আমরা আমাদের প্রাসাদ-কুটীর আলোকিত করি, বিদেশের সূতায় আমাদের দুই চারি জোড়া দেশী (?) কাপড় তৈয়ারী হয়, বিদেশের প্রদত্ত শর্করায় আমরা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করি, বিদেশের ঔষধে আমরা রোগ দূর করি, এমন কি মাতাল হইয়া যখন পশু সাজি তখনও বিদেশী মদ্য আমাদিগকে এ কার্য্যে বড় অল্প সাহায্য করে না। এই তো আমাদের অবস্থা! এইরূপ দরিদ্র ও পরনির্ভর যে জাতি, সে জাতি আর কতদিন এই পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিতে পারিবে, ইহাই এখন আমাদের নিকট এক প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা চিরদিন কি এমনই ছিলাম? না, কখনই নহে। আমরা

এমন দরিদ্র ও পরনির্ভর জাতি ছিলাম না। এমন দিন ছিল, যখন আমরা এখনকার মত কেবল কৃষিজীবী জাতিই ছিলাম না, আমাদের শিল্প তখন কেবল আমাদেরই অভাব মোচন করিত না, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে তখন তাহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঢাকার মসলিন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে তখন আমাদের দেশ কৃষি ও শিল্পজীবী ছিল; আজ ইহার শিল্প-সম্পদ্ বঙ্গোপসাগরের অগাধজলে ডুবিয়া গিয়াছে, আছে কেবল কৃষি। কৃষিই এখন এদেশের প্রধান উপজীবিকা। এই কৃষিকার্য্য দ্বারা এখন আমরা সমগ্র পৃথিবীর শিল্পীদিগের জন্য মূল সামগ্রী জোগাইয়া থাকি। অন্য সকল শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া বস্ত্রশিল্পের কথা ধর। সমগ্র জগতের বস্ত্র-শিল্পীদিগের জন্য আমরা আমাদের নদ-নদী-খাল-বিলের জল পচাইয়া-মজাইয়া, উহাদের মৎস্য-কুল নষ্ট করিয়া, উহাদের জল দূষিত করিয়া পাট তৈয়ারী করিয়া চালান দিয়া থাকি। আর সেই পাট বিদেশে যাইয়া আবার আমাদের দেশে বস্ত্র হইয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে। যে জাতি শুধু কৃষিজীবী অথচ যাহাদের শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা বা সুবিধা নাই, তাহারা যে চিরকাল দরিদ্র হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

চিরদিন কি এমনই ছিলাম ?

বড় বেশী দিনের কথা নয়, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা দেশের তৈয়ারী কাপড়েই বাঙ্গালী লজ্জা নিবারণ করিত। কেবল তাহাই নহে, বঙ্গের তন্তুবায়গণ বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিত। বাঙ্গালীর কাপড় ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত যাইত এবং সেখানে উহার এতই সমাদর ছিল যে, যখন ইংরাজকে তাহার নব-জাত বস্ত্র-শিল্পের রক্ষা-বিধানের জন্য চেষ্টিত হইতে হইয়াছিল, তখন বলপূর্ব্বক বাঙ্গালার কাপড়কে ইংলণ্ডের বাজার হইতে দূর করিয়া তবে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। তাহার স্বদেশীয় শিল্পের রক্ষার জন্য এই সংরক্ষণ-নীতি অত্যাবশ্যক হইলেও উহা যে ইংরাজের পক্ষে গৌরবকর হইয়াছিল, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না; তবে বাঙ্গালার কাপড়ের প্রতি বিলাতী জনসাধারণের যে প্রকার অনুরাগ ছিল, এইরূপ পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন না

করিলে বাঙ্গালার কাপড় আজ পর্য্যন্ত তথায় বিক্রীত হইতে পারিত। বাঙ্গালীর বস্ত্র-শিল্প দুই প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; প্রথম এ দেশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেষ্টা, দ্বিতীয় বিলাতের বাজারে ইহার প্রচার-রোধ। এই দুইটি উপায়েই বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের বিনাশ এবং বিদেশীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি! আজ পৃথিবীর লজ্জা-নিবারক বাঙ্গালী জাতিকে লজ্জা-নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে! নিয়তি-চক্রের কি কঠোর পরিবর্ত্তন!

গত বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনুশোচনা বৃথা। কোন্ কালে ঘৃত-সহযোগে অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলাম, আজ অঙ্গুলি-আঘ্রাণে ফল কি হইবে?

বিদেশীয় বস্ত্রে দেশের কত টাকা যায়?

এখন দেখা যাউক বিদেশীয় বস্ত্রে অর্থাৎ তুলা পাটজাত বস্ত্রে আমাদের কত টাকা ঘর হইতে চলিয়া যায়। গত বর্ষে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১২-১৩ সালে আমাদের বাঙ্গালা দেশে কিঞ্চিদধিক ২৯ কোটী টাকার বিদেশীয় কাপড় আমদানী হইয়াছে। গত ১৯০৭-৮ সালে ইহা অপেক্ষা ৬ কোটি টাকার কম কাপড় আমদানী হইয়াছিল। আমরা যদি নিজেদের কাপড় তৈয়ারী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই ২৯ কোটি টাকা বিদেশে যাইত না; এই টাকাটা দেশে থাকিলে আমাদের দরিদ্রতা যে অনেকাংশে কমিয়া যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আশা তো দূরের কথা, দিন দিনই আমাদের দেশের তন্তুবায়কুল বস্ত্রবয়ন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছে। সুতরাং কিছু দিন পরে আমাদের দেশে যে বস্ত্র-শিল্পের চিহ্নমাত্র থাকিবে না, এমন আশঙ্কাও আমরা পদে পদে করিতেছি।

বস্ত্রের কথা ত উপরে শুনিলেন। এইবার বিদেশীয় সূতার আমদানীর হিসাব দিব। এদেশে এখন আর সূতা তৈয়ারী হয় না। বস্ত্র বরং দুই

বিদেশ-জাত সূতা।

দশ জোড়া তৈয়ারী হয় এবং এই অল্পসংখ্যক বস্ত্রেরই জন্য আমাদিগকে বিদেশ-জাত সূতার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। গত বর্ষে প্রায় কিঞ্চিদধিক ১ কোটি টাকার সূতা এদেশে আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৯৭ লক্ষ টাকার, হল্যাণ্ড হইতে কিছু কম ১৩ লক্ষ টাকার, ইটালী হইতে প্রায় ৬॥০ লক্ষ টাকার এবং বেলজিয়ম ও সুইজারলাণ্ড হইতে একযোগে প্রায় ৪॥০ লক্ষ টাকার সূতা

আসিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবল আমাদের শাসক ইংরাজ-জাতি নহে, অন্যান্য যে সকল দেশের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারাও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে। ইহাকেই বলে—"নেপোয় মারে দই"। কি দুঃখের কথা!

প্রতিকার কোথায়?

এই সূতা-সমস্যা হইতেছে প্রধান সমস্যা। যদি আমাদের দেশে সূতা তৈয়ারী হইত, তাহা হইলে এখনও আমাদের যে অল্পসংখ্যক তন্তুবায় বা বস্ত্রশিল্পী আছে, তাহারা পাশ্চাত্য যন্ত্রজাত বস্ত্রশিল্পের সহিত অবহেলায় প্রতিযোগিতা করিতে পারিত। কিন্তু দেশে যে আর সূতা তৈয়ারী হয় না! পূর্ব্বে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সূতা তৈয়ারী হইত। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর কার্য্য শেষ করিয়া চরকায় সূতা কাটিত এবং সেই সূতা বিক্রয় করিয়া টাকা অথবা সেই সূতার বদলে কাপড় তৈয়ারী করাইয়া লইত। একটা নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ সেই পরিবারের এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের উপযোগী সূতা কাটিতে হইবে। এই নিয়ম জাতিনির্ব্বিশেষে চলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, হউক আর শূদ্রই হউক, সকল জাতির স্ত্রীলোককেই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত অর্থাৎ চরকায় সূতা কাটা একটা বিরাট জাতীয় অবশ্য-কর্ত্তব্য-কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আমাদের বস্ত্রশিল্পের তদানীন্তন সংরক্ষণ-নীতি ইহাই ছিল। বাড়ী বাড়ী চরকা চলিত। চরকা এতই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত যে, বিবাহের সময় কন্যাকে একটা চরকা যৌতুক দেওয়া হইত। নিম্নলিখিত প্রবাদ-বচন হইতে চরকার মূল্য উপলব্ধি হইবে:—

চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে মোর
দোরে বাঁধা হাতী।

চরকায় সূতা কাটিয়া মহিলাগণ তখন অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এই উপার্জ্জিত অর্থে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না, উহাই প্রকৃত স্ত্রীধন ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা কেবল বক্তৃতাই করিয়াছি; তখন যদি এই জাতীয় প্রথাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতাম, তাহা হইলে দেশের এই মৃতপ্রায় বস্ত্রশিল্পের জীবন-রক্ষা হইত। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন আমাদের উচিত প্রত্যেক পল্লী-গৃহস্থের বাটিতে দুই দশটা করিয়া তুলার গাছ রোপণ করা এবং প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ দুইজন করিয়া মহিলার চরকায় সুতা কাটা। এরূপ ভাবে সূতা কাটিলেই সূতার অপর্য্যাপ্ত উৎপাদন হেতু সূতার দর কমিবে এবং আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্প পাশ্চাত্য বয়ন-যন্ত্রগুলিকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠিবে।

কিন্তু ভগবান কি আমাদিগকে এমন শক্তি দিবেন যে, আমরা এই শুভকার্য্য-সাধনে অকপট প্রয়াস করিতে পারিব?

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

সমরাস্ত্রে প্রলয়ের সূচনা।

যুগধর্ম্মে যে খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহার বিশদ পরিচয় আমরা শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়েই সেই সকল প্রলয় সূচিত হয়। আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে, ভূমিকম্পের প্রবল কম্পনে, জলধির ভয়ঙ্কর স্ফীতিতে এবং প্রভঞ্জনের ভীম প্রবহনাদিতে মহাকালের ভেরী বাজিয়া উঠে বটে, বহুতর জীবের ধ্বংসপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু সেই সকল নৈসর্গিক ও আকস্মিক দৈব ঘটনার উপর মানবের কোন ক্ষমতা নাই অথবা মানবের কোন প্রভাব সে সকলের প্রশমন বা প্রবৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং মানবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এই প্রাকৃতিক বিপ্লবের নিকট প্রভাবহীন এবং নতশির; কালিফর্ণিয়া ও সিসিলির ভীষণ ভূমিকম্প, ভিসুভিয়াসের কালান্তক অগ্নি-উদ্গীরণ ও যুক্তরাজ্যের ভয়ঙ্কর ঝটিকাদিতে বহু প্রাণীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার উপর মানুষের কোন হাতই থাকে না। মানবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ইহার নিকট শক্তিহীন এবং প্রভাবশূন্য।

প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক বিপ্লবেও যেমন আমরা মহাকালের প্রলয়-আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাই, জাতিগত পারস্পরিক বিরোধ, ঈর্ষ্যা, হিংসা ও শত্রুতার জন্যও তেমনই সময়ে সময়ে মানবজাতির মধ্যে প্রলয়ের তূর্য্যধ্বনি বাজিয়া উঠে। সেই তূর্য্যনাদে উন্মত্তবৎ হইয়া মানুষ মানুষের প্রাণসংহার করে; আপনারা স্বেচ্ছায়, প্রলয়কে ডাকিয়া আনে; স্বেচ্ছায় মরণকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাদের ধ্বংসপথ আপনারাই পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

কিন্তু মানব ইচ্ছা করিলে আপনাদের এই স্বেচ্ছাকৃত মরণ-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। পারস্পরিক বিরোধ ও শত্রুতা ভুলিয়া, বিশ্বজনীন ভালবাসায় নিজ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণ করিয়া, প্রলয়ের আহ্বান-ধ্বনিতে বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে। অনাবশ্যক লোকসংহারক প্রলয়-রূপী সমরাদি হইতে বিরত থাকিতে পারে।

"বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি দিব না"—দুর্য্যোধনের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই মহালোকক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র-সমরের প্রধান ও মুখ্য হেতু। বৈমাত্র ভ্রাতৃগণের প্রতি, স্বাভাবিক ভ্রাতৃ-প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি দুর্য্যোধন তাঁহার এই দারুণ প্রতিজ্ঞাকে উপেক্ষিত করিতেন, শান্তির কামনায় নিজ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করিতেন, তাহা হইলে প্রলয়ের ভেরী-নিনাদ শুনিতে হইত না, কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অনুষ্ঠিত হইত না। অসংখ্য প্রাণি-ক্ষয় নিবারিত হইত। দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডার যদি দুরভিলাষিতার নিকট আত্মবিক্রয় না করিয়া দিগ্বিজয়ার্থ সমরাভিযান হইতে বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে অনেক রক্তক্ষয় নিবারিত হইতে পারিত, নেপোলিয়ান রণমদে না মজিলে অনেক প্রাণীর প্রাণরক্ষা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণ হইতে এইরূপ বহুল উদাহরণ প্রদর্শিত করিতে পারা যায়।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, সমর বা যুদ্ধও প্রাকৃতিক বিপ্লবের মত প্রলয়ের আহ্বান করে,—মৃত্যুর আলিঙ্গনে স্বেচ্ছায় মানবকে বদ্ধ করে। পার্থক্য এই, প্রাকৃতিক বিপ্লব মানুষের কোন নিষেধের অপেক্ষা করে না; আপনিই অকস্মাৎ সংঘটিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহসূচক প্রলয়ধ্বনি মানুষেই তুলে, আবার ইচ্ছা করিলে তাহারাই সেই ধ্বনিকে দমিত করিতে পারে।

মনুষ্যজাতির যত প্রকার আপদ-বিপদ থাকিতে পারে, যুদ্ধ-বিগ্রহ তাহাদের মধ্যে চরম। এমন অমঙ্গলসূচক, এমন প্রাণিক্ষয়কর, এমন লোকসংহারক ব্যাপার বুঝি ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই! মানুষের ভিতর যাহা কিছু মন্দ ও নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও নৃশংস, যাহা কিছু দয়া-দাক্ষিণ্য-সহানুভূতি-ক্ষমার বিরোধী ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতিবন্ধকস্বরূপ, সে সকলই এই যুদ্ধবিগ্রহের অঙ্গীভূত। আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যে ক্ষতি. তাহার বুঝি পূরণ হয় না! রোগে ও জরায় কয়জন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়? কিন্তু যুদ্ধে দেশের যাহারা প্রাণস্বরূপ, শৌর্য্য-বীর্য্য-পরিশ্রমশীলতায় যাহারা অগ্রগণ্য, এক কথায় যাহারা জীবিত থাকিলে দেশের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারিত, তাহারাই কেবল প্রাণ-পরিত্যাগ করে। ফলে দেশের ভিতরে যে শোকের তপ্তশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার স্পর্শে বুঝি বৃক্ষলতাও সঙ্কুচিত ও শুষ্ক হইয়া যায়! যুদ্ধ-বিগ্রহে অকালে রমণীকুল বৈধব্যের বেশ পরিধান করে, সন্তান-সন্ততি পিতৃহীন হয়, অসহায় আত্মীয়স্বজন সহায়শূন্য হয়, জাতীয় বল ও শক্তি হীনতা-প্রাপ্ত হয়। এক একটা বৃহৎ যুদ্ধের অবসানে এক একটা জাতির উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ হয়, এবং বহুদিন ধরিয়া জাতীয় উন্নতি আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। বিগত রুষ-জাপান-যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিয়াও যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে. তাহা আমাদের এই উদাহরণের পরিপোষকতা করিবে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রতীচ্য খণ্ডে যেমন বাহ্য সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে তেমনই রাজ্যলিপ্সাও বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য পাশ্চাত্য জাতিগণ সকলেই স্ব স্ব বল-বৃদ্ধি করিতেছেন, নিত্য নিত্য নানাপ্রকার লোকসংহারক অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা করিতেছেন। স্থলযুদ্ধে ও জল-যুদ্ধে কামান-বন্দুকের সৃষ্টি করিয়াও তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই; বিমানদেশ হইতেও যুদ্ধ করিবার জন্য, পরস্পরের ধ্বংসবিধানহেতু বিমান-যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতেছেন। আবার সম্প্রতি ব্যানজারটার নামক একজন সাহেব এক প্রলয়রূপী কালান্তক যুদ্ধাস্ত্র বাহির করিয়াছেন. তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় দুই কোটি গুলি (bullet) ছুটিবে। এইরূপ বিশটী অস্ত্র একত্রে এক ঘণ্টা কার্য্য করিলে লোক-সংহারের সীমা প্রাচীন কুরুক্ষেত্র

ও লঙ্কা-সমরকেও অতিক্রম করিবে, সন্দেহ নাই। পরাজিত সৈন্যগণের আত্মসমর্পণের আর সময় বা অবসর থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

তাই ভাবিতেছি, আবার বুঝি প্রলয়ের আহ্বান-ধ্বনি নিকটতর হই-তেছে, মহাকালের কণ্ঠরব মেঘমন্দ্রে দূর হইতে গর্জ্জন করিতে করিতে সমীপবর্ত্তী হইতেছে, জগৎ বুঝি কোন অনতিদূরাগত মহাসমরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছে!

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

মহম্মদপুরে আবিষ্কৃত মুদ্রা।

যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের উপকণ্ঠবর্ত্তী অরুণখালি নদীর সন্নিকটে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনটী পুরাতন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এই মুদ্রা তিনটী যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বোফোর্ট (F. L. Beaufort) কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীতে দান করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বঙ্গ মুখোজ্জ্বল রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই তিনটী মুদ্রা সম্বন্ধে উক্ত বৎসরের সোসাইটীর জর্ণালে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।* উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনে সাধারণের গোচরার্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

আলোচ্য মুদ্রাত্রয় একটী পাত্রমধ্যে সংরক্ষিত ছিল, কূপ-খননকালে তাহা সহসা বাহির হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পাত্রটীর ভগ্নাবশেষ মিঃ বোফোর্ট সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। উক্ত তিনটী মুদ্রাই কনৌজের গুপ্ত রাজবংশের; কনৌজের নৃপতিগণ যে এক সময় যশোহর অঞ্চলে আধি-পত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

আলোচ্য মুদ্রাত্রয় অতিশয় অবিশুদ্ধ ধাতুনির্ম্মিত। নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

---

* Note on three ancient coins found at Muhammedpur in the Jessore District—R. Mitter (Communicated by Cecil Beadon) J. A. S. B. 1852, Vol. XXI No IV. pp. 401-402.

১ নং মুদ্রা—(Pl. xii, Fig. 10) এই মুদ্রাটী স্বর্ণনির্ম্মিত, ওজন ৮৫ গ্রেণ। উপরিভাগে চাপহস্তা নারীমূর্ত্তি, তৌল এবং বামদিকে সন্নদ্ধ-দৃষ্টি হরিণ অঙ্কিত আছে। মুদ্রার চতুষ্পার্শ্ব ব্যাপিয়া প্রান্তসীমায় ধার আছে এবং গুপ্তাক্ষরে 'শ্রী' শব্দ খোদিত রহিয়াছে। মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে পক্ষযুক্ত বিজয়মূর্ত্তি এবং প্রান্তভাগে খোদিত লিপি। এই মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগ গুপ্তবংশীয় রাজন্যবর্গের মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগের অনুরূপ না হইলেও 'শ্রী' অক্ষর দেখিয়া কনৌজের গুপ্তবংশীয় শ্রীগুপ্ত বলিয়া মনে হয়। গুপ্তবংশীয় নৃপগণের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় নরপতির নামের আদ্য-অক্ষর খোদিত থাকে না। বিজয়মূর্ত্তিও ইঁহাদের মুদ্রাতেই কেবল লক্ষিত হয়। এই বিজয়মূর্ত্তির স্থানে পরবর্ত্তীকালে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি খোদিত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

২ নং মুদ্রা—(Ibid—Fig. 11) ইহাও গুপ্ত মুদ্রা, এরূপ মুদ্রাও আর আবিষ্কৃত হয় নাই। উপরিভাগে কাষ্ঠাসনে সমাসীন নৃপমূর্ত্তি এবং তদীয় মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে আলোকমণ্ডল (nimbus)। রাজমূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে দুইটী স্ত্রীরক্ষকের মূর্ত্তি। তদীয় বাম বাহুর উপরে অস্পষ্ট অক্ষরে নাম খোদিত রহিয়াছে। মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা কমলদলহস্তা ললনামূর্ত্তি, তাহার সম্মুখভাগে শিখীর চিত্র এবং বামভাগে গুপ্ত-অক্ষরে "শ্রীনরেন্দ্র" (গুপ্ত ?)।

৩ নং মুদ্রা—(Ibid Fig. 12) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে, এরূপ মুদ্রা তৎকাল পর্য্যন্ত কোনও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ কর্ত্তৃক আর আবিষ্কৃত হয় নাই। উপরিভাগে নিষণ্ণ বলীবর্দ্দের পৃষ্ঠে মানবমূর্ত্তি, তন্নিম্নে গুপ্তাক্ষরে 'জয়' শব্দ এবং বামপ্রান্তে 'শ্রীম' গুপ্তাক্ষরে খোদিত আছে। পশ্চাদ্ভাগ প্রায়শঃ গুপ্তরাজ মুদ্রার অনুরূপ। কিন্তু অতিশয় প্রযত্নে প্রস্তুত। খোদিত লিপিটী তাদৃশ স্পষ্ট নহে, অক্ষরগুলির মধ্যে 'শ্রীমত' শব্দটিই পাঠ করা যায়। মুদ্রাটী অবিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্ম্মিত। প্রায় এইরূপ ধরণের একটী মুদ্রা জৌনপুরের জয়চন্দ্রের ফোর্ট নামক একটী দুর্গের সন্নিকট খননকালে মিঃ ট্রেগার কর্ত্তৃক (Mr. Tregear) আবিষ্কৃত হয়। ইহার উপর উদগ্র বলীবর্দ্দ মূর্ত্তি খোদিত ছিল। * জয়চন্দ্রের নামযুক্ত আর একটী পিত্তলনির্ম্মিত

* J. A. S. B. Vol. iii. p. 411, Pl. xiii, Fig. 12.

শিলমোহর শা'পুর ঔদ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার উপর নিষণ্ণ বলীবর্দ্দমূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই শিলমোহরটী ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আর্ল সাহেব (Mr. Earl) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে অর্পণ করেন।

এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় স্থিরীকৃত করেন যে, মহম্মদপুরে প্রাপ্ত ৩ নং মুদ্রা জয়চন্দ্রের, যেহেতু বলীবর্দ্দ রাজপুতগণের প্রধানচিহ্ন এবং কাপ্তেন ফেলের বারাণসী তাম্রশাসনের জয়চন্দ্র † এই রাজপুতবংশেয় বংশধর। তাম্রলেখাদিতে দৃষ্ট হয়, জয়চন্দ্র ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আলোচ্য মুদ্রাটীর আকৃতি দেখিলে ইহাই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জর্ণালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মহম্মদপুরে প্রাপ্ত মুদ্রাত্রয় সম্বন্ধে উপরিলিখিত মত প্রকাশ করেন। তাহার পর আজ ষষ্টিবর্ষেরও অধিককাল অতিবাহিত হইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেহও আর এবিষয়ে আলোচনা করেন নাই। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে উক্ত মুদ্রাত্রয় এক্ষণে কি অবস্থায় রহিয়াছে তাহা জানি না। যে মহোদয়গণ অধুনা যশোহরের প্রাচীন ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উপকারে আসিতে পারে মনে করিয়া আমরা আজ সেই পুরাতন কথার উত্থাপন করিলাম। উক্ত মুদ্রা তিনটী হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর কত প্রাচীন। সীতারামের রাজত্বের বহু পূর্ব্বে হিন্দু-রাজত্বকালে তাহা সগৌরবে বঙ্গখণ্ডে বিরাজমান ছিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

যবন শব্দের ব্যুৎপত্তি।

ডাক্তার ভাউ ডাজি বলেন বেবার ও অন্যান্য পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বরাহমিহির তাঁহার গ্রন্থে যবন শব্দের দ্বারা গ্রীকগণকে বুঝাইয়াছেন। (১) মিসেস্ মানিন্ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে আবার

---

† Asiatic Researches—XV. p. 446.

১। J. R. A. S. (New) Vol 1409.

ডাঃ ডাজির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যবন ও গ্রীক জাতি অভিন্ন ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (২) কোলব্রুক বলেন যে, বরাহমিহিরের জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি কোন অসভ্য অথচ হোরা বিজ্ঞানে পারদর্শী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বার বার যবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যবন শব্দের দ্বারা ইহার অধিক আর কিছু বুঝিবার উপায় নাই। (৩) Biot বলেন যে, হিন্দু জ্যোতিষ চৈন জ্যোতিষের নিকট প্রভূত ঋণী এবং যবন শব্দের দ্বারা চীনবাসীদিগকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই উক্তি সমর্থনোপযোগী কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। মোক্ষমুলার বলেন যে, অতি প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে যবন জাতি অসভ্য জাতিগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তবে যবন জাতি দ্বারা কোন বিশেষ জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কিনা তাহা বলা কঠিন। (৪) শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র দত্ত যবন শব্দের দ্বারা গ্রীক জাতিকে বুঝাইয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলেন যে, গর্গ একজন সিদ্ধান্তকার, তিনি তাঁহার গ্রন্থে যবন ও গ্রীক্ এই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই দুই শব্দের দ্বারা যে এক জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা অতি সুস্পষ্ট।(৫) "নবজীবন" পত্রিকায় বহুদিন পূর্ব্বে কোন লেখক লিখিয়াছিলেন, "ভারত বহির্ভূত পাশ্চাত্য বর্ব্বর জাতিবিশেষ বা তাবৎ জাতিকেই যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইত। (৬)

Bishop Cadwell বলেন যে, যবন বলিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিকে বুঝাইয়াছে। যবন শব্দের দ্বারা কখনও বা গ্রীকজাতি এবং কখনও বা কারমণ্ডলের সন্নিকটবাসী আরবদেশীয় মুসলমানগণকে

২। Ancient & Mediæol India Vol I P 368.

৩। Colebrooke's Misc. Esssays Vol II P 529.

৪। What can India Teach us P 131.

৫। Ancient Civiliztion 601-602.

৬। নবজীবন ৩য় ভাগ পৃঃ ৫৪৩।

বুঝাইয়াছে। (৭) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বেবর সাহেবের Indian Literature পুস্তকের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে যেখানে যেখানে যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে যবন শব্দ দ্বারা গ্রীক জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যবন শব্দ গ্রীক Iaones শব্দ হইতে উদ্ভূত। (৮) পিলে তামিল সাহিত্যে যবন শব্দের ব্যবহার দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এক সময়ে ইজিপ্ত দেশীয় গ্রীকগণ ভারতের সহিত ব্যবসায়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ব্যবসায়-ব্যপদেশে তাহারা প্রায়ই ভারতে গমনাগমন করিত। তামিল সাহিত্যে যবন শব্দ দ্বারা এই ইজিপ্ত দেশীয় গ্রীকগণকেই বুঝাইয়া থাকে। (৯) রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের গিরি-গাত্র-খোদিত অনুশাসনে বহু স্থানে যবন দেশের উল্লেখ আছে। সির্ণাট-সাহেব এই সকল অনুশাসন আলোচনা করিয়া বলেন, যবন শব্দের দ্বারা গ্রীক ব্যতীত অপর কোন অহিন্দু অর্দ্ধ স্বাধীন জাতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যবন জাতি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশে বাস করিত। (১০) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার "পৃথিবীর ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এসিয়া-মাইনরের একটী প্রাচীনতম দেশ আইওনিয়া নামে পরিচিত ছিল। এই দেশের অধিবাসিগণ আইওনিয়া বা আইওনিয়ান সংজ্ঞা প্রাপ্ত। প্রাচীন গ্রীসের চারিটী প্রধান সম্প্রদায়ের একটী প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়মধ্যে তাঁহারা পরিগণিত হন। আইওনিয়দিগের ভাষা প্রাচীন গ্রীসের একটী প্রধান ভাষা ছিল। গ্রীস দেশের পুরাবৃত্তে প্রকাশ, আইওন নামে আপোলোর এক পুত্র ছিল। এথেন্সের রাজকন্যা ক্রুসার গর্ভে আইওন (Ion) জন্মগ্রহণ করে। আইওনের সন্তান-সন্ততিগণ আইওনীয় বা আইয়ন-বংশীয় নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণ আইওনিয়ান (Ionion) ও যবন (Jawan)

৭। Comparative Grammar of the Dravadian Languages P 2.

৮। Indian Shipping P 121.

৯। Tamil Eighteen Hundred years Ago.

১০। M. Senart in Ind. Ant xx 248.

শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। (১১) এলফিন্‌ষ্টোন বলেন, যবন শব্দের দ্বারা অনেকে মুসলমানজাতিকে বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, খৃষ্ট জন্মের পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্বে ইমারৎ খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করেন। প্রথমে হিন্দুগণ ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া যবন শব্দ ব্যবহার করেন। তাহার পর নানা জাতিকে লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহার স্বতন্ত্র অর্থ একেবারে নষ্ট হইয়াছে। (১২) বিখ্যাত ইংরাজী কোষগ্রন্থ ব্রিটেনিয়ায় যবন শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে হিন্দু আচার-বিরোধী জাতিগণ বৃশাল, যবন প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত, পরে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগে যবন শব্দের দ্বারা গ্রীক জাতিকে বুঝাইয়াছে। (১৩) এক সময়ে বৌদ্ধগণ ভারতে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। আচার-ভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ পাছে হিন্দুজাতির শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, এইজন্য হেমাদ্রি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (১৪) এই জন্য শশীচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে, যবন প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। (১৫)

মুসলমান যুগে যবন বলিতে মুসলমানদিগকেই বুঝাইত। (১৬) প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থানে যবন শব্দ পাওয়া যায়। ইহা যে মুসলমান শাসন-কর্ত্তা ও মুসলমান রাজকর্ম্মচারী বা মুসলমান বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ম্লেচ্ছ ও যবন শব্দ তখন একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। প্রবন্ধ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিব মাত্র।

১১। পৃথিবীর ইতিহাস (ভারতবর্ষ ২য় ভাগ) পৃঃ ৪৩০।

১২। History of India.

১৩। Encyclopœdia Britannica Vol. 12 P 782 c

১৪। বৌদ্ধ-শ্রাবক-নির্গ্রহ-শাক্ত-জীবক-কপিলান্।
যে পাপকর্ম্মণঃ সর্ব্বাংস্তানপি বর্জ্জয়েৎ॥ (শ্রাদ্ধকল্প)

১৫। India, Past & Present.

১৬। Hindu Caste & Sects.

রূপ সনাতন বলিয়াছেন,—

ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী আমার সঙ্গম ॥

"রসিক মঙ্গলে" যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (১৭) এই যবন শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহে মুসলমানগণকে বুঝাইয়াছে। আবার "চৈতন্য চরিতামৃতে" ম্লেচ্ছ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যবন হরিদাস শ্রীচৈতন্যকে বলিতেছেন "আমি হীন-জাতি ম্লেচ্ছ, আপনি কৃপা করিয়া আমায় কৃষ্ণমন্ত্র দিয়াছেন।"(১৮) হরিদাস যে যবন বা মুসলমান ছিলেন ইহা কাহারও নিকট অবিদিত নহে। "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থে ইঁহাকেই যবন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা,—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার ॥ (১৯)

ইহা ব্যতীত "ভক্তমাল"গ্রন্থে ইঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, আবার যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (২০) "চৈতন্য মঙ্গলে"ও যবন শব্দ আছে। (২১)

মুসলমান যুগে রচিত কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ও কারিকা গ্রন্থে যবন শব্দ দৃষ্ট হয়, এস্থলে দুই গ্রন্থের একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। হরি কবীন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে যবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা,—

১৭। উড়িষ্যা দেশেতে যত রাজা ভুঞা বৈসে,
সবাকার ঘর দ্বার ভাঙ্গিল বিশেষে।
বড়ই প্রতাপী দুষ্ট যবন রাজন,
থর থর কাঁপে ভুঞা রাজাগণ ॥

১৮। অনেক নাচালে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধে পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥

১৯। চৈতন্য ভাগবত ১।১১

২০। হরিদাস রূপ যেহ নামের মহিমা।
বাহু তুলে করিলেন নামের গরিমা ॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যারে করি আলিঙ্গন ॥
যবনের কুলে জন্ম হইল যে কারণ।
পিতা অভিশাপ শুন তার বিবরণ ॥

২১। পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥

"শুক্লাম্বরে কার্ত্তিপতিসুতরামস্য যবনবিপ্লবদশায়াং ক্ষেম্যগাং দেবানন্দস্য।"

দনুজারি মিশ্রের কারিকাতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। যথা;—

"সুখনালী জাফরাণী, দিস্তি দোষ তাতে মণি, যায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহ চট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি, শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ॥
যবনগামী কন্যাসুতে, ত্রৈলোক্য মজিল তাতে, আর দোষ তাতে কিছু গণি।
আঠা কাশী দুই ভাই, বৎসরে না পাইল ঠাঁই, কৃপণ দোষে কুলটা নাটানি॥

ধ্রুবানন্দের "মহাবংশাবলী"তে যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।(২২)

উদ্ধৃত স্থানগুলিতে যবন শব্দের দ্বারা যে, মুসলমানগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রায় বর্ত্তমান সময়কার বহু গ্রন্থ হইতে শব্দ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, যবন শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ জাতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আমরা বারান্তরে তাহারই আলোচনা করিব। এই যবন শব্দের উপর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বারান্তরে বলিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সদানন্দ।

১

শত আনন্দ শত আশঙ্কা
শত অতৃপ্তি-মাঝে
সুন্দর তব হৃদয়ানন্দ
বন্দ্য মূরতি রাজে;
ধনি-দীন-খল-সাধু-অন্তরে
সিন্ধু-সলিলে, মরুপ্রান্তরে
মন্দিরে, গৃহে, গিরিকন্দরে
তব মন্দিরা বাজে
শত আনন্দ শত আশঙ্কা
শত-অতৃপ্তি-মাঝে।

২

নবজীবনের প্রথম আলোকে
বিহগ উঠিলে ডাকি',
হে করুণাময়, মরণের ছায়া
মায়ায় রাখিলে ঢাকি';
একদা আবার জীবনবন্ধে
মরণ নামিলে করুণ-ছন্দে
বাজালে বিষাণ কি মহানন্দে
শিব শঙ্কর সাজে
শত আশঙ্কা, শত অতৃপ্তি
শত-আর্ত্ততা মাঝে।

২২। কালিদাসোঽপি তৎপশ্চাৎ জাতাশ্চোপরতিঃ কুলে।
পিতুর্যবনদোষেণ এয়াণামেবকুষ্ঠিতাঃ॥

৩

সিন্ধু মথিয়া গরল উঠিল
বিশ্ব কাঁপিল ত্রাসে ;
হে নীলকণ্ঠ ! সৃষ্টি রাখিতে
সে বিষে পূরিলে গ্রাসে ।
তখনো তোমার শুভ ওঙ্কার
দিগ্ দিগন্তে দিল ঝঙ্কার,
বিস্মিত চোখে বিশ্ব পুলকে
স্তব্ধ তোমার কাযে
শত-আর্ত্ততা শত-আশঙ্কা
শত আনন্দমাঝে ।

৪

সতীদেবী যবে তোমার নিন্দা
না সহি ত্যজিল দেহ,
যজ্ঞ-সভায় তোমারে হেরিয়া
কথা না কহিল কেহ ;
সব বুঝেছিলে মঙ্গলদায়ী,
[illegible] নীরবে ক্ষণকাল তাই
তব কিছু কমে নাই
সেদিন মরণ-সাঁঝে
শত-আর্ত্ততা শত আশঙ্কা
শত ক্রন্দন মাঝে ।

৫

বিশ্ববিজয়ী মদন যখন
মারিল পুষ্পশর,
কামনাবিহীন তোমার দৃষ্টি
পড়িল তাহার পর ;
সন্ন্যাসি ! তব জ্বলিল নয়ান
চূড়ার চন্দ্রে ভাতিল বয়ান,
ভস্মাবশেষ রহিল শয়ান
তখন ধূলির মাঝে
প্রণব-ছন্দে কি মহানন্দে
তোমার বিষাণ বাজে !

৬

যবে সুমন্ত আশ্রম হ'তে
গঙ্গারে করে দূর,
অপবাদ ভয়ে নাহি দিল ঠাঁই
মানব-অসুর সুর,
ধূর্জ্জটি তুমি পাগলের বেশে
নিরপরাধারে তুলি নিলে কেশে
পাষাণো গেল সে করুণায় ভেসে
মুছিয়া সকল লাজে
শত আশঙ্কা শত অতৃপ্তি
শত আনন্দ-মাঝে ।

৭

চিতার ভস্ম বিভূতি তোমার
বৃষভ বাহন তব,
সঙ্গের সাথী নন্দী ভৃঙ্গী,
ওগো চির-অভিনব !
ধুস্তুর ফুলে তৃপ্ত ভিখারী
সব সম্পদ্ হেলায় নেহারি'
সুন্দর হর শ্মশানবিহারী
তোমার মুরতি রাজে
শত-আনন্দ শত-আশঙ্কা,
শত-ক্রন্দন মাঝে।

নির্ব্বাণ শূন্যত্ব—না পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি ।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, নির্ব্বাণ জিনিষটা কি ? ইহা কি শূন্যত্ব-প্রাপ্তি না পূর্ণত্ব ?

উদানের একস্থলে আছে বটে—হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিলে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তারপর নিবিয়া যে কোথায় যায় তাহা যেমন কেহ বলিতে পারে না, তেমনই যাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন, রাগবন্ধন চ্ছেদন করিয়াছেন, এবং অনন্ত সুখলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না (পটলঃ ১০)।

'মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে'ও আমরা দেখি—"মুক্তি ঠিক আলোক-নির্ব্বাণের ন্যায় । (৬।১৭)

আবার 'রতনসুত্তে' আছে—

> খীনং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
> বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং ;
> তে খীনবীজা, অবিরূলহি ছন্দা,
> নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো ।

প্রাচীন সংস্কার নষ্ট হইয়াছে, নূতন সংস্কারের উৎপত্তি অসম্ভব ; পুনর্জন্ম-গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা নাই—তাহারা ক্ষীণবীজ ও জিতছন্দ। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তাহারও মৃত্যুর পর নির্ব্বাণে বিলীন হয়।

অন্যত্র, "মুক্ত আত্মার আমিত্ব জ্ঞান থাকে না"—মুক্তিলাভ করিয়া আত্মা দেখেন "নাহম্" !

ইহাতে কি বুঝায় ? আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়, যে নির্ব্বাণ পূর্ণত্ব নহে—ধ্বংশ। অনেকেই এই ভ্রমে পড়িয়াছেন।

কিন্তু নির্ব্বাণ কি তাহাই ? যদি তাহাই হইবে, তবে 'নাহম্' এই যে জ্ঞান ইহা কখনও থাকিতে পারে না, "অনন্ত সুখ"-অনুভবক্ষমতাও থাকা অসম্ভব।

এই ভ্রম অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে ; এমন কি বুদ্ধদেবের

একজন শিষ্য—ভিক্ষু যমকও প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাণ শূন্যত্বে পরিণতি!

মহাযান-মতের অভ্যুদয়-যুগে, এই শূন্যবাদের প্রাধান্য অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরে শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন ধর্ম্মপূজকগণের দেবতার স্থান অধিকার করেন।

শূন্যবাদের মতে শূন্য হইতে এই পৃথিবীর উৎপত্তি, শূন্যেই ইহার লয়—শূন্য হইতে আসিয়া মানবাত্মা শূন্যে মিলাইয়া যায়। শূন্য পুরাণে আমরা দেখি—সৃষ্টির পূর্ব্বে

নহি রেক নহি রূপ, নহি ছিল বর্ণ চিন্
রবি শশী নহি ছিল, নহি রাতি দিন
নহি ছিল জল থল, নহি ছিল আকাশ,
মেরুমন্দার ন ছিল, ন ছিল কৈলাস।

ইহাই শূন্যবাদ।

ধর্ম্মপদে কিন্তু আছে—"মুক্তপুরুষ অমৃতে অবগাহন করেন। (ধর্ম্মপদ ৪১১)

আবার—"জ্ঞানী, ধ্যানশীল, দৃঢ়চিত্ত, ও দৃঢ়শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।" (ধর্ম্মপদ ২৩)

"যে ভিক্ষু ধ্যানেতে আনন্দ পায়, যে প্রমত্ততা ভয় করে, সে কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, নির্ব্বাণ তাহার নিকটে। (ধম্মপদ ৩২)

অন্যত্র—

হে ভিক্ষু! এ দেহতরী করহ সেচন,
পাপবারি ভারাক্রান্ত যাহা অনুক্ষণ,
সেচন করিলে সেই সলিলের রাশি
লঘু হয়ে দেহতরী উঠিবেক ভাসি;
রাগদ্বেষাদির শেষে করিয়া ছেদন,
চরমে লভিবে তুমি নির্ব্বাণ পরম! (ভিক্ষুবর্গ—ধম্মপদ)

অন্যস্থানে দেখিতে পাই—

"কামাদির উচ্ছেদ হইলেই ইহার নাম হয় নির্ব্বাণ; দ্বেষ ও মোহাগ্নির উচ্ছেদ হইলেই ইহার নাম হয় নির্ব্বাণ; অভিমান, মিথ্যাদৃষ্টি (অবিদ্যা), ও

সকলপ্রকার দুঃখযন্ত্রণার উচ্ছেদ হইলেই ইহার নাম হয় নির্ব্বাণ!" (জাতক)

আবার ধম্মপদে—"কোন কোন ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়, পাপকারী নরক ভোগ করে, পুণ্যকারী স্বর্গে যায়, যাহারা পার্থিব সকল তৃষ্ণা হইতে মুক্ত তাহারা নির্ব্বাণ সম্ভোগ করে। (ধম্মপদ—১২৬)

একজন ব্রাহ্মণ যখন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন "হে বন্ধু, সকলে বলে নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ! কিন্তু নির্ব্বাণ কি? ভগবান বলিলেন, বন্ধু! কামাগ্নির উচ্ছেদ, দ্বেষের উচ্ছেদ, এবং মোহের উচ্ছেদই নির্ব্বাণ!"

অতএব নির্ব্বাণ ধ্বংশ নহে, নির্ব্বাণের অর্থ পাপের নির্ব্বাণ—আমিত্বের নির্ব্বাণ—মিথ্যাদৃষ্টি বা অবিদ্যার নির্ব্বাণ; দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি—তৃষ্ণার নিরোধ—জন্মের শেষ!

* * * *
* *

কিন্তু ইহা হইতে শূন্যবাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল? এই শূন্যবাদের উৎপত্তি সম্ভবতঃ এই কথাটীতে—সব্বে ধম্মা অনত্তা—আত্মা ভ্রম, মায়ামাত্র! —মানুষ যখন জানিতে পারে "আমি নাই" তখনই তার মুক্তি!

কিন্তু এখানেও সেই ভুল! বুদ্ধদেব যে অর্থে আত্মা শব্দ এখানে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ লইয়াই যত গোল হইয়াছে।

প্রথমে আমরা দেখিব এই আত্মা কি?—এই আত্মা নাম ও রূপের সমষ্টি—দৈহিক ও মানসিক উপাদানসমূহের সম্মিলন-জনিত অভিব্যক্তি—স্রোতজলের ন্যায় অবিরত সম্মুখ ও পশ্চাদভিমুখে গমনশীল একটী জলপ্রবাহ!

কিন্তু এই নাম ও রূপ উভয়ই ধ্বংশের অধীন—নশ্বর। শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্রে অশ্বঘোষ তাই বলিতেছেন—আত্মার ধারণা হইতেই যত সব মিথ্যা-দৃষ্টির উৎপত্তি

এখন দেখিতে হইবে প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের মত কি? এই আত্মা—"অণরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্।"

অন্যত্র—

"এষ আত্মাপহত পাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎ মোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।" (ছান্দোগ্য। ৮।১।৫)

ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প।

"স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)—আত্মা মহান্, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অভয়।

অতএব এই আত্মা আর বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট আত্মা এক নহে। অদ্বৈত-বাদের অবিদ্যার সহিত বরং ইহার সামঞ্জস্য আছে।

তারপর আবার আমরা বুদ্ধদেবের উপদেশে দেখিতে পাই যে—এই যে আত্মা, ইহা কর্ম্মদৃষ্ট; অতএব কালে ইহার ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী—আত্মার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে—থাকিবে অনাত্মা।

মঙ্গলসূত্রের মতে, এই অবস্থায় চিত্ত লাভ অলাভ, যশ অযশ, নিন্দা প্রশংসা, সুখ ও দুঃখে বিচলিত হয় না—তখন তাহার মন শোকহীন, রজহীন, ভয়হীন।

এই অবস্থার সহিত "অজর অমর মৃত্যুহীন" আত্মার মিল আছে।

ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি—হিন্দুশাস্ত্রের আত্মা বৌদ্ধ গ্রন্থের অনাত্মা এবং বৌদ্ধদের আত্মা, হিন্দুর অবিদ্যা!

অতএব আত্মার ধ্বংশ, ইহার অর্থ অবিদ্যার উচ্ছেদ! অবিদ্যা যখন বিনষ্ট হয়, তখনই মানুষ মুক্তি পায়—এই অবিদ্যাই বৌদ্ধশাস্ত্রের মিথ্যাদৃষ্টি।

তবেই হইল যে, অবিদ্যার নাশই মুক্তি। তখন অহংজ্ঞান চলিয়া থাকে দিব্য শাশ্বত ভাব—স্বার্থ যায়, থাকে নিঃস্বার্থ ভাব—আত্মা যায় থাকে অনাত্মা!

* * * * * *

এখন এই আত্মার অনাত্মায় পরিণতি কিরূপ?

বানর যদি মানুষ হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার বানরত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে, মানুষের সদ্‌গুণাবলী অর্জ্জন করিতে হইবে, তবেই সে মানুষ হইতে পারিবে।

নির্ব্বাণও সেইরূপ—নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইলে, আমিত্ব অহং জ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

এই নির্ব্বাণ কি প্রকার?

প্রজাপতির শূককীট যখন প্রজাপতিতে পরিণত হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় না, উভয়ই এক কীট কি না—তাহাদের মধ্যে এতই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে! শূককীট তাহার পূর্ব্বদেহ বিসর্জ্জন দিয়া নূতন কলেবর গ্রহণ করিয়াছে।

নির্ব্বাণও সেইরূপ; পূর্ব্ব আয়তনের ধ্বংশ—নূতন আয়তন-লাভ।

ব্রহ্মচারী বসিত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোতম! নির্ব্বাণ কি?" বুদ্ধ বলিলেন—"দুঃখের অভাবই নির্ব্বাণ!" বসিত তখন বলিলেন—"অভাব চারিপ্রকার; যে অভাব কখনও হয় নাই, যা ছিল কিন্তু ধ্বংশ হইয়াছে, কল্পিত অভাব, এবং একটী জিনিষ আর একটী হইতে পৃথক হইলে যেমন একটীতে অন্যের অভাব হয়, সেইরূপ অভাব; নির্ব্বাণ কি প্রকার অভাব?" বুদ্ধদেব তখন বলিলেন—"এক বস্তু অন্যটী হইতে পৃথক হইলে, যেমন একটীতে অপরের অভাব হয়, সেইরূপ অভাবই নির্ব্বাণ! বলীবর্দ্দ অশ্ব নয়, অর্থাৎ বলীবর্দ্দে অশ্বত্ব নাই, কিন্তু তা বলিয়া বলিতে পারা যায় না, যে বলীবর্দ্দের অস্তিত্ব নাই। (পরিনিব্বাণ-সুত্ত ৩৯।১)

* * * *

* *

এতক্ষণে বুঝা গেল, নির্ব্বাণ কি!

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, নির্ব্বাণ যদি শূন্যত্ব না হয় তবে একই বৌদ্ধশাস্ত্রে আবার দীপনির্ব্বাণ এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদাহরণ কেন?

এখানেও সেই বুঝিবার ভুল! এই উদাহরণ দুটীর অর্থ ইহা নয় যে দীপশিখার ন্যায় মুক্ত আত্মা ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইবে; ইহার অর্থ এই যে, যেমন দীপশিখা ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইলে কোথায় যায়, এবং কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; ঠিক সেইরূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থাও আমাদের বর্ণনাশক্তির অতীত!

কেন?—না মুক্ত আত্মা 'নিরুপাধি'! আর যাহা নিরুপাধি বা উপাধি-হীন তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহিরে!

ইহাই ইহার অর্থ।

অতএব আমরা দেখিলাম—

বৌদ্ধ আত্মা হিন্দুশাস্ত্রের অবিদ্যা বা মায়া, এবং হিন্দু আত্মা, বৌদ্ধদের অনাত্মা। মূলতঃ ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; পার্থক্য শুধু ইহাতে যে বেদান্তমতে আত্মা নিজের পাপপুণ্যের অতীত। অবিদ্যার আবরণ পড়ায় পাপপুণ্যের ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়; আর বৌদ্ধমতে আত্মা সম্মুখ ও পশ্চাদভিমুখে গমনশীল পুদ্গল—ইহা পাপপুণ্যের অধীন! আর অহংজ্ঞান—স্বার্থভাব—আত্মা—বা অবিদ্যার নাশে আত্মার মধ্যে যখন দিব্য শাশ্বত ভাব ফুটিয়া উঠে তখনই তাহার নির্ব্বাণ—তাহার মুক্তি! *

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

কি লিখিব?

কি লিখিব বল—তোরে কি বলিব আর
খুলিতে কি আছে বাকী হৃদয়ের দ্বার?
দেখনি—হৃদয়দ্বার
ভেঙ্গে পড়ে চুরমার—
আঁকিছে গোপনে পশি তাহার মাঝার
সন্তপ্ত নয়ন-নীর মুরতি তোমার?

কি লিখি?—লেখনীমুখে লেগেছে অনল
দগ্ধ মসীপাত্রভরা ভীষণ গরল!
হইছে অবশ মন
দিন দিন নিপতন
শিরায় শিরায় দেখ বহে অবিরল,
জীবনের বিষপূর্ণ কাহিনী কেবল!

অতীত অঙ্গার-ভস্মে ক্ষুদ্ররেণুপ্রায়
লুকায়ে সংসার-কোণে ছিলাম হেথায়
কোথা হ'তে এসে হায়
জাগালে জীবন তায়—
দহিল দারুণ শিখা তুষার মাথায়!
গলিয়া, গলিয়া তোর লুটাইনু পায়!

দেখনি—পাতিয়া বক্ষঃ চরণ-ধূলায়
সঙ্গোপনে থাকি মিশি ধূলায় ধূলায়?
একটী কটাক্ষ তরে
হৃদয়ে প্রলয় ধরে
অচেতন চেয়ে থাকি মুখপানে হায়।
শিহরি সশঙ্কমনে কথায় কথায়!

পথহারা মেঘ—দূর গগন-সীমায়
সভয়ে চঞ্চল প্রাণে শশী-পানে চায়।
সহসা বিজলী আসি
বিদীর্ণ হৃদয়ে পশি
ধরায় বিষম বহ্নি কণায় কণায়—
হাসিয়া আপন পথে শশী চলে যায়।

যাও চলে!—কেন কহি জীবন-কথন?
থাক সুখে সুধাপূর্ণ স্বপ্নে সচেতন!
সংসার-সরসী-নীরে
হেসে, হেসে—ধীরে, ধীরে—
বিকাশি সুষমারাশি বিশ্ব-বিমোহন
সঙ্গীত-প্রবাহ-মুগ্ধ—দাও সন্তরণ!

—নির্ব্বাসিত।

---

* "বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা"র বৈশাখী পূর্ণিমোৎসবে পঠিত।

নিষ্ঠুর। *

১

ছেলেবেলা থেকে তাহারা একসঙ্গেই খেলা করিত, একসঙ্গেই থাকিতে ভালবাসিত। প্রতিবেশীরা বলিত, জ্যাক্ ও লুসি যেন একবৃন্তে দু'টী ফুল। রূপে, গুণে দু'জনেই সমান। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান ব্যবধান ছিল—সে ব্যবধান উভয়ের অবস্থার বৈপরীত্য। জ্যাক্ দরিদ্র কৃষক-সন্তান, আর লুসি জ্যাকেরই পাড়ার জমিদার লরেন্স ফস্‌টারের কন্যা।

ছেলেবেলায় পিতার মৃত্যু হওয়ায় জ্যাক্‌কে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এইজন্য জ্যাকের পড়াশুনায় মনোযোগ ও আগ্রহ যথেষ্ট থাকিলেও তাহার লেখাপড়া ততদূর হইল না। তাই, যেদিন পিতৃ-হীন জ্যাক্ জীবিকার্জ্জনের জন্য দূরদেশে যাইবার সংকল্প করিয়া সজল নেত্রে লুসির নিকট বিদায় লইতে আসিল, সেদিন লুসির কোমল হৃদয়ের সমস্ত করুণা ও সহানুভূতি অশ্রুবিন্দুর আকারে তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। লুসি জ্যাকের হাত দু'টী ধরিয়া বলিল,—"জ্যাক্ তুমি ত যাচ্ছ, আমার অনুরোধ আর দু' তিন দিন থেকে যাও।" জ্যাক্ ছেলেবেলা থেকে কখনও লুসির কথা ঠেলে নাই, আজও ঠেলিতে পারিল না। "আচ্ছা, তাই থেকে যাব" বলিয়া জ্যাক্ চলিয়া গেল।

সেইদিনই লুসি আসিয়া তাহার পিতাকে বলিল;—"বাবা, আমাদের প্রতিবেশী সেই মৃত কৃষকের ছেলে জ্যাক্ চাকুরীর জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাবা, আপনার ছাপাখানায় তাকে রাখ্‌লে হয় না?"

লুসির পিতা ফস্‌টার কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। জ্যাক্ তারপর দিন থেকে ফস্‌টারের ছাপাখানায় কম্পোজিটর বা অক্ষর-সংযোজকের কার্য্যে নিযুক্ত রহিল।

অল্পদিনের মধ্যে জ্যাক্ বেশ কাজের লোক এবং প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

---

* ইংরাজী হইতে

সময় ত কাহারও হাতধরা নয়। জ্যাক্ ও লুসি এখন আর ছেলে মানুষ নয়। তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। লুসির রূপ যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের গ্রামের যে কোন প্রসিদ্ধা রূপসী লুসির হিংসা করিত।

গোপনে লুসি যে তাহার হৃদয় জ্যাক্‌কে দান করিয়াছিল, সে কথা কেহই জানিতে পারে নাই, তাহার পিতাও নয়। জ্যাক্‌ও ইহা বেশ বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিত, লুসি যে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহাকে ভালবাসে,—সে কেবল অনুগ্রহ করিয়া, সে কেবল আমার দরিদ্রতার জন্য আর আমি তাহাদের ভৃত্য বলিয়া। জ্যাক্ এইটুকু ভাবিয়া সুখী ছিল, ইহার বেশী আকাঙ্ক্ষা সে করিত না!

লুসি কিন্তু মনে করিত, জ্যাকের মত সরল লোক নাই। আমি অপাত্রে হৃদয় দান করি নাই। জ্যাক্‌কেই আমি ভালবাসিয়াছি, চিরকাল উহাকেই ভালবাসিব। জ্যাকের সঙ্গে যদি বিবাহ না হয়, চিরজীবন কুমারী হইয়া থাকিব।

এমন সময় ফস্‌টারের ব্যবসায়ে একটা বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল। ফস্‌টার বৃদ্ধ হইতেছেন বলিয়া জন্‌সন্ নামক একজন ঐশ্বর্য্যশালী রূপবান্ যুবক তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের অংশীদার হইলেন। অংশীদার হওয়া ভিন্ন জন্‌সনের হৃদয়ে আর কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল কি না ভগবানই জানেন, কিন্তু সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য ক্রমশঃই বাহির হইয়া পড়িল। লোকে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, জন্‌সন কেবল ফস্‌টারের মুদ্রাযন্ত্রের নয়, কন্যারত্নেরও অংশীদার হইবার দাবী করিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই লুসি জন্‌সনের নিকট হইতে অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাইয়াছে। লুসির পিতার নিকটও এ বৃত্তান্ত গুপ্ত নাই। কিন্তু জন্‌সনের মত ধনী, মানী ও রূপবান্ জামাতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারও বলবতী ছিল। লুসি কিন্তু জন্‌সনের ভালবাসা চাহিত না। সে স্বাধীন হইলে উপহারের জিনিষগুলি এতদিন অবজ্ঞার সহিত ফিরাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু পিতা রাগ করিবেন বলিয়া পারে নাই।

একদিন সামান্য কারণে জন্‌সন জ্যাক্‌কে অত্যন্ত অপমান করিল।

জ্যাকের হৃদয়ে তাহা শেলের মত বিঁধিল। ছুটীর পর অশ্রুসিক্তনয়নে সে ছাপাখানা হইতে বাহির হইল। পার্শ্বের ঘর হইতে লুসি ঐ ঘটনা সমস্ত দেখিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জ্যাকের সেই ময়লা হাত দু'খানি ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহার প্রভুকন্যার এই প্রকার দয়ায় জ্যাক্ বড় লজ্জিত হইয়া পড়িল, এমন কি প্রকাশ্যে সামান্য একটা শুষ্ক ধন্যবাদ দিতেও সাহসী হইল না।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। জন্‌সন উপর হইতে এ ঘটনা দেখিল। তাহার আর বুঝিতে বিলম্ব রহিল না যে, লুসি জ্যাকের প্রণয়প্রার্থী। তখন জ্যাক্‌কে এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করার সঙ্কল্প তাহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইল। হতভাগ্য জ্যাক্ ইহার কিছুই জানিল না।

জন্‌সনের কৌশলে বৃদ্ধ ফস্‌টারের কর্ণেও এ ঘটনা উঠিল। তিনি শুনিয়া তাহার কন্যাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিলেন। লুসি কোন কথাই কহিল না, কেবল সমস্ত রাত্রি নীরব অশ্রুজলে তাহার উপাধান সিক্ত করিল।

৩

প্রাতঃকালে জ্যাক্ প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া বাহিরে একখানি ছোট কেদারার উপর বসিয়া আছে, এমন সময়ে দেখিল দূরে লুসি আসিতেছে। জ্যাক্ দেখিল, প্রাতে তাহার চেহারাটি ঠিক শিশিরে ভেজা শিউলি ফুলের মত দেখাইতেছে।

লুসিকে দেখিলে জ্যাক্ বড় ব্যস্ত হইয়া উঠে কারণ কি করিয়া ভদ্র-মহিলাকে অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহা সে জানে না। লুসি তাহাকে অন্য চক্ষে দেখে। যতক্ষণ সে জ্যাকের সহিত থাকে ততক্ষণ যে ভুলিয়া যায় আমি ধনী ও জ্যাক্ দরিদ্র।

লুসি তাহার কাঁধে হাত দিয়া আর একখানি ছোট কেদারায় বসিল। আজ কি জানি জ্যাক্‌ও লুসির হাতখানি তুলিয়া ধরিল। লুসির হৃদয়ে তড়িৎ বহিল, আনন্দের উৎস ছুটিল। তখনও অভাগা জ্যাক্ জানে নাই, তাহার সর্ব্বনাশ সন্নিকট। লুসি জ্যাক্‌কে তাহার আসন্ন বিপদের কথা বলিল। জ্যাক্ এই দুঃসংবাদ শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

অফিসে গিয়া শুনিল যে, তাহার চাকুরী গিয়াছে,—এ নিদারুণ সংবাদ

সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল,—উপরন্তু তাহার এই গ্রাম ত্যাগ করিবার আদেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় আদেশ শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইল। কিন্তু কি করিবে জমিদারের আদেশ!

আপিস হইতে ফিরিবার সময় জ্যাক দেখিল যে, অশ্রুভারাক্রান্ত দুইটী নীল চক্ষু উপর ঘরের জানালা দিয়া কাহার প্রত্যাশায় চাহিয়া আছে। জ্যাক্ বুঝিল যে, সে আজ তাহার পিতার গৃহে বন্দিনী। সে রাস্তা হইতে টুপি খুলিয়া বিদায় লইল, এ বিদায় হয়ত জন্মের মত। লুসিকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। লুসির প্রতি তাহার যে কত অনুরাগ, আজ তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

জ্যাক্ একবার দূর হইতে নিজের ক্ষুদ্র কুটীরখানি দেখিয়া, অজ্ঞাতবাসে চলিল। দূরে স্বচ্ছসলিলা অনাবিল স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল, এইখানেই একদিন লুসি ডুবিয়াছিল জ্যাক্ তাহাকে তুলিয়াছিল।

৪

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সামান্য গ্রাম্য বালক জ্যাক্ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ক্রয়ডনে আসিয়া নিজের অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে একটি বড় চাকুরী পাইয়াছে। এখন আর সে সামান্য লোক নহে, সে এখন ক্রয়ডনে একজন ধনী বলিয়া বিখ্যাত। এত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও সে এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী নহে। লুসীর সেই সুন্দর মুখ, সেই সরল কটাক্ষ সদাই মনে পড়ে। এখানে লুসি নাই, কিন্তু আছে তাহার স্মৃতি। লুসির বিচ্ছেদে জ্যাক্ যে এত যন্ত্রণা পাইবে তাহা সে পূর্ব্বে ভাবে নাই। সে ভাবিত সময়ের শীতল প্রলেপে লুসির হৃদয় হয়ত শান্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের ক্ষত কি প্রশমিত হইবে!

শেষ বয়সে বৃদ্ধ ফস্টারের অদৃষ্টে বিধাতা অনেক দুঃখ লিখিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই উদ্ধত অনশনের দোষেই ফস্টারের ছাপাখানা "ফেল" হইল। অবশেষে নিলামে সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। বৃদ্ধ তখন তাঁহার কন্যাকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ক্ষুদ্র গৃহে আশ্রয় লইলেন। জনগণ ইঁহাদের এই দারুণ দুরবস্থাতে কোন সাহায্যই করিল না।

লুসি গ্রাম্য সার্কাসে থাকিয়া আপনার ও পিতার জীবিকা নির্ব্বাহ

করিত। তাহার পিতা তখন রুগ্ন শয্যায় শায়িত। জরীবার ও তাহার কন্যার কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!

ঘটনাক্রমে ক্রয়ডন হইতে আর একটা সার্কেসের দল এই সহরে আসিল। মানসিক অশান্তিগ্রস্ত জ্যাক্‌ও দেশভ্রমণের জন্য এই সার্কাসের দলের সঙ্গে আসিয়াছিল।

জ্যাক্ ভাবিল, লুসি এখন জন্‌সনের গৃহিণী, তাহাকে দেখিলে লুসির হৃদয় হয়ত বিচলিত হইতে পারে, সেইজন্য সে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে খেলা আরম্ভ হইল। স্থানীয় ভদ্রলোক ও গ্রাম্য বালকগণ দলে দলে সার্কাস দেখিতে আসিল। রঙ্গভূমি লোকে লোকারণ্য।

কয়েকটি খেলা হইয়া যাইবার পর একটি ধনী ব্যক্তির পরামর্শানুসারে তাম্বুর ভিতর একটি তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খাটান হইল। ঠিক তারের নীচে একটি বড় খাঁচার ভিতর দুইটি ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্র উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইল। এই পিঞ্জরের উপর দিক্ খোলা, তারটি তাহার মধ্যস্থলের উপর দিয়া গিয়াছে। এইরূপে রঙ্গভূমি সজ্জিত করিয়া সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন,—যে এই তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, সে এই ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে।

সার্কাসের ভিতর হইতে কোন ব্যক্তিই এই অসমসাহসিক কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল না।

অবশেষে দর্শকবৃন্দের ভিতর হইতে একটি মলিনবেশা রুক্ষকেশা যুবতী পুরস্কারের লোভে এই কার্য্যে সম্মত হইল। কেহই তাহাকে এ কার্য্য হইতে বিরত করিতে সমর্থ হইলেন না। যুবতী স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

জ্যাক্ খেলাঘরের একপ্রান্তে বসিয়াছিল। সে এই যুবতীর অসমসাহসিকতা দেখিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া বসিল। তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল, তাহার বোধ হইতেছিল যেন এ যুবতী তাহার স্বদেশের। চক্ষুর উপরে হস্ত দিয়া সে এই যুবতীকে ভাল করিয়া দেখিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু সম্মুখের উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

যুবতী সিঁড়ি দিয়া তারে উঠিল, তার পর একবার দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিয়া সেই সূক্ষ্ম তারের উপর দিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল।

রঙ্গভূমি নীরব। নিঃশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছিল না। সকলেরই দৃষ্টি তারের উপর দিয়া গমনশীলা যুবতীর দিকে।

রমণী তারের মধ্যস্থল অতিক্রম করিল। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি মৃদু পবন-হিল্লোলে দুলিতেছিল। নিম্নে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রদ্বয় শিকারের আশায় উপরের দিকে চাহিয়াছিল।

জ্যাকও চাহিয়াছিল। সে একবার ভাবিল, এ যুবতী লুসি। আবার ভাবিল, তাও কি সম্ভব?

যুবতী প্রায় তারের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় দর্শক-বৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া করতালি দিয়া উঠিল। সেই শতসহস্র কর-তালির গভীর নিনাদ তাম্বুর ভিতর প্রতিধ্বনিত হইল। এই প্রশংসা-ধ্বনিতে যুবতী একটু টলিল; তার পর, তার পর নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া সশব্দে খাঁচার ভিতর পড়িয়া গেল। দর্শকগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাম্বুর ভিতর একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ব্যাঘ্রদ্বয় ভীত হইয়া একটু দূরে সরিয়া যাইল।

জ্যাক্ এইবার চিনিল। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া, ছদ্মবেশ দূরে ফেলিয়া, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বিপন্না যুবতীকে বাঁচাইবার জন্য খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিল। একহস্তে তাহার প্রণয়িনীকে বেষ্টন করিয়া অপর হস্ত দ্বারা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাহিরে আসিল।

উভয়েই ব্যাঘ্রের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, বাঁচিবার আশা কাহারও নাই

এই মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারিল।

লুসি জড়িতকণ্ঠে বলিল, "জ্যাক্ অর্থের অভাবে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। পিতা রুগ্ন শয্যায় শায়িত। জনুসনের জন্যই আজ পিতার এই দুর্দ্দশা! ছাপাখানা "ফেল" হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া সে তাহার হাত জ্যাকের রক্তাক্ত দেহের উপর রাখিল। ব্যাঘ্রের নখরাঘাতে জ্যাকের কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহার মৃত্যুশ্বাস বহিতেছিল। সে আনন্দে লুসির হাতের উপরে হাত রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একবার মাথা তুলিবারও চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা লুটাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণ-বায়ুও বাহির হইয়া গেল।

তারপর ডাক্তার আসিয়া দেখিল, লুসির দেহেও প্রাণ নাই। প্রণয়ীর বুকের উপর হাত রাখিয়া সেও চিরবিদায় লাভ করিয়াছে!

জ্যাক ও লুসির মৃতদেহের সম্মানের জন্য দর্শকমণ্ডলী মাথার টুপী খুলিল। খুলিল না কেবল একজন,—সে সেই পুরস্কার-দাতা ছদ্মবেশী জনসন্। লোকটা কি নিষ্ঠুর!

শ্রীভূপেন্দ্রলাল রায়।

প্রতিধ্বনি।

—:•:—

ব্রাহ্মণ-সমাজ—ফাল্গুন, ১৩২০ সাল।

বিগত ফাল্গুনের "ব্রাহ্মণ-সমাজ" নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি তল্লিখিত "বিজ্ঞান চর্চ্চা ও আর্য্যধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের একস্থলে 'অভুক্ত অবস্থায় কেন উপাসনা কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে" তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উপাসনার সময় আর্য্য ঋষিগণ উপবাসের বিধান করিয়াছেন। এই বিধানের প্রতি আধুনিক সংশয়বাদীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। কিন্তু নাসিকা কুঞ্চন করিলে ত চলিবে না! আমাদের ঋষিগণের এক একটী সিদ্ধান্ত যে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আজিকালি লোকে ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছে। এরূপ অবস্থায় সুরেন্দ্রবাবু পূজোপাসনার পূর্ব্বে উপবাসের নিয়ম সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

আহারের পর পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্যাদির বিবিধ রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা প্রচুর পরিমাণ তাড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। উক্ত তাড়িৎশক্তি সমস্ত শরীরে মুক্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের শক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ক্রমে মস্তিষ্ক এত সবল হইতে থাকে যে মানসিক সূক্ষ্মচিন্তার যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে। আবার শরীর বিজ্ঞানে বর্ণিত আছে যে আহারের পর কোন বিষয় চিন্তা করিলে মস্তিষ্ক পরিচালিত হয়। সুতরাং শোণিত-প্রবাহ মস্তিষ্কাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে বলিয়া পরিপাককার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। বস্তুতঃ শরীর বিজ্ঞানের এই উক্তি পরোক্ষে আমাদের কথারই সমর্থন করিতেছে। কারণ দার্শনিকদের মতে মন ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ এরূপ ভাবে সংবদ্ধ যে কাহারও স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। যাহা হউক যিনি যে ভাবেই কথাটি গ্রহণ করুন না কেন মোটের উপর ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে আহারের

পর কোন সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করা উচিত নহে। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যসন্তানের পক্ষে ইহাতে চিন্তিত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক বোধ জন্মিতে পারে না। অপর পক্ষে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভুক্তাবস্থায় কোন আরাধ্য বিষয় চিন্তা করা কোনমতেই বিধেয় নহে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ এইজন্যই ভুক্তাবস্থায় উপাসনা কার্য্যে ব্রতী হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এস্-সি।

সাহিত্য—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২০ সাল।

গত ফাল্গুন-চৈত্রের যুগ্মসংখ্যা "সাহিত্যে" "দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটী "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় মনস্বী কিশোরী চাঁদ মিত্রের এক ইংরাজী নিবন্ধ হইতে অনূদিত। অনুবাদকের নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছিল,—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখের "ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে", আর হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন শুক্রবারে। মনস্বী কিশোরীচাঁদ হরিশ্চন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং হরিশ্চন্দ্র-সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্নিবেশ সম্ভব। মন্মথবাবু উহা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এ যুগে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি অনেকেই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন, এ যুগের নব্য যুবক-দলে তাঁহার নাম একেবারেই নাই বলিলে চলে। তাই বলিতেছি, মন্মথ বাবু এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবন-কথা বাহির করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের উপকার করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রের কথা স্মৃতি পথে উদিত হইলেই প্রথমেই নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী আমাদের মনে পড়ে :—

"নীল বাঁদরে সোণার বাংলা কল্লে ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'লো লংএর হলো কারাগার॥"

বাস্তবিকই হরিশ্চন্দ্র দরিদ্র বাঙ্গালী কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে প্রকার বিপুল পরাক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত নীলকরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে আজও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে নূতন শক্তি ও নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল, যে যুগে বাঙ্গালীর মনে দেশাত্মবোধের অভিনব বিকাশ হইতেছিল, যে যুগে বাঙ্গালীর সকল

চেষ্টা ও উদ্যম রাজপুরুষদিগের সানুগ্রহ সমাদর হইতে বঞ্চিত হইত না, হরিশ্চন্দ্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আনন্দের কথা বাঙ্গালী এখনও তাহা বিসর্জ্জন দেয় নাই; বরং হৃদয়-মন্দিরে তাহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই অসাধারণ মহাপ্রাণ পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের জীবন-কথার কিয়দংশ আমরা 'সাহিত্য' হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া 'অর্ঘ্যে'র পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম:—

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতামাতা হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। হরিশ্চন্দ্রের সাত বৎসর বয়:ক্রমের সময় তাঁহারা তাঁহাকে বহুবিষয়ে পারদর্শী ও ধর্ম্মশীলতার জন্য বিখ্যাত স্বর্গীয় রেভারেণ্ড মি: পিফার্ডের তত্বাবধানে পরিচালিত ইউনিয়ম স্কুল নামক মিশনরী (অথবা স্বাধীনভাবে পরিচালিত) বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এইখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি আট বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্বাবধায়ক মি: পিফার্ডের সস্নেহ ব্যবহারে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিষ্টার পিফার্ডের সেই সতত স্নেহশীল ও সদয় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর কৃতজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলীন হয় নাই। একদিন আমাদিগের বাটীতে কলিকাতা বারের মিষ্টার সি, পিফার্ডের সহিত হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কোনও প্রশ্নের উত্তরে মি: পিফার্ড বলেন, তিনি রেভারেণ্ড মি: পিফার্ডের পুত্র। ইহা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুবারি উথলিয়া উঠিয়াছিল।

বাল্যে হরিশ্চন্দ্রের যে প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহা আশাতীতরূপে বিকশিত হইয়াছিল। * * * *

১৮৩৯ খৃ: তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর হিন্দু কলেজের উচ্চবৃত্তির জন্য (Senior Scholarship) পরীক্ষা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বিনাবেতনে শিক্ষালাভ ব্যতীত অন্য কোনও রূপে কলেজের উচ্চশিক্ষালাভের অন্তরায় হওয়াতে, তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে তিনি তৎকালীন নীলামদার টলা এণ্ড কোম্পানীর আফিসে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪৮ খৃ: অব্দে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের

অফিসে একটী কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায় ইহার জন্য তিনি আবেদন করেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা মাত্র; কিন্তু প্রার্থী অনেক ছিলেন। তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইল; কারণ, তখন এই পরীক্ষাগ্রহণের বাতুলতা (Mania) আরম্ভ হইয়াছে। মিষ্টার জর্জ্জ কেলনার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল একটী প্রবন্ধরচনা এবং পাটীগণিত। সমস্ত কাগজ দেখিয়া মিষ্টার কেলনার হরিশ্চন্দ্রের উত্তরপত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তিনি কেরাণীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই কেরাণীজীবনের প্রভাব, যাহা সচরাচর প্রতিভা নির্ব্বাপিতপ্রায় করে, হরিশ্চন্দ্রের মানসিক গঠনের উপর তাদৃশ অনুৎসাহজনক অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। উহা তাঁহার সুন্দর বলিষ্ঠ প্রতিভা নির্ব্বাপিত করে নাই, করিতে পারে নাই। কিছু কিছু খর্ব্ব করিয়াছিল। তাঁহার উর্দ্ধতম কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মনিপুণতা স্বীকার করিলেন; এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রকে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত উচ্চজ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বহুবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। এইরূপ একজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই নিজের সংগ্রহ হইতে ও কলিকাতা পব্‌লিক লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনাইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতেন। অধিকাংশ হিন্দুযুবক, যাঁহারা বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত পুস্তকাদির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা তিনি কত বিপরীত ভাবাপন্ন ও কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরিচালিত একটী সাময়িকপত্রে তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশিত হইল। "বেঙ্গল রেকর্ডারে" তাঁহার প্রথম রচনাশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "হিন্দুপেট্রিয়ট"-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সাহিত্যজগতে তিনি যশঃ অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার সম্পাদকত্বে "হিন্দুপেট্রিয়ট" শীঘ্রই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ইহা দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ হইল, এবং সাধারণ বিষয়ে লোক-মত অবগত হইবার জন্য উৎসুক গবর্মেণ্টের নিকট রাজভক্তি-বিজ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ হইল।

'হিন্দুপেট্রিয়ট' সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছে, এবং অত্যাচারীর বিপক্ষে অত্যাচারিতের পক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহার সাধারণ ও রাজনীতিক বিষয়সমূহের আলোচনায় অসাধারণ দক্ষতা ও বিচারশক্তি প্রকটিত হইত। মাকুইস্ অব্ ড্যালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী নীতি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ হরিশচন্দ্রকে সম্পাদক-শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পর সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের নৃশংস অত্যাচারে ইংরাজগণের ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে উত্তেজিত, এবং তাঁহাদিগের বিচারশক্তি খর্ব্ব করিল। তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিলম্বে প্রতিহিংসা-গ্রহণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে 'পেট্রিয়ট' এই সকল উন্মত্ত ব্যক্তিগণের ও ভীত জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অমূল্য উপকারসাধন করিয়াছিল। যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব্ব সঙ্কটকাল উপস্থিত, এবং বে-সরকারী ইউরোপীয়গণ লর্ড ক্যানিংয়ের পদচ্যুতির প্রার্থনা এবং দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছিলেন, তখন পেট্রিয়ট এই উন্মত্ত ও অজ্ঞান আন্দোলনকারিগণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, দেশবাসিগণকে গবর্মেণ্টের পক্ষে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নীলকর-আন্দোলনে এই স্বদেশহিতৈষী (Patriot) যে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতার অন্যতম কারণ। আমাদিগের সহযোগী দুর্ব্বল প্রজাগণের একজন ধর্ম্মনিপুণ, উপযুক্ত ও নির্ভীক পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অশেষবিধ দৃষ্টান্তসংবলিত আক্রমণের প্রতিবাদ নীলকরগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

ইতিহাস-সংগ্রহ।

—————:০:—————

হিন্দুদিগের ইতিহাস ও জীবন-চরিত লিখিবার রীতি ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারতে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের কতক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। আর রাজ-তরঙ্গিণী, রাজাবলী এবং মাদল পঞ্জীতে কাশ্মীর রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য এবং উড়িষ্যা রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজপুতানার ভট্ট-কবিতা হইতে রাজপুত রাজাদের ইতিহাস জানা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই ভাট ছিল। তাহারা স্বদেশের এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের রাজগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া কবিতা রচনা করিত। কিন্তু তাহা বোধ হয় পুস্তকাকারে ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত হইত না। আর তাহাও এখন প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ঘটকেরা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-বংশের কুল-পর্য্যায় লিখিতেন। কিন্তু সেইসকল শাস্ত্র-পাঠে কেবল ঐ সকল বংশের কুলগৌরবই জানা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয় কিছুই জানা যায় না।

দৃষ্টান্ত।

"তাহার পর বলরাম সান্যাল এবং গোপীনাথ মৈত্রে করণ। বলরাম সান্যাল কুলপতির সন্তান, কাপ কুলের চূড়ামণি হরিপুরের চৌধারীতে টুট আর গোপীনাথ মৈত্র হাপানিয়ার মৈত্র গাঁইকর্ত্তা কুলীনের সন্তান, কাপকুলের চূড়ামণি লালোরের চৌধারীতে ভঙ্গ। সুতরাং এই দুই মহাপুরুষের যে করণ সে মণিকাঞ্চনের যোগ বলা যায়।"

এই বৃত্তান্ত হইতে উভয় পক্ষের গুণ, কর্ম্ম, ব্যবসায় বা অবস্থা কিছুই জানা যায় না। এমন কি কাহার কন্যার সহিত কাহার পুত্রের বিবাহ হইল তাহাও জানা যায় না। সুতরাং কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প ছিল

এখন কুলগৌরবের অনাদর হওয়াতে কুলশাস্ত্রও ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। সুতরাং লিখিত পুস্তকাদি হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা জাতীয় ইতিহাস-রক্ষার্থ একটী সদুপায় করিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্য কোন দেশের কোন জাতিমধ্যেই নাই। বংশরক্ষা করা হিন্দুদের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কাহারও ঔরস-পুত্র না হয় তবে দত্তকাদি কৃত্রিম পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা করিতে হয়। বংশের নাম ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-লোপ হওয়া মহাপাপ। শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা প্রণোদিত হইয়া হিন্দুরা বংশরক্ষা ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতি প্রাচীন বেদ-পুরাণে যে সমস্ত ঋষি ও রাজার নাম দেখা যায়, এখনও তাঁহাদের বংশধর বিদ্যমান আছে। বংশ-পরিচয় জন্য হিন্দুর যাবতীয় যজ্ঞাদিতে যজমানের গোত্র এবং প্রবর উল্লেখ করিতে হয়। তজ্জন্য সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কর্ত্তাগণ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বালকদিগকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম, গোত্র, প্রবর এবং বংশপরিচয় শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু তাহার পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত জানিত। প্রত্যেক হিন্দুসন্তান তদ্‌বংশের একখণ্ড জীবন্ত ইতিহাসস্বরূপ ছিল। ইদানীং ইংরাজী-চর্চ্চার আধিক্যে বংশপরিচয় শিক্ষা কম হইতেছে, তথাপি এখনও হিন্দুসন্তান নিজ বংশপরিচয় অন্য জাতি অপেক্ষা বেশী জানে। দেশীয় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা দেশের ইতিহাস লেখাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমি সেই উপায়েই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস লিখিয়াছি এবং অবশিষ্ট সংগ্রহ করিতেছি। অন্য কোন উপায়ই তত্তুল্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান করি না।

বাঙ্গালার ইতিহাস-সংগ্রহ জন্য আমিই সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং তদন্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা সংস্কৃত, পারসী বা ইংরেজী পুস্তকের লিখিত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা কেহই নিজে তদন্ত করিয়া কোন বৃত্তান্ত লেখেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামগতি ন্যায়রত্নের প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ত কেবল পরানুগমন মাত্র।

আমার পরে অনেক বাঙ্গালী স্বদেশের ইতিহাস-সংগ্রহে চেষ্টিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায় এবং তাঁহার সুবিজ্ঞ সহকারী অক্ষয়কুমার মৈত্র সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা বহু ব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে বহুসংখ্যক

শিলালিপি ও তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারের যে উপায় করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাঁহাদের একটি গুরুতর ভ্রম আছে। তাঁহারা কেবল লিখিত দলীলই প্রামাণ্য বোধ করেন, বাচনিক কিংবদন্তী কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না। এই ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাঁহারা ধারাবাহিক ইতিহাস কদাচ সংপূরণ করিতে পারিবেন না।

মনুষ্যেরা যেমন মিথ্যা কথা বলিতে পারে এবং নানা কারণে বলিয়া থাকে, তেমনি তাহারা মিথ্যা কথা লিখিতে পারে এবং নানা কারণে লিখিয়া থাকে। সুতরাং বাচনিক প্রমাণাপেক্ষা লিখিত প্রমাণ অধিক বিশ্বাস্য জ্ঞান করিবার কোন কারণ নাই।

সুরচিত মিথ্যা গ্রন্থ চিরস্থায়ী হইতে পারে। যেমন মেঘদূত, পদাঙ্কদূত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী. বিদ্যাসুন্দর এবং বঙ্কিমের নভেলসমূহ মিথ্যা গল্প হইলেও চিরস্থায়ী হইয়াছে। বাচনিক মিথ্যা গল্প দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। সুতরাং পুরাতন কিংবদন্তীগুলি লিখিত গ্রন্থাপেক্ষা সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। সেই কিংবদন্তীর সাহায্য ব্যতীত আমাদের দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে না। শিলালিপি, তাম্রফলক, অনুশাসনপত্রাদির দ্বারা যে যে ঘটনা জানা যায়, তদ্দ্বারা ইতিবৃত্ত-সংগ্রহের সাহায্য হয় মাত্র; কিন্তু তাহা দ্বারা ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। শিলালিপি-তাম্রফলকাদির লেখকগণ রাজার অনুগত লোক। তাহারা রাজার সন্তোষার্থ অনেক মিথ্যা প্রশংসা-বাক্য লিখিয়া থাকেন। সেই সমস্ত দ্যোতক বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবার ঐসকল লিপির অনেক অক্ষর বিকৃত হইয়া গিয়াছে তাহা ভালরূপ বুঝা যায় না। এখন তাহার যে পাঠ উদ্ধার করা হয় তাহা প্রকৃত কি না ঠিক বলা যায় না। এই সকল কারণে ঐসকল লিখিত দলীল যে বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য তাহা আমি স্বীকার করি না।

আজকাল অনেক ইংরাজী শিক্ষিত লোক বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের বিবরণী হইতে ভারতের ইতিহাস-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য বহুব্যয় ও পরিশ্রমে চীনা, গ্রীক, রোমান ও আরবী পর্য্যটকদের লিখিত বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও অনুবাদ করিতেছেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করি ঈদৃশ বিবরণী নিতান্ত অপকৃষ্ট প্রমাণ; উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য।

চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়াং ও হিউংসাং প্রভৃতি পালি ভাষা ভিন্ন ভারতবর্ষীয় কোন ভাষা জানিতেন না। বিদেশীয় বিজাতীয় লোক হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। সুতরাং অনেক বিষয়েই তাঁহাদের ভ্রম হইতে পারে। পরন্তু তাঁহারা যে লিখিয়াছেন, "অমুক রাজ্য ও অমুক নগরের আয়তন এত লি এবং লোকসংখ্যা এত" তাহা তাঁহারা স্বয়ং গণিয়া বা মাপিয়া লেখেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় লোকের নিকট শুনিয়া অথবা অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্ত দেশীয় কিংবদন্তী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যতীত উৎকৃষ্ট প্রমাণ নহে।

এখন যে সকল ইতিহাস ও লিখিত বিবরণী পাওয়া যায় তৎসমস্তই বাচনিক কথা-মূলক। যত পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহার গ্রন্থকারগণ কেহই সমস্ত বৃত্তান্ত স্বয়ং দেখিয়া লেখেন নাই। তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত পরমুখে শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বাচনিক প্রমাণগুলি বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, যাবতীয় লিখিত গ্রন্থাদিও বাচনিক প্রমাণ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। হিরডটাস, টাসিটস, প্লুটার্ক, ফেরেস্তা, ফর্জ্জন্দ হোসেন প্রভৃতি পুরাতন ঐতিহাসিকগণ দশ দিন পূর্ব্বে বাচনিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; আমি পরবর্ত্তী কালে সেই উপায়ে ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছি। আমার ইতিহাস পরবর্ত্তী লোকের পক্ষে লিখিত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। অথচ বাচনিক প্রমাণ সকল ইতিবৃত্তেরই মূল ভিত্তি। অপিচ চীন, রোম্ ও আরবদেশীয় পর্য্যটকগণ হিন্দুসমাজে মিশিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহাদের লিখিত আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিসংকুল।

গ্রীক ও পর্টুগিজ জাতি প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী। যদি তাহাদের লিখিত গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু সত্য কথা থাকে, তাহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আমার শৈশবকালে যখন রেল ছিল না, টেলিগ্রাফ ছিল না এবং ডাকঘরের অবস্থা ভাল ছিল না; সেই সময়ে আমাদের গ্রামের দুইজন লোক পদব্রজে গৌহাটী কামাখ্যা তীর্থে গিয়াছিল। তাহারা আসাম দেশ-সম্বন্ধে অসংখ্য অদ্ভুত গল্প করিত। অধিকন্তু তাহারা বলিত যে, গৌহাটী হইতে উত্তর মুখে তিন দিন হাঁটিয়া গেলেই বিলাতে (ইংলণ্ডে) পৌঁছান যায়। গ্রামের যাবতীয় অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোক ও বালকগণ তাহাদের গল্প শুনিতে যাইত। গ্রীক ও

পর্টুগিজদিগের লিখিত কিস্‌সাও ঐরূপ বিজিকিস্‌সা মাত্র। তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

অতএব স্বদেশ-প্রচলিত প্রবাদ এবং বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী সংগ্রহ ব্যতীত আমাদের দেশের ইতিহাস সম্পূরণ হইতে পারে না। উহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। উহাতে যে কোনরূপ মিথ্যা মিশ্রিত নাই, তাহা আমি বলি না। কিন্তু ইতিহাস গণিতশাস্ত্র নহে; তাহাতে অল্পমাত্র মিথ্যা মিশ্রিত থাকিলেও বিশেষ দোষ হয় না। সকল দেশের ইতিহাসেই ঐরূপ মিথ্যার সংযোগ দেখা যায়।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

সঙ্কলনী।

১। এডিসন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী।

আমেরিকার এডিসন সাহেবের নাম সভ্য-জগতে সুপরিচিত। ইনি গ্রামো-ফোন প্রভৃতি অদ্ভুত যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। যন্ত্রবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা আছে। তিনি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা শুনিলে সকলকে স্তম্ভিত হইতে হইবে।

মাটী অপেক্ষা সুলভমূল্যে সোণা।

এডিসন সাহেব বলেন, আজকাল সোণার যেমন দুর্ম্মূল্যতা রহিয়াছে, কিছু-দিন পরে সেরূপ আর থাকিবে না। সুবর্ণ আর বেশী দিন অকৃত্রিম থাকিবে না; শীঘ্রই কৃত্রিম হইবে; অর্থাৎ লোকে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে। তখন সেই মানুষের হাতে প্রস্তুত সোণা মাটীর চেয়েও সস্তা দরে বিকাইবে। ২৭ মণ সোণার দাম হইবে ৭৫৲ টাকা। তাহা হইলে দেখিতেছি, পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। কত কোটি কোটি টাকা যে সোণার অলঙ্কারে অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে, তাহা কে

বলিতে পারে! তখন সেই সকল প্রভূত মূল্যের স্বর্ণের কোনই মূল্য থাকিবে না। মানুষ তখন বুঝিবে, তুচ্ছ সোণার অলঙ্কারে এত টাকা আবদ্ধ করিয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়াছি! এ অর্থ মানুষের উপকারে লাগাইলে ভাল হইত।

নিকেলের পাত হইতে পুস্তক-মুদ্রণ।

নিকেল সকলেরই নিকট সুপরিচিত। ইহা একপ্রকার নবোদ্ভাবিত মিশ্রিত ধাতু। রৌপ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। আজকালি প্রায় সমুদয় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যই নিকেল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চশমার ফ্রেম, ছুরির বাঁট, বোতাম, ঘড়ির কেস, চেন, ছোট ছোট বাক্স হইতে এত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিকেল হইতে তৈয়ারী হয় যে, তাহাদের সকলের নাম করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাউক, এক্ষণে বিজ্ঞানাচার্য্য এডিসন সাহেব বলিতেছেন, নিকেল হইতে এত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায় যে, উহা এক ইঞ্চির বিশ হাজার ভাগের এক ভাগ পুরু হয় মাত্র। আজকাল যে প্রকারের কাগজে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, এই নিকেলের পাত বা কাগজ তাহা অপেক্ষা আরও পাতলা, নরম এবং সস্তা হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দুই ইঞ্চি পুরু পুস্তকে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা হইতে পারে। অথচ উহা কাগজের পুস্তক নহে, উহা নিকেলের পুস্তক। ছাপিবার কালী দ্বারাই ঐ নিকেলের কাগজ ছাপা হইতে পারিবে। চল্লিশ হাজার নিকেলের কাগজ-যুক্ত পুস্তকের ওজন ঠিক এক পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আধসের হইবে। এডিসন সাহেব বলিতেছেন, এক পাউণ্ড ওজনের নিকেলের কাগজ আমি ৩৸০ তিন টাকা বার আনায় তৈয়ারী করিয়া দিতে পারি। এডিসনের একথা কার্য্যে পরিণত হইলে মুদ্রণ-ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। ৪০,০০০ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট একখানা ডবল ক্রাউন আকারের ১৬ পেজী পুস্তক মুদ্রিত করিতে ২৫০০ খানা (ডবল ক্রাউন) কাগজ খুব নিকৃষ্ট হইলে অন্ততঃ ২৷৷০ টাকা রিমের কমে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না, আর যদি ১০৲ টাকাতেও ৫ রিম অর্থাৎ ২,৫০০ খানা কাগজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে এডিসন সাহেবের নিকেলের কাগজ ত তাহার প্রায় তিন ভাগের একভাগ খরচে হইবে। এডিসনের এই নিকেলের কাগজ প্রস্তুত হইলে আরও অল্পব্যয়ে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে গ্রন্থাদির মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীতে সে নূতন যুগ কবে আসিবে?

যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি।

যন্ত্র-বিজ্ঞান ও কল-কারখানায় কিরূপ উন্নতি হইবে, এডিসন সাহেব [illegible] ও [illegible] আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, কলের [illegible] ক [illegible] কাপড়, বোতাম, সূতা, পাতলা কাগজ ও পিচবো[illegible] লে অপর দিক হইতে পোষাক তৈয়ারী ও একেবারে প্যাক্ হইয়া কল হইতে বাহির হইবে। কল হইতে একেবারে পুস্তক মুদ্রিত ও বাঁধাই হইবে। যে কলে কাঠের গুঁড়ি দেওয়া হইবে, সেই কল হইতেই কাষ্ঠের আসবাব অর্থাৎ আলমারি, দেরাজ, টেবিল প্রভৃতি বাহির হইবে। এক্ষণে কলে যেমন দ্রব্যাদির ভিন্ন ভিন্ন অংশ-গুলি মাত্র তৈয়ারী হয় এবং পরে লোকে সেই বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর জুড়িয়া দেয়, তখন আর সেরূপ হইবে না; মানুষের হাতের সাহায্য একেবারে দরকার হইবে না, একেবারে কল হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া বাহির হইবে।

পরিচ্ছদের অ'শাতীত সুলভ মূল্য।

এডিসন সাহেব বলিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্রাদির এমন উন্নতি হইবে যে, পোষাকের আর দুর্ম্মূল্যতা থাকিবে না। যে কোন ব্যক্তি অক্লেশে বৎসরে চারি পাঁচটা সুট করিতে পারিবে। সেই নূতন যুগে বর্ত্তমানের মত মূর্খ ও কায়িকপরিশ্রমনিরত স্থূলবুদ্ধি কৃষাণের দল আর থাকিবে না। তাহাদের স্থলে আর এক দল কৃষকের আবির্ভাব হইবে; তাঁহারা একাধারে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ, ভূমি-সম্বন্ধীয় রসায়নশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও অল্পব্যয়ে কৃষিকর্ম্ম-পরিচালন-ক্ষম হইবে এবং তাহারা ব্যবসায়-বুদ্ধিতেও পারদর্শিতা দেখাইবে।

মানুষ মৌমাছির মত উড়িবে।

এখনকার "উড়ো কল" সম্বন্ধে এডিসন সাহেবের এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ মৌমাছির মত উড়িবে। তিনি বলেন, মৌমাছিরা বেশ ভালরূপ উড়িতে পারে। তাহাদের দেহের আকৃতি ও ভারের তুলনায় তাহাদের ডানা অপেক্ষাকৃত ছোট; মৌমাছি অতিদ্রুত পক্ষ সঞ্চালন করিতে পারে বলিয়াই তাহারা এত সুন্দরভাবে উড়িতে পারে। তিনি বলেন যে, বাতাসে যদি খুব তাড়াতাড়ি আঘাত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বায়ুমণ্ডল ইস্পাতের মত কঠিন হইয়া পড়ে। মৌমাছিরা গুন্ গুন্ শব্দ করিতে করিতে সেই শব্দ তরঙ্গগুলিকে তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেয়। মৌমাছিরা বাতাসকে কঠিন করিবার জন্য অতি দ্রুত পক্ষ সঞ্চালন করে এবং এইজন্য তাহারা বেশ উড়িতে পারে। মানুষকে শূন্যে নিরাপদে

এবং দ্রুত উড়িতে হইলে মৌমাছিদের নিকট হইতে এইরূপ উড়িবার কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে। "উড়ো কল" সকল এইভাবে তৈয়ারি করিতে পারিলে তবে খুব দ্রুত উড়া যাইবে ; এমন কি, শীঘ্রই মৌমাছির অনুকরণে যে "উড়ো কল" তৈয়ারি হইবে, তাহা যাত্রী লইয়া অনায়াসে ঘণ্টায় এক শত মাইল উড়িয়া যাইবে।

যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের অবসান।

এডিসন সাহেব যে এক প্রকার ষ্টোরেজ ব্যাটারী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থাকিলে দুর্ভেদ্য দুর্গের কার্য্য করিবে। তখন রণতরী-নির্ম্মাণের আর কোন আবশ্যকতা থাকিবে না। পৃথিবীতে এত রাশি রাশি যুদ্ধের উপকরণ ও সমরাস্ত্র সঞ্চিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা জগতে একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। হয় ত ভবিষ্যতে আর দুই একটা মহাসমর সংঘটিত হইবে, তাহার পর যুদ্ধ একেবারে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কারণ, বর্ত্তমানে যত প্রকার লোকসংহারক অস্ত্রাদি বাহির হইয়াছে, সেগুলি একযোগে কার্য্য করিলে জগৎ হইতে মনুষ্যজাতির বিলোপের বড় বেশী বিলম্ব থাকিবে না। ইহার পর হেগের শান্তি-সমিতিই জগতের সভ্য-জাতিসমূহের বিরোধ মিটাইয়া দিবেন। দারিদ্র্যের সম্বন্ধে এডিসন সাহেব বলিয়াছেন যে, আর এক শত বৎসর পরে পৃথিবী হইতে দারিদ্র্যের অবসান হইবে।

২। ফুটবলের ইতিহাস।

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই ফুটবল খেলা হইয়া থাকে। ফুটবল ভারতীয় ক্রীড়া না হইলেও এদেশে ইহার আধিপত্য বড় কম নয়। যে ফুটবল-ক্রীড়া এক্ষণে জগতে এরূপ ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে, এইখানে তাহার ইতিহাস-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না।

ইংলণ্ড যখন রোমকদিগের শাসনাধীন, তখন রোমকেরা তথায় ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তন করেন। তখন এখনকার মত চামড়ার ফাঁপা ফুটবল ছিল না। তখন কাপড়ের বল বা চামড়ার বলের উপর পশম মুড়িয়া অথবা চামড়ার থলিতে বায়ু পুরিয়া তাহাই লইয়া খেলা হইত। তাহার পর ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই খেলার ক্রমোন্নতির ইতিহাস-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই ফুটবল খেলায় লোকের অনুরাগ বাড়িতে থাকে। ক্রিকেট খেলা অপেক্ষাও ফুটবল খেলা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন—ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উইলিয়াম ফিজ ষ্টিফেন নামক এক সাহেব ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের এক ইতিহাস-রচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সচরাচর যুবকেরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ফুটবল খেলায় প্রবৃত্ত হইত। এই খেলা তখন নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তখন উহা কোনরূপ নিয়মের অধীন ছিল না। নগর বা রাস্তার এক এক প্রান্তে এক একটা 'গোল' স্থাপিত হইত এবং দুই দলে অসংখ্য লোক খেলা করিত। তখন খেলার নামে উভয় দলে কেবল ঠেলাঠেলি, মারামারি, রক্তপাত ইত্যাদিই বেশী হইত,—খেলা যত হউক আর না হউক।

ফুটবল-খেলা ইংলণ্ডে লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেও তথাকার রাজপুরুষগণ তখন ইহাকে প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন না। এমন কি, ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ফুটবল-খেলা বন্ধ করিবার জন্য এইরূপ আইন করেন যে, যাহারা ফুটবল খেলিবে তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হইবে। ফুটবল-খেলা কেন বন্ধ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে তিনি এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন;—বড় বড় বল লইয়া খেলা করার জন্য সহরে অত্যন্ত গোলমাল হয়; যেসকল অনিষ্টকর কার্য্য ঈশ্বরের অননুমোদিত, ইহা দ্বারা সেই সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এই কঠিন রাজাদেশ সত্ত্বেও ফুটবল-খেলা বন্ধ বা উহার উন্নতির গতি হ্রাস হয় নাই। ইংলণ্ডের লোকে ইহাকে জাতীয় ক্রিয়া বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় এডওয়ার্ডও এই খেলা বন্ধ করিতে আদেশ দেন। দ্বিতীয় রিচার্ড এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণও এই খেলা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই খেলা বন্ধ করিতে ইংলণ্ডে যতই কঠোর আইন হইতে লাগিল, ততই ইহা জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজদণ্ডে কোন ফলই হইল না। এখনকার নৃপতিগণ যেমন ফুটবল-খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তখনকার নৃপতিগণ তেমনই ইহার প্রতিদ্বন্দ্বকতা করিতেন। যদিও তখন মূর্খ ও গোঁয়ার লোকেরাই এই খেলা করিত, মৃত্যু, সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতি ইহার নিত্য সহচর ছিল এবং বড়

লোকেরা যদিও ইহাকে সু-নজরে দেখিতেন না, তথাপি ইহা কেমন করিয়া যে এরূপ উন্নত ও সার্ব্বজনিক ক্রীড়ায় পরিণত হইল, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় যখন ইংলণ্ডে উন্নতির যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন একদল ফুটবল-ক্রীড়াকারীকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল; কারণ উহাতে খেলোয়াড়গণের মধ্যে সাংঘাতিক খুন-জখম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ষ্টাব্‌স (Stubbs) নামক এক সাহেব লিখিয়াছেন যে, ফুটবল-খেলা মানুষের খেলা নহে—ইহা রাক্ষসের খেলা। ইহাতে খুন, জখম এবং রক্তপাত হয় মাত্র। এই সকল মন্তব্য এবং কঠোর বিধানের ফলে ক্রমশঃ ফুটবল-খেলার লোকের অনুরাগ কমিয়া যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই খেলা একরূপ বিলুপ্ত হয়।

তাহার পর বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক এই খেলার পুনরুদ্ধার হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ব্লাকহিথ ও রিচমণ্ড ক্লাব নামক দুইটা ফুটবল-খেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফুটবল-খেলার বৃদ্ধির সহিত ইংলণ্ডে "ফুটবল এসোসিয়েশন" স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফুটবলের দুই দলে ২০ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকিত; ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পর উহাদের সংখ্যা ১৫ জন হয়। এক্ষণে ১১ জন হইয়াছে।

ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত লেখিকা বলিয়াছেন যে, এদেশে একমাত্র ফুটবল-খেলায় যে পরিমাণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলা—এই চারিটীর সমষ্টির প্রতি একযোগে লোকে সেইরূপ অনুরাগ দেখাইয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ইংলণ্ডে ফুটবল-খেলার বর্ত্তমানে কিরূপ প্রতিপত্তি!

৩। বৃদ্ধ বয়সে কার্য্যশক্তি।

অনেকে মনে করেন, বৃদ্ধ বয়সে কার্য্য করিবার ক্ষমতা, স্মরণশক্তি প্রভৃতি যৌবনের মত সতেজ থাকে না। এ ধারণার মূলে কতটুকু সত্য আছে, তাহা বলিতে পারি না। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে বৃদ্ধগণ অতি প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদের পরিণত বুদ্ধি, বিচক্ষণতা

এবং দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণ বরং তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে যুবকগণের অপেক্ষা অধিক সাফল্য প্রদান করে। প্রাচীন বয়সেও অনেককে সুস্থ ও সবল শরীরে কার্য্য করিতে দেখা যায় এবং এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে।

বর্ত্তমান "গ্যাস্ ষ্টোভে"র উদ্ভাবক লিভারপুলের রবার্ট মার্টিন সাহেবের বয়স এক্ষণে ৮০ বৎসর এবং এখনও তিনি বেশ সুস্থদেহে গুরু পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে পারেন। লর্ড ষ্ট্যাথ্‌কোনা ৭৫ বৎসর বয়সে রাজকার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করেন এবং ৯০ বৎসর বয়সেও তিনি প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। সেখানে সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও এত প্রাচীন বয়সে তিনি গড়ে প্রতি সপ্তাহে তিনটা সাধারণ নৃত্য-গীতের বা তিনটা ভোজ সভায় যোগদান করিয়া থাকেন। উইলিয়ম ডি মরগ্যান্ ৬৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে উপন্যাস-রচনার কল্পনা করেন নাই; তাহার পর তিনি উহাতে প্রবৃত্ত হন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী পিরপোঁ মরগ্যান ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বিরাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধ চেম্বারলেন সাহেব ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার টারিফ বা শুল্ক-সংশোধক প্রস্তাবের উত্থাপন করেন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রবার্টস ৭০ বৎসর বয়সে ইংরাজগণকে বুয়র যুদ্ধের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। মন্ত্রীপ্রবর গ্লাডষ্টোন বলিতেন, "যদি আমার পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে জীবনের অর্দ্ধেক কার্য্য অসম্পন্ন থাকিয়া যাইত।" পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের লোকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রৌঢ় এবং ৪৫ বৎসরের ব্যক্তিকে বৃদ্ধ বলিত। কিন্তু এক্ষণে মিঃ লয়েড জর্জ্জের ৫০ বৎসর হইলেও লোকে তাঁহাকে যুবা পুরুষই বলিয়া থাকে? ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মাতা ভূতপূর্ব্বা সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রা কিছু দিন পূর্ব্বে ম্যাডাম প্যাট্টিকে বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের ভিতর আমরা দুই জনই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্কা রমণী।"

ইয়ুরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সার ফ্রেডারিক ইয়ং সাহেবের বয়স ৯৩ বৎসর। ৮৫ বৎসর বয়সেও অধ্যাপক জে, ই, বি মেশর সারাদিন পড়িতে পারেন এবং তাঁহার শ্রবণশক্তিও বেশ প্রখর। তিনি প্রত্যহ ৫ বা ৬ ঘণ্টা চেঁচাইয়া পড়িয়া থাকেন। ৭০ বৎসর বয়স্ক সার হিরাম ম্যাক্সিম চেষ্টা করিলে অবিশ্রান্তভাবে

কার্য্য করিতে পারেন। মিঃ বি ডব্লিউ লিডার নামক এক সাহেবের বয়স ৮০ বৎসর হইলেও তিনি যৌবনকালে যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেন, এখনও ঠিক সেইরূপ উদ্যমের সহিতই কার্য্য করেন। হলম্যান্ হাণ্টের বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর হইলেও তিনি এখনও বেশ কর্ম্মপটু আছেন এবং ছবি আঁকিতে এবং লিখিতে পারেন। সেণ্ট পলের গির্জ্জার ডিয়েন গ্রেগরী সাহেবের বয়স ৯২ বৎসর হইলে কি হয়, তিনি এখনও কার্য্যক্ষম। টমাস হার্ডি সাহেব ৭০ বৎসর বয়সে আবার নূতন ভাবে বুদ্ধিবৃদ্ধির পরিচালক আর এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা করিতেছেন। মুক্তি-ফৌজের নেতা বুথ সাহেবের ৮৪ বৎসর বয়সেও কর্ম্ম করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ৭১ বৎসর বয়সে আমেরিকার প্রথম রাজদূতের পদে বৃত হইয়া পারিসে আসিয়াছিলেন এবং এই কার্য্য ৭৯ বৎসর বয়স অবধি করিয়াছিলেন।

রাজমন্ত্রী পিটের পর হইতে ইংলণ্ডে কোন অল্পবয়স্ক ব্যক্তি মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন নাই। ডিউক অব ওয়েলিংটন ৭৭ বৎসর বয়সের সময় মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ১৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে তিন জন ব্যতীত সকলের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক, ৫ জন ব্যতীত অপর সকলের বয়স ৭০ বৎসরের অধিক এবং ২ জন মন্ত্রীর বয়স ৮০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ৭২ বৎসর বয়সে বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হিউগো তদীয় "History of a crime" নামক এক পুস্তক রচনা করেন। ৮৩ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, সে সময় তিনি যৌবনোচিত উদ্যমের সহিত আর একখানি বিয়োগান্ত পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হাবার্ট স্পেন্সার এবং রুশীয় গ্রন্থকার ও সংস্কারক কাউণ্ট টলষ্টয়ের মনের শক্তি অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আর্ল মেলসন ৮৬ বৎসর বয়সের সময় পর্য্যন্তও বেশ কর্ম্মঠ, স্ফূর্ত্তিশালী এবং হৃষ্টচিত্ত ছিলেন।

এদেশেও এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। হায়দার আলি ৫৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খেলা ধূলা করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ৫৫ বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইলে প্রথম কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে প্রাচীন বয়সে একটা রাজ্যস্থাপন করেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বয়ক্রম মৃত্যুকালে ১১০ হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ-শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে

নাই। পণ্ডিত ভরতশিরোমণি প্রভৃতি অত্যন্ত প্রাচীন বয়সেও যুবা বয়সের মত কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে দাদাভাই নাওরোজী, সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ প্রভৃতির আয়ু অন্যান্য শিক্ষিত-গণের তুলনায় কতকটা দীর্ঘতর বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্র-নাথের পরিশ্রমশীলতা অসাধারণ। বঙ্গসাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, ক্ষেত্রমোহন প্রভৃতি তাঁহাদের সহযোগিগণ অপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবিত আছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কার্য্যও করিতেছেন।

উপরি-লিখিত তালিকা-পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, বৃদ্ধগণের মধ্যেও এমন লোক আছেন যাঁহারা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট বা কর্ম্মে অক্ষম নহেন, তাঁহারাও যুবজনোচিত বলবীর্য্যের সহিত পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

অভিভাষণ-মন্থন।*

বঙ্কিমবাবু।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কাঁটালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটি কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল। তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট অতিথি-সৎকার করিলেন। দৈবক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঘোষাল মহাশয় বহুদিন যাবৎ প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। সন্ন্যাসী আরোগ্য লাভ করিয়া বলিলেন "আমি তোমার সেবায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার আর কিছুই নাই, এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি তোমায় দিয়া গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিবে।" ঘোষাল মহাশয় কহিলেন "আমার দিনই চলে না, কি করিয়া বিগ্রহের সেবা

---

* কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত অভিভাষণ হইতে গৃহীত।

করিব।" তিনি কহিলেন, "আমি আসা পর্য্যন্ত যেরূপে পার চালাও, আমি আসিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।" কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একখানি তালুক লিখিয়া দিয়া গেলেন। ঘোষাল মহাশয়েরা বেশ সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভীমেলে দুইজন ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে দুইটী কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাইদিগকে রাধাবল্লভের সেবার ভার দিয়া পরলোকগমন করিলেন। এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল তাঁহারই বংশে বঙ্কিমবাবুর জন্ম। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাধাবল্লভের সেবায়েৎ এবং নবাবী ও ইংরাজী আমলে রাজসরকারে চাকরী করেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সর্ব্বপ্রথম যে চারিজন দেশীয় কর্ম্মচারীকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী প্রদান করেন, তাহার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর পিতা একজন। বঙ্কিমবাবু কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর প্রথম বৎসরের প্রথম বি, এ। কলেজ ছাড়িয়াই তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীতে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি আই ই উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিম বাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই তিনজন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক্ক হইয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নবেলগুলি বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার মধ্যে দুই একখানি ইংরাজীর ছায়া লইয়া লিখিত হইলেও অধিকাংশই বঙ্কিমবাবুর নিজের। বঙ্কিমবাবুর নবেল হইতে বাঙ্গালার কি প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্য, "Knowledge filtered down" করিবার জন্য বঙ্গদর্শন নামে মাসিকপত্র বাহির করেন। তাহার কথা কিছু বলিব।

তিনি ৪ বৎসর মাত্র এই মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন এবং এই চারি বৎসরের বঙ্গদর্শনই বাঙ্গালাভাষার আদর্শ মাসিকপত্র হইয়া আজিও রহিয়াছে। তিনি যে শুদ্ধ নিজে লিখিতেন তাহা নহে, তিনি অনেককে লিখিতে শিখাইতেন। ইউনিভার্সিটীর অনেক গ্রাজুয়েট তখন বঙ্গদর্শনে লিখিতে পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, বঙ্কিমবাবুও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিতেন, তাঁহাদের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং বলিয়া দিতেন যে বাঙ্গালা লিখিতে গেলে দুইটি জিনিষের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়—Clearness ও Perspicuity। পুঁটুলীপাকান লেখা তিনি একেবারে দেখিতে পারিতেন না। যাহা বলিবার আছে একেবারে সোজাসুজি বল। তোমার লেখা বুঝিবার জন্য পাঠককে মাথা ঘামাইতে হইবে কেন? এই চারি বৎসরের পর বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকে। তারপর তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদকের ভার লইয়া আরও ৪।৫ বৎসর বঙ্গদর্শন চালান। এ কয়েক বৎসরও বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের প্রধান লেখক। কিন্তু এবার তিনি একটু সুর ফিরাইয়াছিলেন। এবার তিনি নবেলে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মকে আবার বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য একটা চেষ্টা হয়। তাহাতে আবার দুই দল হয়। একদল একেবারে পুরাণো সব ফিরাইয়া আনিতে চান; আর একদল বলেন, না বাপু তাহা হইবে না। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে হিন্দুয়ানী করিতে গেলে আর চলিবে না। কিন্তু হিন্দুয়ানীটা ফিরাইয়া আনা চাই। বঙ্কিমবাবু এই শেষোক্ত দলের কর্ত্তা ছিলেন। সেইজন্য আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রচার নামক আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু আমাদের এখানে থামিতে হইবে, কারণ পুঁথি বাড়িয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। ইঁহার নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। ইনি চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র। কিন্তু ইনি আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন এবং অনেক ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজী ভাষা শিখিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার প্রতি ইঁহার

আস্থা কমিয়া যায়। ইনি বেদান্ত ও উপনিষদের ধর্ম্ম যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গালায় গদ্য-রচনার সূত্রপাত করেন। ইনিই প্রথম বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট দেশের লোককে সংস্কৃত বা আরবী শিক্ষা না দিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিন। ১৮১৭ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট যখন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করেন, তখন ইনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন এবং বাঙ্গালায় একখানি ব্যাকরণ লিখেন। ইংরাজীতে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থাকিলেও এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে হিন্দুরা ধর্ম্মলোপ হইবার ভয়ে এক ধর্ম্মসভা স্থাপন করেন। সভায় রামমোহন রায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। নৈহাটী নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বাঞ্চলে নিমন্ত্রণে গিয়া একটী পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণশিশুকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং তাহাকে ব্যাকরণ সাহিত্য ও ন্যায় শিক্ষা দেন। সেই বালকই পরিণামে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। নৈহাটী হইতে আসিয়া তিনি দিনকতক রামমোহন রায়ের নিকট চাকুরী করেন। পরে সে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মসভার লেখক হন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন পুস্তক লিখিলে গৌরীশঙ্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার তাহার জবাব দিতেন। এইরূপে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইত লোকে আগ্রহ সহকারে সেইগুলি পাঠ করিত। কেহ বা রামমোহনের জয় দিত, কেহ বা গৌরীশঙ্করের জয় দিত। বলিতে গেলে বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচারগ্রন্থের এই উৎপত্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিকাতার একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিবাস ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী বীরসিংহ গ্রামে। তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন, এবং তথায় ইংরাজী ও সংস্কৃতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন এবং স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি অতি উদারচেতা, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা, লোক ছিলেন। দয়া, গুণে ও দানে

প্রভাবে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিয়াছেন। যতদিন শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততদিন কিসে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভাল করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার ছিল সংস্কৃত ভাল করিয়া না শিখিলে ভাল বাঙ্গালা কেহ লিখিতে পারে না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন করেন। তখন বাঙ্গালায় একদল লেখক সৃষ্টি করা তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে বাঙ্গালায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহবিষয়ক প্রস্তাবগুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত। তিনি এইরূপ সরল ভাষায় অতি দক্ষতা সহকারে আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেহই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বাঙ্গালাই, ভাল বাঙ্গালা বলিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বই পড়িয়াই অনেকে মানুষ হইয়াছেন। তাই আপামরসাধারণ সকলেই তাঁহাকে এখনও দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

ইনি ব্রাহ্মসমাজে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইহার নিবাস চুপী। ইনি বহুদিন কলিকাতায় বাস করেন এবং জীবনের শেষাংশে গঙ্গাতীরে বালি গ্রামে বাস করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইঁহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বহুকাল বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের স্কুলপাঠ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল পুস্তকের বিষয় তিনি অধিকাংশই ইংরাজী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদিও লোকে তাঁহাকে এই সকল প্রবন্ধের জন্য অধিক চেনে, এবং তাঁহাকে মান্য করে; কিন্তু এগুলি তাঁহার প্রধান কার্য্য নহে। যে গ্রন্থের জন্য তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে, তাহার নাম "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।" ১৭৮৯ সাল পর্য্যন্ত কি ইংরাজী, কি জার্ম্মন, কি ফ্রেঞ্চ, কি লাটিন, কি বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের অনুক্র-

মণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যত প্রকার উপাসক-সম্প্রদায় আছে মোটামুটি তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা-প্রণালী ও ধর্ম্মতত্ত্বের সার মর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি উইলসন সাহেবের Hindu Sects নামক গ্রন্থ হইতে সকল কথাই লইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। উইলসনের Hindu Sectsএ যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা তাঁহার পুস্তকে আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি উইলসনের Hindu Sects হইতে কিছুই লন নাই। তৎকালে কলিকাতায় একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ ব্যক্তি কলিকাতায় কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি উড়িয়া, কি মাড়োয়ারী সকল জাতিরই সহিত বেশ মিলিতে পারিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া তাহাদের নিগূঢ় খবরগুলি আনিয়া দিতে পারিতেন। তিনিই উইলসন সাহেবেরও মুরুব্বি, তিনি অক্ষয়কুমার দত্তেরও মুরুব্বি। সুতরাং দুইখানি পুস্তকের অনেক কথা একই রূপে লিখিত হইয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু স্কুলের ছাত্র। তিনি প্রথম হইতেই ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিবাস সাগরদাঁড়ী। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। মধুসূদন হিন্দু স্কুলে পড়িতে পড়িতেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের লোক ও বড়ই একগুঁইয়া ছিলেন। তিনি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে কলিকাতা হইতে পলাইয়া মান্দ্রাজে গিয়া এক ফিরিঙ্গী রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং সকল ভাষা হইতেই ভাল ভাল ভাব বাছিয়া লইয়া আপনার কবিতার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়ে যে কেহ পদ্য লিখিত, মিল করিয়া লিখিত। মাইকেল বলেন এরূপ মিল করিয়া লিখিতে গেলে ভাবপ্রকাশের অসুবিধা হয়। তাই তিনি মিলের বন্ধন কাটাইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে অনেকেই তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন কি কোন পণ্ডিত তাঁহার মেঘনাদ

বধ কাব্যকে বিদ্রূপ করিবার জন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুছুন্দরী বধ' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা অনেকেরই মনে নাই। মাইকেলের মেঘনাদ বধ এখন বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তখন নাটক লিখিতে গেলে সকলেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ করিত। মাইকেল ইহার বড় বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি নূতন ধরণে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লিখিলেন। পাইকপাড়া রাজবাটীর থিয়েটারে বিপুল আয়োজনের সহিত উহার অভিনয় হইল। অভিনয় খুব জমিয়া গেল। নাটকে সংস্কৃতের অনুকরণ এই হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

Michael Madhusudan Dutta was wayward as a son, wayward as a husband, wayward as a father, wayward as a student, but his waywardness in poetry alone payed.

কবিবর হেমচন্দ্র।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেলের কাব্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম মাইকেলের কাব্যের সমালোচনা করেন। মাইকেলের কাব্য পড়িয়াই তাঁহার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার কবিতাবলী সকল বাঙ্গালীরই অতি আদরের জিনিষ। বঙ্কিমবাবু তাঁহার বৃত্রসংহারের সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। কিন্তু বৃত্রসংহার জনসমাজে বিশেষ আদর পায় নাই। তাঁহার দশমহাবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যাঁহারা দশমহাবিদ্যা পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মজিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

রমেশবাবু বঙ্গমাতার একটী কৃতী সন্তান। ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা তিন চারি পুরুষ ধরিয়া, এমন কি ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে, ইংরাজীতে দক্ষ ও বৃহস্পতি ছিলেন। রমেশবাবু নিজে সিবিল সার্ব্বিশে অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে বরোদা রাজ্যে দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্যে যত প্রতিপত্তি, সাহিত্যে তত নহে। কি ইংরাজীতে কি বাঙ্গালাতে এই দুয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক নভেল লেখকদিগের

মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। তিনি ঋগ্বেদের বাঙ্গালা তর্জ্জমা প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু মিত্র।

মাইকেলের পর প্রধান নাটক লেখক দীনবন্ধু মিত্র। ইনি সামাজিক ব্যাপার লইয়াই নাটক লিখিতেন। সামাজিক ব্যাপারে ঠাট্টা করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম ছিল। যদিও সেই সময়ের ব্যাপারেই তাঁহার নাটকগুলি খাটে, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে উহা চিরদিনই আমোদের বস্তু হইয়া থাকিবে। কারণ দীনবন্ধু বাবুর লেখা বড়ই সরল এবং তাঁহার ভাব বড়ই গভীর। সমাজের মধ্যে যেখানে যে দুর্নীতিটুকু ছিল, তিনি সেটুকু খুলিয়া দেখাইয়া দিতেন। আর লোকে হাসিয়া অস্থির হইত। তাঁহার নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো ইত্যাদির অভিনয় আজিও হয় এবং লোকেও এই সকল গ্রন্থ পড়িয়া বড়ই আনন্দ বোধ করে। প্রথমে ইংরাজী শিখিয়া, মদ খাইয়া, অখাদ্য খাইয়া যে সকল যুবক উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন যাপন করিত, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দীনবন্ধু মিত্র যে সধবার একাদশী লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হাস্যরসের নাটক আজিও বাঙ্গালায় হয় নাই। তাহারা কথায় কথায় Shakespeare quote করিত, Byron quote করিত, কেহ হিতোপদেশ দিতে আসিলে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিত; কাহারও কথা শুনিত না, কাহাকেও মানিত না। কিন্তু তাহাদের পরিণাম অতি বিষম হইত। দীনবন্ধুবাবু সেইটী সধবার একাদশীতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দীনবন্ধুর পর নাটককারদিগের মধ্যে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রধান। তিনি বহু গভীর ভাবের নাটক লিখিয়াছেন। তিনি অনেক বাঙ্গালা নভেল ও অনেক ইংরাজী নাটক অবলম্বনে বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর মাইকেল হইতেও বিভিন্ন। মাইকেলের লাইনে লাইনে অক্ষরগুলি মিলিত, ইঁহার তাহাও মিলিত না, কোন লাইনে ষোলটী অক্ষর, কোনটিতে বা মোটে তিনটী। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারেরা যে শান্তিরস লইয়া নাটক লিখিতে

একবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যে শান্তিরসকে তাঁহারা নাটক লিখিবার সময় কাব্যের নবরস হইতে একেবারে ছাঁটিয়া দিয়া গিয়াছেন, গিরিশ সেই শান্তিরস লইয়াই বুদ্ধদেব, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া বঙ্গ-সমাজকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সেবকেরা এটিকে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া থাকেন। এই সকল নাটক সম্বন্ধে মতামত দুই প্রকার হইলেও তাঁহার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। সেগুলি অতি গভীর ভাবের সহিত লিখিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) গত বর্ষেই আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন; আজিকার সভায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ সম্মিলনে তিনি যোগ দিলেন না। নবদ্বীপের লোক হইলেও কলিকাতা তাঁহাকে ভুলিবে না! তিনিও অনেকগুলি নাটক লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি হাস্যরসের রচনায় দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাহিত্যে যে রসের ধারা আনিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন। তাঁহার স্বদেশভক্তিমূলক গানগুলিও দেশকে মাতাইয়াছে। অদ্য বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদের সম্মিলনে তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি।

প্রতিধ্বনি।

———:০:———

সহযোগী 'সময়' পত্রে "বিদ্যাসাগর ও সাহেবী আদব-কায়দা" নামক এক ক্ষুদ্র নিবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে স্বাধীনচেতা, নির্ভীক স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের একাংশ পরিস্ফুট হইয়াছে। 'চাকুরী'-জীবী বাঙ্গালীকে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই অংশ পাঠ করিতে বলি। তিনি কোন মতেই অন্যায়, অবিচার বা দুর্ব্ব্যবহার নীরবে পরিপাক করিতেন

না, সুদ সমেত উহা ফেরত দিতেন। কেমন করিয়া দিতেন,—নিম্নের এই গল্পটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহেবী আদব-কায়দার কথা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তাহা এই—একবার তিনি শিক্ষাবিভাগের কোন বড় সাহেবের বাটীতে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগরকে বসিতে চেয়ার পর্য্যন্ত দেন নাই এবং বিদ্যাসাগর তাঁহার সম্মুখে টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি টেবিলের উপর হইতে সবুট শ্রীচরণ নামাইয়া রাখেন নাই। অধিকন্তু সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিতে শুনিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়িতেছিলেন এবং টেবিলের উপর জুতার শব্দ করিয়া তাল দিতে ছিলেন। তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া আসেন, কিন্তু সাহেব যে তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন, ইহা মনে রাখেন। কর্ম্মোপলক্ষে একবার বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের সহিত সাহেবের সাক্ষাৎ করিতে হয়। তিনি দ্বারদেশে সাহেবের গলার স্বর শুনিতে পাইয়াই চাকরকে তাঁহার গৃহে একখানি চেয়ার ও একটি টেবিল আনিতে বলেন। চেয়ারে স্বয়ং বসিয়া এবং পা দুখানি টেবিলের উপর তুলিয়া তিনি সাহেবকে গৃহমধ্যে আহ্বান করেন। তিনি সাহেবকে বসিবার জন্য চেয়ার দেন নাই এবং সাহেব যখন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ও গুন্ গুন্ স্বরে গান ও তৎসহ টেবিলের উপর পদশব্দ দ্বারা তাল প্রদান করিতেছিলেন। সাহেব অবশ্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যবহারে নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং তাঁহার উপরিওয়ালা সাহেবকে এই বিষয় জানান। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন—'আমি শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, অমুক সাহেব আমার ব্যবহারে অপমানিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় আমার ব্যবহার খুব উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় শিষ্টাচার-সম্মতই হইয়াছিল। আমি এ দেশী লোক সুতরাং ভদ্র-লোক দেখা করিতে আসিলে ইউরোপীয়গণ যে কিরূপ আদব-কায়দা ও প্রথা অবলম্বন করে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি যখন অমুক সাহেবের বাটী তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন তিনি আমাকে অভ্যাগত ভদ্রলোকের প্রতি ইউরোপীয় শিষ্টাচারের নমুনা দেখাইয়া আপ্যায়িত করেন। তাহার পর

তিনি যখন আমার বাটীতে আসেন, আমি তাঁহাকে ইউরোপীয় শিষ্টাচারসম্মত প্রথানুযায়ী অভ্যর্থনা করিতে এতই সমুৎসুক হইয়াছিলাম যে, আমি আমার পরিচারককে গৃহমধ্যে একখানি চেয়ার ও টেবিল আনয়ন করিতে বলি এবং তাঁহার দৃষ্টান্তমত নিজে চেয়ারে বসিয়া ও টেবিলের উপর পা তুলিয়া বিশেষ চেষ্টার সহিত আমার যাহা কোন কালে অভ্যাস নাই, তাহাই করি, অর্থাৎ গান গাইতে থাকি ও সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর পা দিয়া তালও দিতে থাকি। এক্ষণে আমি শুনিতেছি যে, আমি তাঁহাকে অপমান করিয়াছি। পক্ষান্তরে তিনি আমায় যেরূপ শিষ্টাচারবিশিষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম মাত্র।" উপরিওয়ালা সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ৎ শ্রবণ করিয়া নীরব রহিলেন এবং তাহার পর এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তেজস্বী ও স্বাধীনপ্রকৃতি লোক ছিলেন; তিনি পেটের দায়ে অপমান সহ্য করিতে একেবারেই অসম্মত ছিলেন। এই ঘটনাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।"

সম্প্রতি 'ঢাকাপ্রকাশে' "নিরামিষ আহারের উপকারিতা" নামক এক সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিরামিষ আহারের উপকারিতা সম্বন্ধে বহু বিষয় এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিরামিষ আহার যে উপকারী এবং অল্পব্যয়সাপেক্ষ, তাহা খাদ্যদ্রব্যের এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে বাঙ্গালীর জানিয়া রাখা উচিত। আমরা এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া 'অর্ঘ্যে'র পাঠকাপাঠিকাগণের জন্য ইহা আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"মৃত্তিকাজাত পদার্থই মানুষের উপযোগী খাদ্য। ভগবান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের উদরপূরণ জন্য মৃত্তিকাতেই সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের শরীরপুষ্টির জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক তাহা সকলই মৃত্তিকাতে জন্মে। ধান্য, কলাই, মুগ, বুট, অরহর, যব, গোধুম, ভুট্টা প্রভৃতি মনুষ্যের খাদ্য; ইহার প্রত্যেক জিনিষই মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই সকল জিনিষ ভক্ষণ করিয়াই মানুষ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। তাহার পক্ষে অন্য কোন প্রকার পাশবিক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

হিন্দুর জীবন ও নিত্তনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রকারগণ চিরদিনই নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দুর প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ জ্বলন্ত অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এখন আর কেহ শাস্ত্রের অনুশাসনের প্রতি লক্ষ্য করে না। প্রবল দেশাচারই এখন একরূপ শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। কোনও হিন্দু পরিবারের একটী শিশুর জীবনের ইতিবৃত্ত ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শরীরগঠন পক্ষে নিরামিষ আহারই সম্পূর্ণ উপযোগী। বালক যতদিন মৎস্যাদি ভোজন করে না, ততদিন সে সুস্থ, সবল ও নীরোগ থাকে; কিন্তু যেই সে মৎস্য ভক্ষণ আরম্ভ করে অমনি নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগের বীজাণু সকল অলক্ষ্যে তাহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে অচিরেই ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে। যাহারা আজীবন নিরামিষাশী তাহাদের শরীর যেমন সবল, পুষ্ট ও নীরোগ মৎস্য ও মাংসাহারী ব্যক্তিগণের দেহ কিছুতেই তদ্রূপ হইতে পারে না।

হিন্দু পরিবারের ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও একথার যৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। হিন্দুগৃহের সধবা ললনাগণ যতদিন মৎস্য-মাংস ভোজন করেন, ততদিন তাহারা কোন না প্রকার রোগের অধীন হইয়া জীবন যাপন করেন। তখন গৃহস্থকে গৃহিণীর পরিচর্য্যার জন্য পরিচারিকা ও রন্ধনাদিকার্য্যনির্ব্বাহজন্য পাচক নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু কোনও বিধবার পরিচর্য্যা ও রন্ধনাদির জন্য কেহ কখনও কোন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন কি? সধবা দিনে তিনবার আহার করিয়াও দুর্ব্বল, অসুস্থ ও রোগক্লিষ্ট, আর বিধবা একবার মাত্র আহার করিয়াই সবল, সুস্থ ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? একমাত্র যত্যাচার ও নিরামিষ ভোজনই কি ইহার কারণ নহে? যাহার দেহলতিকা সধবা অবস্থায় নানাপ্রকার রোগের আবাসস্থল থাকে, তিনিই যদি আবার বিধবা অবস্থায় সবল ও সুস্থ হন তবে কি মনে করা যাইবে?

নিরামিষ আহার দীর্ঘায়ুঃ হইবার নিদান। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিরামিষাশী ব্যক্তিমাত্রই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও সুখ উপভোগ করিয়াছেন। শরীর নীরোগ হইলে যে মানুষ দীর্ঘায়ুঃ হইবে

একথা স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং নিরামিষাহারী দীর্ঘায়ুঃ হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? সাত্ত্বিক আহারে মনের প্রফুল্লতা জন্মে; মানসিক প্রফুল্লতা শরীর গঠন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে, তাই নিরামিষ আহার শরীরগঠনপক্ষেও উপকারী।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান স্থান। অন্য দেশে যে সকল খাদ্য অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা এদেশের উপযোগী নহে। এ জন্যই এদেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতিতে খাদ্যাদির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাই এদেশের রোগীকে মুগের যুষ, মুসুরের যুষ, খৈর মণ্ড, চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশের মনীষিগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! কালমাহাত্ম্যে উহা অব্যবস্থা বা কুব্যবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত ও সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের পাকস্থলী যাহা পরিপাক করিতে সমর্থ তদপেক্ষা গুরুপাক খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে উহা যে পরিপাক হইবে না তাহা নিশ্চিত; তাই আমরা অনেক সময় পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রানুমোদিত দুষ্পাচ্য পথ্যাদি আহার করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। স্থানীয় অবস্থা ও দেশের জল বায়ু প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে হইবে, এ কথা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। তারপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও নিরামিষ আহারের উৎকৃষ্টতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রফেসার জন রে বলেন—"মনুষ্যের দেহরক্ষার জন্য যে কোন খাদ্য প্রয়োজন হয়, এবং যে সকল জিনিষে মনুষ্যের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বিধান করে, তাহা সমস্তই উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যকে মাংসাশী জীবরূপে সৃষ্টি করা হয় নাই।"

অনেকে মনে করেন যে, শরীরগঠনজন্য যে পরিমাণ যবক্ষারজান বা তৎকল্প উপাদানের প্রয়োজন হইবে তাহা কেবল মাংসাদিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভারতবর্ষের মধ্যে এক বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে মৎস্য কি মাংস আহারের ব্যবস্থা নাই, অথচ সে সকল দেশের লোক বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক সুস্থ। যদি একমাত্র মাংসাদিতেই যবক্ষারজান পাওয়া যাইত তবে তাহারা এত বলিষ্ঠ হইতে পারিত না। অনেক চিকিৎসকের মতও আমাদের মতের অনুকূল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার হেনরী

টমসন এম, ডি, এফ, আর, সি, এস বলেন—"মনুষ্য শরীরের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা সমস্তই উদ্ভিদ্ হইতে পাওয়া যায়।"

গলিত ও পচা খাদ্য শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। পচা খাদ্য আহার করিলে যে শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন ও শক্তিহীন হয়, একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হইতে পারে সেগুলি সর্ব্বদা পরিহার্য্য। সুতরাং খাদ্যাখাদ্য বিচার-সময়ে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শাক-সব্জী, মৎস্য-মাংসাদি অতি অল্প সময়ে পচিয়া নষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শাক প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য পচিয়া যত অপকার করে, মাংসাদি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অপকার করিয়া থাকে। মাংস সাধারণতঃই গুরুপাক, তাহার পর যে ভাবে পাক করা হয় তাহাতে উহা একেবারে দুষ্পাচ্য হয়। পরিপাক হওয়ার জন্য মাংসকে দীর্ঘকাল পাকস্থলীতে অবস্থান করিতে হয়; সুতরাং অম্লরস-সহযোগে পচিয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে। ডাক্তার লুকাস স্যাম্পনিয়ার বলেন—"মাংসাহার-নিবন্ধন পাকস্থলী হইতে এক প্রকার বিষময় রস নিঃসৃত হয় এবং আহা হইতে এপেণ্ডাইসিটীস নামক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইউরিক এসিড শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এ সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসকগণ বহু গবেষণা করিতেছেন। মনুষ্যশরীরে উক্ত এসিডের আধিক্য হইলে নানাপ্রকার রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার হেগ্ বলেন—এক পাউণ্ড মাংসে ১৪ গ্রেণ ইউরিক এসিড থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যিনি যত অধিক পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ইউরিক এসিড উদরস্থ করিবেন।

আজকাল এদেশে গলনালীর রোগের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। এ রোগ দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য। এ রোগে শতকরা একজনও বাঁচে কি না সন্দেহ। এ রোগ হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিতে হইবে। এ রোগও মাংস-ভক্ষণ-প্রসূত বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তার রবার্ট বেল বলেন—মাংস-ভোজন হইতেই এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি মনে করেন, যদি মাংসাহার ত্যাগ করা যায় তবে গলরোগ (ক্যান্সার) আরোগ্য করা যাইতে পারে।

উপরে যে সকল অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত প্রকটিত হইল তাহা হইতে দেখা যায়, মাংসাহার মনুষ্য জাতির উপযোগী নহে। মাংসাহারে যত অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন নিরামিষ আহারে সেরূপ সম্ভাবনা আদৌ নাই। পরন্তু নিরামিষ আহার শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখে। সুতরাং দেখা যায়, আমাদের পক্ষে নিরামিষ আহারই বিধাতার বিধান। বল পূর্ব্বক পশ্বাদির ন্যায় মাংসাহার করিলে তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না।

নব বর্ষে।*

মিলন-পুলক-স্মৃতি
সারাবর্ষ জাগাইয়ে।
বাঁধি যে বিষাদ-গীতি
বিস্মৃতির গ্রন্থি দিয়ে।
পুলক-প্রবাহে ধাই,
বর্ত্তমান ভুলে যাই,
কেবল ভবিষ্য চাই,
বাঁচি শুধু আশা নিয়ে।
আশা নব বরষের,
আশা ফিরে মিলনের,
দীপশিখা স্মরণের
রহে বুকে উজলিয়ে,
যদি গো বিদায় চাও,
প্রীতি-স্মৃতি-চিহ্ন নাও,
এই শুধু বলে যাও
ভুলিবে না ফিরে গিয়ে।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

* মণিলাল কোম্পানী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নব-বর্ষের পুণ্য-স্মৃতি-সম্মিলন সভায় গীত।

স্বর-ব্যঞ্জন।

স্বর।

হে ব্যঞ্জন! হৃদয়-রঞ্জন
ওহে স্বরপতি!

ব্যঞ্জন।

প্রিয়ে চারুশীলে!
তুমি না থাকিলে মোর
কি হইত গতি?
তুমি আছ তাই আছি, চালাইলে চলি,
লোকে মোরে ব্যঙ্গ করে পঙ্গু-খঞ্জ বলি!
অলঙ্কার, ছন্দঃ, রস, শব্দ, ব্যাকরণ
তোমা বিনা স্তব্ধ সব,—অন্ধ অকারণ;
সারস্বত কুঞ্জে তুমি সরস বসন্ত
তোমার পরশে খসে পায়ের হসন্ত!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

কবিতা-রাণী।

যখন চন্দ্র মধুর মন্দ দীপ্ত গগনে হাসে,
মুগ্ধা ধরণী উচ্ছল প্রেম-চন্দ্রিকা-নীরে ভাসে,
ধূপ-সৌরভ জাগায় অনিল পুষ্প-পরাগ আনি ;
তখন তোমার মুরতি হৃদয়ে জাগে কবিতা-রাণী।

যখন মঞ্জু কুঞ্জ কাননে কান্ত কোকিল ডাকে,
সরমে কোমল কুন্দ-কলিকা চাহে পল্লব-ফাঁকে,
মধুপ কহে মধু-গুঞ্জনে অনুরঞ্জন-বাণী,
তখন তোমার মুরতি হৃদয়ে জাগে কবিতা-রাণী।

যখন শ্রাবণ-গগন-ভবনে মেঘ-দুন্দুভি বাজে,
বিভল শিখিনী নাচে চারু নীলমণি-মণ্ডিত সাজে,
জলদ জানায় সঞ্চিত প্রেম বিদ্যুৎ দিঠি হানি,
তখন তোমার মুরতি হৃদয়ে জাগে কবিতা-রাণী।

যখন বিশাল-বারিধি-বক্ষে প্রেম-কম্পন ওঠে,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ লঙ্ঘি ত্রস্তা তটিনী ছোটে,
মুগ্ধ-মলয় বহে দুজনের প্রেম-কল্লোল-বাণী,
তখন তোমার মুরতি হৃদয়ে জাগে কবিতা-রাণী।

যখন আম্র তরু মুঞ্জরে নব পল্লব-হারে,
মধু মালতীর অঙ্গ দোদুল শ্যাম-অঞ্চল-ভারে,
প্রেম-ইঙ্গিতে বল্লভে দেয় কান্ত কোমল পাণি,
তখন তোমার মুরতি হৃদয়ে জাগে কবিতা-রাণী।

যখন দ্যুলোক, ভূলোক উজলে মিলন-আলোক-ভাতি,
হৃদয় সনে মিলিত হৃদয় পুলকে দিবস-রাতি,
ক্ষুব্ধ হৃদয় সান্ত্বনা যাচে তোমারে বক্ষে টানি,
তখন তোমার মুরতি হৃদয়ে জাগে কবিতা-রাণী।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

ব্যথা-দানের ফল।

[অলৌকিক-কাহিনী]

মালাবার প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগে মঞ্জরী নামে একখানি মনোরম পল্লী আছে। মঞ্জরী পল্লী-মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ-বেষ্টিত ব্রাহ্মণদিগের গ্রাম্য কুটীরগুলি আলেখ্যবৎ অবস্থিত রহিয়াছে। তাহারই এক প্রান্তে প্রাচীন ভবানীমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখা যাইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র।

এই গ্রামে বালক গোপালন সাধারণ গ্রাম্য বালকের ন্যায় উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। দীঘির জলে, মন্দির-সোপানে বা শস্যক্ষেত্রে, তাহার দৌরাত্ম্যে লোকে অস্থির হইয়াছিল। সে কাহারও কথা শুনিত না, বা কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। এমন কি তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি একদিন পল্লীর প্রাণস্বরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বেদ-পরায়ণ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, মহামান্যবর শাস্ত্রী মহাশয়কে উত্যক্ত করিল; শাস্ত্রী মহাশয় গোপালনের কুব্যবহার দর্শনে ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"হতভাগা! তুই মানুষ না ভূত? ভূতে না পাইলে কি মানুষে এ কাজ করে?"

কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি যেমন শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, পরক্ষণেই আবার ততোধিক শীঘ্র গতিতে নির্ব্বাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় গোপালনকে তিরস্কার করিবার পরেই বলিলেন—"ভগবান্, তোমায় সুমতি দিন, আমার ইচ্ছা নয় যে তোমার কোন অমঙ্গল হয়।"

কে জানে আন্তরিক অভিসম্পাত বা আশীর্ব্বাদে শুভাশুভ বিজড়িত আছে কি না? কে বলিতে পারে, আমাদের অদৃশ্যে কেহ আমাদের উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার অভিপ্রেত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেয় কিনা? আমাদের মানসিক তরঙ্গ, তাড়িৎ বা আলোক-তরঙ্গমালার মত, শূন্য পথের ভিতর দিয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে, অপরের মানসিক তরঙ্গ আলোড়িত করে কি না তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারে?

পারলৌকিক জগতের এই রহস্য কেহ উদ্ঘাটিত করিতে না পারিলেও বিমানচারী ছায়াশরীরধারীদিগের এইরূপ অলৌকিক শক্তির একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ কয়েক দিন পরে পাওয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরস্কারের কয়েক

দিন পরে একদিন সন্ধ্যা বেলায় গোপালন তাহার বন্ধুবর আয়ুর্থীর সহিত এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনান্তে স্থির করিল যে, পরদিন প্রভাতে উভয়ে অদূরবর্ত্তী ভবানীমন্দির-পার্শ্বস্থ চম্পকবৃক্ষ হইতে কুসুম হরণ করিয়া আনিবে। এই পরামর্শের পর উভয়ে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিল।

ঘটনাক্রমে সেই বটবৃক্ষ-শিরে তখন একটা পিশাচ বিশ্রাম করিতেছিল; তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু সে ঐ গ্রাম্য বালকদ্বয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিল ও উভয়কে নিরীক্ষণ করিল। তাহার পৈশাচিক বৃত্তি এই দুষ্ট গোপালনের প্রতি ধাবিত হইল, সে আপনার অমানুষিক আনন্দ-উপভোগের অবসর বুঝিয়া গোপালনকে আপনার আধাররূপে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইল।

গোপালন গৃহে ফিরিয়া আহারাদি সমাপনান্তে শয়ন করিল। শয়ন করিবা মাত্র সারা দিবসের দৌরাত্ম্য-ক্লান্ত অবয়বগুলি অবসন্ন হইল ও গোপালন ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। মধ্য রাত্রিতে যখন পল্লী-জীবন নীরব হইয়াছে, সকলে শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে অচেতন হইয়া রহিয়াছে, তখন ঐ পিশাচ আপন দুরভিসন্ধি পরিপূর্ণ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া আয়ুর্থীর বেশ ধারণ করিল ও গোপালনের রুদ্ধ গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু গোপালনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না; তখন সেই পিশাচ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বন্ধু! প্রভাত হইয়াছে, গাত্রোত্থান কর, তুমি যে কাল আমায় এখানে আসিতে বলিয়াছিলে, চম্পক-কুসুম-চয়নের কথা কি তোমার মনে নাই?"

এই আহ্বানে গোপালনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে গাত্রোত্থান করিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে গত সন্ধ্যার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিল ও তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বাহিরে আসিয়া বন্ধু আয়ুর্থীকে দেখিয়া গোপালন তাহার সহিত মন্দিরমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু একি! গোপালন তাহার বন্ধুর চরণ-প্রান্ত অবলোকন করিয়া ভাবিল "একি! এ যে, অঙ্গুলীহীন, পদবিহীন দুইখানি দণ্ডবিশেষ!" আর একবার আয়ুর্থী-বেশধারী পিশাচের সর্ব্বাঙ্গ অবলোকন করিয়া গোপালন স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা

করিতে লাগিল—"একি হইল! আমি নিদ্রিত না জাগ্রৎ? না আমি তো চলিয়াছি, পথের উপর দিয়াই তো চলিয়াছি। কিন্তু এ কে? প্রথমে তো আয়ুর্থীর বেশে ইহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন কেন এরূপ বিকৃত দেখিতেছি?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়ন-প্রান্ত হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবিল, ছুটিয়া পলাইবে; কিন্তু কেমন করিয়া একাকী পলাইবে? তাহা হইলেও তো নিস্তার নাই। সে তখন নিশ্চয় করিল যে, কোন নিশাচর তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে।

তখন সেই বিপদের সময়, সেই দারুণ ত্রাসের সময় তাহার অনুষ্ঠিত সকল দৌরাত্ম্যের কথা মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইল, বুঝি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি কুব্যবহারের ফলে আজ তাহাকে প্রেতের কবলে পড়িতে হইয়াছে। অবশেষে, চোখের জল মুছিয়া সে শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও অবশেষে ভবানী দেবীর উদ্দেশে বলিল,—"মা রক্ষা কর মা, বিপদে পড়িয়া আজ আমার কুকর্ম্মের জন্য অনুতাপ আসিয়াছে। মা আজ আমায় রক্ষা করিলে, আর আমি ভবিষ্যতে কখনও কুকর্ম্ম করিব না, আমি আত্মসংযম শিক্ষা করিব। দয়াময়ি! আজ আমায় রক্ষা কর।"

এক্ষণে উভয়ে মন্দির-সীমায় উপনীত হইল। পথিমধ্যে গোপালন ঐ পিশাচকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই। এখন স্বকার্য্য-সাধনের উপায় হইয়াছে বিবেচনা করিয়া আয়ুর্থী-বেশধারী পিশাচ বলিল, "বন্ধু, এইবার তুমি ঐ চম্পকবৃক্ষে আরোহণ করিয়া কুসুম চয়ন কর, আমি নিম্নে সংগ্রহ করি।" তখন গোপালন তাহার হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া সাহসভরে বলিল, "না বন্ধু, তুমি বৃক্ষে উঠ, আমি নিম্নে ফুল সংগ্রহ করি।" পিশাচ নিতান্ত বিরক্তির সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইল ও বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। উঠিবার সময় বার বার গোপালনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পরে পিশাচ যখন কুসুম-চয়নে রত হইয়াছে, তখন গোপালন বলিল, "বন্ধু আমার মলত্যাগের বেগ হইয়াছে সুতরাং একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই শৌচক্রিয়া শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। পিশাচ ইহাতে সম্মত হইলে পর, গোপালন অদূরবর্ত্তী ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল।

তথায় প্রবেশ করিয়া গোপালন তাহার বস্ত্রখণ্ড উন্মোচন করিয়া একটী চারা গাছে সংলগ্ন করিয়া উলঙ্গ শরীরে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণের দায়ে ছুটিতে লাগিল। অদূরে এক পুরোহিতের বাটী ছিল, পুরোহিত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রাহ্মণ, গোপালন তাঁহার দ্বারে সজোরে করাঘাত করিবামাত্র তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন ও গোপালনকে উলঙ্গ ও প্রায় অচেতন অবস্থাপন্ন দেখিয়া দ্বার রোধ করিলেন।

এদিকে পিশাচ, গোপালনের বিলম্ব দেখিয়া বারম্বার তাহাকে আহ্বান করিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে ঝোপের নিকটে গমন করিল। তথায় গোপালনের পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি সরোষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ও রোষকষায়িত লোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে দেখিল, গোপালন পুরোহিতের বাটীর দিকে ছুটিয়াছে। তদ্দর্শনে সেও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বে পুরোহিত ঠাকুর গোপালনকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

তখন পিশাচ পুরোহিতের দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পারিল না। কারণ, পুরোহিত মহাশয় গোপালনের প্রমুখাৎ পিশাচের বার্ত্তা অবগত হইবা মাত্র, মন্ত্রবলে "দিগ্‌বন্ধন" করিয়াছিলেন ও গোপালনকে রক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া, পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। বার বার গৃহদ্বারে সবলে আঘাত করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন পিশাচ গোপালনের উদ্দেশ্যে নানাবিধ ভীতিব্যঞ্জক কটূক্তি করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন গ্রামের সকলে এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া চমৎকৃত হইলেন এবং দেখিলেন যে, পুরোহিত ঠাকুরের বহির্দ্বারে দারুণ আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এই ঘটনার পর, গোপালনের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং সে সৎপথে থাকিয়া ও সদাচারবান্ হইয়া জীবন যাপন করায় আর পিশাচের উপদ্রবে উত্যক্ত হয় নাই। তারপর বহুদিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও মঞ্জরী গ্রামে এই উপদেবতার অভিনব উপদ্রবের কথা আলোচিত হইয়া থাকে।

শ্রীসদানন্দ রায়।

কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন স্থিত দাস যন্ত্রে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩ নং ভৈরব বিশ্বাসের লেন হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্কিম-বাণী।

"বঙ্গ-দর্শন" সম্পাদনকালে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ-সমালোচনাচ্ছলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া যাইতেন। "বঙ্গ-দর্শনের" লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে; ইদানীং সাহিত্যক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পুরাতন "বঙ্গ-দর্শন" হইতে বঙ্কিমের কয়েকটী অমূল্য বাণী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

১

গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটী পৃথক্ বস্তু, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য্য তদ্দ্বারা কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক; এবং সুলেখকের হস্তে তাহা মহাস্ত্র। অনেক লেখক গালিকেই ব্যঙ্গ মনে করেন, পক্ষান্তরে অনেক পাঠক ব্যঙ্গকে গালি মনে করেন। আবার অনেকে নিরর্থক ছেবলামিকে ব্যঙ্গ মনে করেন।

২

আমরা ইতর লোকের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে বলি না। যে ভাষা সরল অথচ বিশুদ্ধ, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

৩

রচনা বিষয়ে অনুকরণের একটী মহদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া ফেলেন।

৪

কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন সুবুদ্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য-রচনায় সক্ষম হয়েন। অনেক সময়ে অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুকরণ দুই একজন প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে। ভাল হইলেও উপকারিতায় সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না।

৫

মানবপ্রকৃতিসম্বন্ধে কতকগুলি গূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য। তাহা কেবল কবিই দেখিতে পারেন। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য—সেইজন্য নাটকের সৃষ্টি। বঙ্গদেশে নাটকের সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—মোহন্তের মোকদ্দামা, নাপিতের মোকদ্দামা, কুলীনের বহুবিবাহ—কি মজার শনিবার, ইত্যাদি বিষয়ের প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত হয়।

৬

ভবিষ্যৎ নাটককারেরা কি লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি। আমরা তাঁহাদিগের উপকারার্থ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটী বিষয় স্থির করিয়াছি—ভরসা করি, তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মনোনীত করিবেন। যথা বাঙ্গালী মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "মুরগী নাটক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইতে পারে। আর এদেশে অশ্বের দ্বারা চাষ না হইয়া বলদের দ্বারা চাষ হয় এই কুপ্রথার নিন্দার্থ "বলদ-মহিমা" নামে আর একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। "রোড্ শেষ নাটক", "দুর্ভিক্ষ নাটক" প্রভৃতি নাটক এ পর্য্যন্ত হয় নাই—ভরসা করি, শীঘ্র হইবে।*

---

* বঙ্কিমের পর বাঙ্গালা নাটকের উন্নতি হইয়াছে; আধুনিক তথাকথিত গল্প ও কবিতা সম্বন্ধেও এই উক্তি বিশেষভাবে আলোচ্য। সংগ্রাহক।

৭

"নকল" শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জ্জিলের মহাকাব্য যে ইনিয়াদের অনুকরণ ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।

৮

যাঁহারা অনুবাদ করেন, তাঁহারা যশের অল্পই আকাঙ্ক্ষা রাখেন। অনুবাদ ভাল হইলে প্রশংসার ভাগ মূল গ্রন্থকার পাইয়া থাকেন, অনুবাদ মন্দ হইলে নিন্দার ভাগ অনুবাদকের।

৯

অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটী নিয়ম আমাদিগের নিকট তিনখানি অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখন কখন প্রতীয়মান হয় এবং লিয়ারে বা হামলেতে কখন কখন আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ নাই।

১০

ইউরোপে কাব্যরচনা বিষয়ে একটী কুপ্রথা আছে; একটী ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্যসকল সামান্ত পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটী ভাল— সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্ত্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটীই বজাই রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

গুপ্ত কথা।*

আমাদের বাড়ীতে সেদিন একটী সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন হইয়াছিল। নিমন্ত্রিতগণের ভিতরে শ্রীমতী ভবার্ট ও তাঁহার খুড়্‌তুতো ভাই রেনাঁ ডুব্‌রেল্‌ও ছিলেন।

হঠাৎ আমি শুনিতে পাইলাম, রেনাঁ বলিতেছেন; "যাই বল, আর যাই কর, আমরা এ কথাটা বুকে হাত দিয়ে ঠিক কবুল কর্‌তে পারি না যে, জীবনে অন্ততঃ একবারও আমরা কা'রও প্রতি নির্দ্দয় বা অসৎ ব্যবহার করিনি।"

শ্রীমতী ভবার্ট আমার ঠিক্ পাশটিতেই বসিয়াছিলেন। আমি বেশ লক্ষ্য করিলাম, কথাগুলি শুনিবামাত্র তিনি যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি খেদ-আকুল এবং তাঁহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল। যেন কোন স্বপ্নে-দেখা দুঃখের স্মৃতি আজ আবার নূতন করিয়া তাঁহার বুকের দুয়ারে আঘাত দিতে লাগিল।

আপনার কুসুম-কোমল কমনীয় হাতখানি দিয়া রগের উপর হইতে একগোছা এলোমেলো কোঁক্‌ড়া চুল সরাইয়া দিয়া অনুতপ্ত এবং নিম্ন কণ্ঠে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্য—সত্য কথা! বল্‌লে তুমি হয়ত' বিশ্বাস কর্‌বে না,—কিন্তু সত্য বল্‌চি, আমাকে তোমরা যতটা ভালো স্ত্রীলোক মনে কর, আসলে আমি ততটা খাঁটি নৈ! আমি ঠেকে শিখেছি যে, কোন কিছুতেই তাড়াতাড়ি যা' তা' একটা কিছু শেষ নিষ্পত্তি ক'রে ফেলা আদোপেই ভালো না! একবার নিষ্ঠুরতার চরমে গিয়ে পৌঁছে, আমি এ খাঁটি কথাটা হাড়ে হাড়ে টের্ পেয়েচি,— সেদিনের কথা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি থাকি না! ওঃ! কি নিষ্ঠুর আমি!"

তাহার পর, হৃদয় আবেগে বেপমান কণ্ঠে তিনি আমার কাছে যাহা বলিলেন,—তাহা এই—

---

* প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প লেখক Charles Foley হইতে

"ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান্ যুদ্ধের ঠিক্ পাঁচ বছর পরের ঘটনা। বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য, আমরা তখন নর্ম্মাণ্ডির সমুদ্রের ধারে। হোটেলের একটা ঘরে আমরা থাকিতাম,—আমার সঙ্গে ছিলেন মা আর রেনঁা। আমার বয়স তখন অল্প এবং আমি তখন আপনার রূপের গরবে সদাই গরবিনী ছিলাম। আমার চারিপাশে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারা সকলেই আমার চেহারার তারিফ্ করিতেন—আমাকে 'বাহবা' দিতেন। বলিতেন, 'খাসা মেয়ে! যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি নাক, তেমনি দাঁত—একেবারে তিলোত্তমা!' এমন চাটুবাদ না করিলে, কা'রও দিকে আমি নেক্ নজরে চাহিতাম না।

কিন্তু হোটেলের একজন আমার দিকে বড় একটা ঘেঁসিতেন না। তাঁহার বয়স হইবে ত্রিশ—আকৃতি দীর্ঘ—সুন্দর বলব্যঞ্জক। কিন্তু তাঁহার মুখখানি ছিল দুঃখকরুণ! তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যোদ্ধা।

তিদি সর্ব্বদাই একটা লম্বা ঝল্ঝলে পোষাক পরিতেন। সকলের চোখের আড়ালে তিনি আহার করিতেন—একজন ভৃত্য তাঁহার ঘরের ভিতর খাবার দিয়া আসিত। একলা নির্জ্জনে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। কা'রও সঙ্গে তিনি মিশিতেন না এবং অন্য কেহও তাঁহার কাছে যাইত না।

এসব আমার কাছে কেমন খাপ্ছাড়া বলিয়া মনে হইত। একদিন কৌতূহলী হইয়া আমি তাঁহার কাছে গেলাম। নিজেই সাধিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলাম। তিনি যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। আমার মনে হইল, আমি যেন তাঁহার বিরস বদনের উপরে, তৃপ্তি এবং আনন্দের একটা ক্ষণিক আভাস দেখিতে পাইলাম!

একটু উৎসাহিত হইয়া, কৃত্রিম অন্যমনস্কতা দেখাইয়া, আমি আমার হাতের দস্তানা মাটীতে ফেলিয়া দিলাম। আমার এরকম নির্ব্বোধের মত আচরণের একটীমাত্র নজীর আছে,—তাহা তরল যৌবনের চাঞ্চল্য! তিনি খানিকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর, আস্তে আস্তে সোজা একদিকে চলিয়া গেলেন। আমার দস্তানাটি না তুলিয়া দিয়াই!

সেইদিন থেকে তিনি আর আমার ছায়া মাড়াইতেন না। আমার সঙ্গে দেখা হইলেও, তিনি যেন সযত্নে আমাকে পরিহার করিয়া ফিরিতেন। রেনঁা

তাহা লক্ষ্য করিয়া খাপ্পা হইয়া উঠিলেন এবং সেই সৈনিক পুরুষের (আমরা তাঁহাকে এই নামেই ডাকিতাম) উদ্দেশে অনেক কটু-কাটব্য করিতে লাগিলেন। যদিও মুখে আমি এ ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করিয়াই উড়াইয়া দিলাম,—কিন্তু আসলে আমার রূপ-গর্ব্ব ইহাতে একান্তরূপে আহত হইয়াছিল।

ইহার পর আরও দুটি এমন ঘটনা ঘটিল, যাহাতে করিয়া আমার আহত গর্ব্ব সৈনিক পুরুষটীর প্রতি গভীর ঘৃণায় পরিণত হইয়া গেল। একদিন সকালে আমি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতেছি,—এমন সময়ে পথের উপরে একটী দুর্ব্বল বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম।

বাঁকের মুখে একটী বৃক্ষের পত্রবহুল ছায়া-ঘন নমিতাগ্র শাখা পথের উপরে অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিয়াছে—হঠাৎ বিপরীত দিক হইতে মোড় ফিরিয়া সেই সৈনিক পুরুষটি বুড়ীর সাম্‌নে আসিয়া পড়িলেন।

বুড়ী এই আকস্মিকতায় কেমন চমকাইয়া গেল। তাহার ঘাড়ের উপরে একটা ভারী মোট ছিল। সে দাঁড়াইয়া পড়িবামাত্র মোটটা তাহার কাঁধের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঝুক্‌কি সামলাইতে না পারিয়া বুড়ীও ভূ-শায়ী হইল।

আমি ছুটিয়া গিয়া বুড়ীকে তুলিলাম।

সৈনিক পুরুষটি স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দিকে ফিরিয়া বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে আমি কহিলাম, "ছিঃ, আপনি এমন অভদ্র, আমি তা জান্‌তাম না। যা হোক্, আমার কাছে এখন পয়সা নেই,—অন্ততঃ আপনি এই অসহায় বুড়ীকে যে কিছু অর্থসাহায্য কর্‌বেন, আমি এ আশা করি।"

তাঁহার মুখে একটা যাতনার দাগ পড়িল। আমি ভাবিলাম, এইবার তিনি বুঝি কোন কৈফিয়ৎ দিবেন! তাঁহার ঠোঁট দু'খানি নড়িয়া উঠিল—কিন্তু তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর একান্ত মৌনের সহিত আমার আবেদন উপেক্ষা করিয়া, তিনি শীঘ্রপদে প্রস্থান করিলেন।

কি অবহেলা! মনের ভিতরটা আমার গুমোট্ হইয়া উঠিল, ব্যথিত হৃদয়ে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া রেনাঁকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া রেনাঁ ত একেবারে রাগে গশ্‌ গশ্‌ করিতে লাগিল। কহিল, ভবিষ্যতে যখনই সে ফুরসৎ পাইবে, তখনই সে উক্ত সৈনিক বাচ্ছার কাছে সোজা গিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব যে কতটা প্রতিকূল, সেটা প্রাঞ্জল ভাষায় সাফ্ বুঝাইয়া দিয়া আসিবে।

তারপর সৈনিক পুরুষটিকে সপ্তাহ খানেক দেখিতে পাইলাম না।

আমি কহিলাম, "লোকটা ভয় পেয়ে গেছে রেনাঁ, আমাদের সাম্‌নে আস্‌তে ডরায়!"

রেনাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়!"

সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে সাঁঝের আঁধার ঘন হইয়া আসিল। রহিয়া রহিয়া বিষম দম্‌কা বাতাস, আচম্‌কা জাগ্রৎ হইয়া উঠিতেছিল এবং দুরন্ত সাগরের ফুটন্ত ঢেউগুলা ফেণার গেঁজলা মাখিয়া ধব্‌ধবে বালুর বিছানার উপরে আসিয়া পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছিল।

হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল,—কে ডুবিয়া গিয়াছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটিলাম। গিয়া দেখি,সেখানে ভয়-বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া সেই সৈনিকপুরুষ।

"দেখ, দেখ,—একটা লোক এইমাত্র জলে প'ড়ে গেল—ঐ, ঐখানে!" রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন।

ভয়ে আমিও আঁৎকাইয়া উঠিলাম।

রেনাঁ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি মশাই, আচ্ছা লোক ত আপনি! একটা মানুষ গেল ডুবে, আর আপনি কিনা স্ত্রীলোকের মত এখানে দাঁড়িয়ে শুধু চীৎকার আর নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছেন! অন্ততঃ মইখানাও সাহায্যের জন্যে জলে নামিয়ে দিতে পার্‌তেন! ছিঃ!"

বলিয়াই রেনাঁ জলে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু দুজন নাবিক তাঁহাকে বাধা দিল এবং তৃতীয় এক নাবিক সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল।

অল্পক্ষণ পরেই জলমগ্ন লোকটিকে নিরাপদে ডাঙ্গায় তুলিয়া আনা হইল এবং আমরাও আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

সৈনিক পুরুষটি স্তব্ধভাবে এতক্ষণ একদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুর এবং যাতনালুলিত; অমন সুশ্রী জোয়ালো চেহারায় ওরকম বিরস মুখ যেন ঠিক্ মানান-সৈ বলিয়া মনে হইতেছিল না।

ঘৃণা ও রাগে আমার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল; আমার ইঙ্গিতে রেনাঁ সৈনিকের সাম্‌নে গিয়া কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, "মশাই, আপনার যদি সাহস থাকে, তাহ'লে অমনভাবে কথায় তা জাহির কর্‌বেন না। আমরা বাক্য-বীরকে দুচোখে দেখ্‌তে পারি না।"

সৈনিকের চোখে আবার আমি সেই দৃষ্টি দেখিলাম; তাহাতে বুঝিলাম যে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েও তিনি বাধ্য হইয়াই আমাকে পরিহার করিয়া ফিরিতেছেন। রেনাঁর অপমানকর কথায় তাঁহার চোখের তারা কাঁপিতে লাগিল এবং আস্তে আস্তে তিনি মুখ নীচু করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ফ্যাকাসে মুখের মত, ঠোঁট দুটিও সাদা হইয়া গেল—তবু তিনি কোন কথা কহিলেন না।

তাঁহার সেই মৌনব্রত আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, "লোকটার ঠ্যাকার দেখেচ,—আবার কথা কওয়া হচ্চে না! দাঁড়াও, তোমার দেমাক্ দেখানো বার ক'রে দিচ্ছি!"

তাহার পর আমি রেনাঁর গা টিপিয়া অবহেলাভরে কহিলাম, "তুমি যদি ওঁকে প্রহার কর রেনাঁ তাহলেও বোধ হয় তোমার গায় হাত তুল্‌তে ওঁর সাহসে কুলাবে না। কাপুরুষ!"

শেষ কথাটি আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে না হইতেই সৈনিক তাঁহার মুখ তুলিলেন। সেকি তীব্র অথচ কাতর দৃষ্টি! সেই পাণ্ডু মুখের প্রতি মাংসপেশী তখন যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল তাঁহার হৃদয়মধ্যে তখন যেন এক তুমুল মানসিক সংগ্রাম বাঁধিয়া গিয়াছে।

রুদ্ধকণ্ঠে এবং ভগ্নস্বরে—সে স্বর এ জীবনে আমি ভুলিতে পারিব না—তিনি থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "শ্রীমতী, আমি কাপুরুষ নৈ, কিন্তু আপনি অতি, অতি নিষ্ঠুর! আপনার ব্যবহারে আমাকে এক গুপ্তকথা প্রকাশ

করতে হ'ল,—এ গুপ্তকথার মধ্যে যদিও লজ্জাকর কিছুই নেই, তবু এজন্যে আমাকে লজ্জা পেতে হচ্ছে। আমার মন্দ ভাগ্যের কথা ব'লে কারও কাছে দয়া ভিক্ষা করা আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, বিশেষ আপনার সাম্‌নে—তবু আপনাকেই আমায় সব বলতে হবে। আমার গুপ্তকথা এই :—প্রুসিয়ানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হয়, আমি তা'তে গোলন্দাজ সৈনিকরূপে ছিলাম। যুদ্ধের ফলে আমার দুখানা হাতই আমূল কাটা গেছে। আমার এই অসহায় অবস্থায় আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব যে, আমি কাপুরুষ নৈ—এমন কি জামা তুলেও আপনাকে যে আমার ছিন্নভিন্ন দেহ দেখাব, আমার সে শক্তি-টুকুও ভগবান কেড়ে নিয়েছেন!"

আমার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া অনুতাপ ও করুণার একটা প্রবাহ বহিয়া গেল। ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতচিত্তে আমি ঘাড় হেঁট করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। যখন মাথা তুলিলাম, দেখিলাম, ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশমাত্র না দিয়া সৈনিক পুরুষ চলিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীমতী ভবার্ট, তাঁহার কথা শেষ করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। যেন সুদূর-বিগত অতীতকে আবার তিনি জীবন্তভাবে হৃদ্‌মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "বাস্তবিক, এটা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। আপনি আর কখনও সেই সৈনিকের দেখা পান নি?"

"না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অভিভাষণ-মন্থন।*

উপকথা।

[তত্ত্বজ্ঞান, পরাবিদ্যা, বিজ্ঞান ও স্মৃতিপুরাণ]

পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা রাজ্যের রাজর্ষি। পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাঁহাদের সবেমাত্র একটি পুত্র। স্মৃতিপুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান মনে মনে সংকল্প করিলেন— যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষির ন্যায় পত্নীসহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট বৎসরের অধিক না—তা নহিলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রীবর স্মৃতি-পুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যময় ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণকে ডাকাইয়া প্রজারা যাহাতে অক্ষয় রাজভাণ্ডারের অমৃতোপম ভক্ষ্য-পানীয়-সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা সদ্ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন, আর সেই সঙ্গে—কিরূপে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ব্ববিদ্যায় এবং সর্ব্বগুণে সমৃত করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের একটা সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবরের হস্তে তাহা সযত্নে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিবর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃ পুনঃ শপথ করিলেন যে, তাঁহার জীবন থাকিতে উপদেশ-পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি-তত্ত্বজ্ঞান পত্নীসহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত সভাপতি আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণের একাংশ

মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজভাণ্ডারে অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয়-সকল যাহাতে প্রজারা সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিতমত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনেক কালের বহুদর্শিতা ও বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সব দিক্ বাঁচাইয়া যে দ্রব্যের যে মূল্য ধার্য্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের আদবেই মনঃপূত হইল না। কিয়ৎপরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয়সকল আমরা বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী। নিত্যই যদি আমাদিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়; তবে এক টাকার জিনিষ এক পয়সা মূল্যে লইতে আমাদের মনকে কোনোমত প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি; নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।" মন্ত্রিবর ফাঁপরে পড়িলেন। মন্ত্রিবরের মন্ত্রিনী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপত্নী। তাঁহার কৌশল্যা ছিলেন রক্ষানীতি, আর তাঁহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের ঐরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিনী ঠাকুরাণীরই কর্ণে পৌঁছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রিনী রক্ষানীতি বলিলেন, "ভাব্‌চ কেন অত; প্রজাদের যারা প্রধান মোড়ল—যাদের বুদ্ধি আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই তারা বুঝ্‌বে, আর প্রধানেরা বুঝ্‌লেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝ্‌বে; তা হ'লেই আপদ্ বালাই চুকে যাবে।" ছোট মন্ত্রিনী লোকরঞ্জনা বলিলেন, "দিদি যা ব'ল্‌চেন তা যদি ভাল বোঝো তবে তাই কর। সখীমণি ঘাটে জল তুল্‌তে গিয়েছিল—জল তুলে এনে আমাকে ব'ল্লে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় হ'য়েচে এম্নি যে, দুই দণ্ড তা'কে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল; আর, প্রজারা সবাই মিলে যা ব'লছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনেচে; তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর খুচরো চাষাভুসোরাই বা কি সবাই মিলে ব'লছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক না খেয়ে ম'চ্চে—আমি তা চ'কে দেখ্‌তে পার্‌ব না; তার আগে যা'তে তা আমাকে দেখ্‌তে না হয়, আমি তা না খেয়েই হো'ক্ আর যা খেয়েই হো'ক্—যেমন ক'রে হো'ক্—ক'রে ক'র্ম্মে চুকে

নিশ্চিন্তি হ'ব। তা হ'লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন আর তোমার সব আপদ বালাই চুকে যাবে।" মন্ত্রিবর তাঁর কৈকেয়ী-ঠাকুরাণী লোকরঞ্জনার শক্ত আব্দার কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না; তিনি আর কোনো উপায় না দেখিয়া রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ তত্ত্বান্নের সহিত নানাপ্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্ম্মের ভেজাল মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার জিনিস সিকি পয়সা মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স যদিও তখন খুব কম তথাপি মন্ত্রিবরের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকালপাত্রোচিত বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনা করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় নাই; আমার মত যখন তোমার চুল পাকিবে তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রীটি ছিলেন বলিয়া রাজ্য এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, নহিলে কোন্ কালে তাহা রসাতলে যাইত।" বিজ্ঞান বলিল, "আপনি ঐ যে কদর্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও যে বিষ!" মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ বলিলেন, "ঐ দ্রব্যগুলারই মধ্যে দুই চারি ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে তাহা অমন ধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া খাইতে পারে।" মন্ত্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিবরকে বলিল, "আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্য করিবেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর আষ্টেক পরে যখন আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে, সত্য কথা বালকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে, আর অশুভ কার্য্য প্রবীণের হাত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশুভ বই শুভ নহে।" বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারত-ভূমির নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর, কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার বাহুবলে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রীসকল উদরস্থ হওয়াতে করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-কর্ম্মের

ভারে তত্ত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্য্য সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়া আর্য্যসভ্যতা অধম বর্ব্বরতায় পর্য্যবসিত হইল। তাই আমাদের আজ এই দশা!

বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারের যে কিরূপ বিষময় ফল এই তো তাহা দেখিলাম। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য-জ্যোতিকে তিলমাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই পারিবেও না।

প্রবীণ স্মৃতিপুরাণ নবীন বিজ্ঞানকে এই যে একটি কথা বলিয়াছিলেন যে, রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্যপেয় সামগ্রীতে সহস্র ভেজাল-মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ ফোটা অমৃত য[illegible] সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা সকল রোগের মহৌষধ, তাঁহার এ কথা সত্য বই মিথ্যা নহে, তার সাক্ষী রামায়ণ এবং মহাভারত এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার তাও বলি—মন্ত্রিবরের উপরে রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে তাঁহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে আপনার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। ব্যবহারিক সত্যের জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া উঠা যতদূর সম্ভবে—বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পারমার্থিক সত্যের ক-খ-গ-ঘও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিল না। বিজ্ঞানের উচিত ছিল—ভারতভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের শূন্য উপর-মহলটা পূরাইয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী—প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়া—কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পর ক্লেশ, ভয়ের পরে

ভয়, যাহা যাহা ঘটিবে তাহা ভারতময় ঢ্যাঁট্‌রা পিটিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্রীর হিত পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন; ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার লোকপূজ্য পিতার নিকটে দীক্ষিত হউন। দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভ্যতার যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূর্ণ করুন; তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে, আর তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রতীচ্য রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন।*

প্রাচীনকালে দার্শনিক বিদ্যা ভারতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচ্য দেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপ পশ্চিমে দার্শনিক বিদ্যা গ্রীসে জন্মলাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং এক সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের ন্যায় চিন্তারও বাণিজ্য যে প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। পাইথাগোরাসের (Pythagoras) জন্মান্তরবাদ ও সাধন-প্রণালী যে ভারতীয় দর্শন ও সাধনের নিকট ঋণী, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পরস্পর আদান-প্রদানে ভাবসম্পদ্ অনেক বাড়িয়া যায়, আমাদিগের দার্শনিক সাহিত্যের পক্ষে এরূপ ঋণগ্রহণ যে নিতান্ত স্বাভাবিক ও শুভাবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রবাহ কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। মানবের চিন্তা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশূন্যতা বা জড়ত্বই চিন্তার অভাব সূচনা করে। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে নূতন নূতন ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনও একটি ভাবের ধারা বা আদর্শ চিরকালের জন্য কোনও জাতির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শনসমূহের একটি সাধারণ গতি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যক্তিগত

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের দার্শনিক শাখার সভাপতি ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের অভিভাষণের একাংশ।

আত্মার মুক্তিসাধনই সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই হউক, নির্ব্বাণই হউক, আর ব্রহ্মস্বরূপত্ব-প্রাপ্তিই হউক, যে কোন উপায়ে মানবাত্মার মোক্ষ-সাধনই পরমপুরুষার্থ। ইহাই একমাত্র কাম্য; ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আত্মাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে, মায়ার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে, উপাধিশূন্য হইতে হইবে, অনাদি বাসনা-সন্তান ধ্বংস করিতে হইবে। কেন? মুক্তির জন্য; সংসার-বন্ধন-মোচনের জন্য; আত্মার কল্যাণের জন্য; নিঃশ্রেয়স-লাভের (Sumnum bonum) জন্য। সাধারণতঃ ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্র।

গ্রীকদর্শনের গতি ছিল স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল বিধান করাই গ্রীক দর্শনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতেই গ্রীকদিগের জাতীয় প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল। দর্শনেও তাহাদের এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই। মানব-জীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটি সুস্থ সামঞ্জস্যের ভাবে গঠন করিয়া লইতে তাহারা তাহাদের চিন্তা-প্রণালী নিয়োজিত করিয়াছিল। প্রথম হইতেই গ্রীকদিগের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের সহিত অতি নিবিড়ভাবে জড়িত দেখিতে পাই। আদিম অধিবাসীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়াই হউক, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নগর বা সমাজ হইতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্যই হউক, গ্রীকেরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। এইজন্য ভারতীয় দর্শনে যেরূপ মানবাত্মার কল্যাণ অথবা ব্যক্তিগত মোক্ষের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক দর্শনে সেইরূপ প্রধানতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের হিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতীয় ও গ্রীক উভয় দর্শনের মূল কথা আত্মা ও জগৎকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা। ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শন আত্মার ও বিশ্বের জ্ঞানকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—দুঃখ-নিবৃত্তি পুনরাবর্ত্তন-রাহিত্য বা নির্ব্বাণের অভিমুখে নিয়োজিত করিয়াছিল। গ্রীক দর্শন আত্মা ও জগতের জ্ঞানকে মানবজীবনের সুখ,

সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ-বিধানের জন্য এবং রাষ্ট্রের হিতের ও উন্নতির উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। ভারতীয় চিন্তার গতি হইল ব্যক্তিগত আত্মার হিতের দিকে, শ্রেয়ের দিকে, যোগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে। গ্রীসীয় চিন্তার গতি হইল—রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে, সামঞ্জস্যের দিকে, কর্ম্মের দিকে।

বর্ত্তমান সময়েও পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক ভাবের প্রভাব দেখা যায় এবং আমাদের দেশেও প্রাচীন ভাবের প্রভাব এখনও রহিয়াছে। গ্রীকভাবের প্রভাবে পাশ্চাত্যজগৎ বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম ও গূঢ় তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিয়া মানব-জীবনের সুখ ও আধিপত্যের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে এবং রাষ্ট্রে সুশাসন স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। আর আমরা এখনও মুক্তি পথ কোন্ দিকে তাহার বার্ত্তা জানিবার জন্য সেই প্রাচীনকালের তপোবনের স্বপ্ন লইয়া বসিয়া আছি।

ভারতীয় এবং বিদেশীয় মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই দুইটি আদর্শকেই যে কতকটা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না। মহাভারত এবং মনুসংহিতায় রাষ্ট্র-হিতের একটি সুন্দর কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটোর (Plato) দর্শনে এই উভয়বিধ আদর্শের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেমন নিত্য চিরন্তন সত্যসুন্দরমঙ্গলস্বরূপকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে রাষ্ট্র বা সমাজের কল্যাণ ও সামঞ্জস্য-কল্পনাও তিনি অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। প্লেটো যে শুধু দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন মহা-ঋষি ছিলেন। ঋষি শুধু সত্যের প্রচারক নহেন, তিনি দ্রষ্টা।

এরিষ্টটল্ (Aristotle) তাঁহার গুরু প্লেটোর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা পাইয়াছিলেন এবং সে অসাধারণ প্রতিভার আলোক আরও কত উজ্জ্বলভাবে নানা বিষয়ের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুর সেই ঋষিভাবটুকু তেমন প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্লেটোর যথার্থ ঋষিভাবটি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। অনেক দিন পরে যদিও প্লেটোর প্রভাব সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছে,

কিন্তু তাঁহার সেই ঋষিত্ব আর পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নাই।

ঋষি সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে দর্শন করেন, প্রত্যক্ষ করেন, জীবনের অন্তরতম অন্তস্তলে অনুভব করেন। এই যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করা, ইহার নামই দর্শন। সুতরাং যথার্থ দার্শনিক হইতে হইলে ঋষি হওয়া চাই। শুধু সত্যের বিশ্লেষণে প্রকৃত দার্শনিক হওয়া যায় না।

ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে এই ঋষিভাব বহুলপরিমাণে না থাকিলেও ইহাদের নিকট আমাদের শিখিবার ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না। সমস্ত বাস্তব জগৎকে কাল্পনিক মনে করিয়া ইহ-জীবনের সমস্ত বস্তু হেয় বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক জগতের নিত্য নব আবিষ্কারে আর উদাসীন থাকা সম্ভব নহে। জড়জগতের এই সকল সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইলে সত্যের এক অংশের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে একটা নিগূঢ় সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা পাশ্চাত্য দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষ্য। এ বিষয়ে গ্রীক দর্শন যে সুমহান্ আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে উপেক্ষার সামগ্রী নহে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তার দুইটি ধারাকে একত্র করিতে পারিলে জগতের দার্শনিক জ্ঞান-ভাণ্ডার অভাবনীয়রূপে উন্নতি লাভ করিবে।

একদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের নিকট আমাদের যেমন শিখিবার বিষয় রহিয়াছে, তেমনি আমাদের দর্শনের নিকটেও পাশ্চাত্য জগৎ অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিকতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্বকালেই সর্ব্ব জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপীয় চিন্তার উপর এই ভারতীয় ভাবের প্রভাব ক্রমশঃ লক্ষিত হইতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া জড় জগতের ও বাস্তবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে নিরুদ্ধ করিতে বসিয়াছিল; বাহ্যবস্তু-জনিত সুখ ও ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধির সন্ধানে তাহারা ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ ও বৈরাগ্যের মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। আবার এ সকলের দিকে পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত

ধীরে ধীরে ফিরিতেছে। এইজন্যই আমার মনে হয় যে, ভবিষ্যতের দার্শনিক ইতিহাস গ্রীক ও ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রণেই ও সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে!

ইংরেজের রাজ্যবিস্তারফলে ভারতে এই উভয় আদর্শের সম্মিলন ঘটিয়াছে। এ সুযোগ আমরা যেন পরিত্যাগ না করি। গ্রীক আদর্শকে অঙ্গীভূত করিয়া ভারতীয় দর্শন যে আদর্শের সৃষ্টি করিবে, তাহা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হইবে। এই সম্মিলন ও সামঞ্জস্য পাশ্চাত্য জগতেরও এখন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে। যদি আমরা এই দুইটি আদর্শকে মিলিত করিয়া জগতের সমক্ষে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে সে গৌরব হইতে আমরা বঞ্চিত হইব কেন? এইরূপভাবে যদি আমাদের দার্শনিক সাহিত্য উন্নতি লাভ করে, তবে তাহার প্রভাব সমস্ত সভ্য জগৎ অনুভব করিবে। এক সময়ে যদি ভারতের চিন্তার দ্বারা চীন, পারস্য, মিশর, গ্রীস প্রভাবিত হইয়া থাকে, তবে এ আশা আকাশ-কুসুম মাত্র নহে যে, আবার এমন দিন আসিবে যখন ভারতের দার্শনিক চিন্তা জগতের চিন্তারাজ্যে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর বিপ্লব উপস্থিত করিবে।



কোম্পানীর আমলের চিত্র।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে প্রকাশিত কতিপয় ইংরাজী সংবাদপত্র পর্য্যালোচনা করিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। ইউরোপের মধ্যযুগের 'ডুয়েল' (Duel) বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করিতে তদানীন্তন কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ বিরত হইতেন না।

যখন সার জন ম্যাকফার্সন (Sir John Macpherson) ভারতের শাসন-কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত তখন তিনি একদিন মেজর ব্রাউন (Major Brown)

নামক কোনও ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিমিত্ত একখানি আহ্বানলিপি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা গেজেটে কোম্পানীর পক্ষ হইতে ব্রাউনের সম্বন্ধে কি এক গ্লানিজনক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ভারতের শাসনকর্ত্তা শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য দায়ী, সুতরাং তাঁহার শাসন-কর্ত্তৃত্বাধীনে একখানি সরকারী পত্রে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় মেজর ব্রাউন তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। কোম্পানীর প্রেরিত বিবরণে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা যেভাবে বিবৃত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভারতের শাসনকর্ত্তা কিম্বা কোম্পানীর অধীন অন্য যে কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে অথবা মন্ত্রণা সভার কোন সদস্যকে কিম্বা অন্য যে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ব্রাউন যেভাবে আহ্বান করিয়াছেন, ঐভাবে আহ্বান করা নিতান্ত বিসদৃশ এবং গর্হিত কার্য্য। এইরূপ নিন্দনীয় কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইলে ভবিষ্যতে নিম্নতম কর্ম্মচারীদিগের নিকট উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলা সুকঠিন হইবে এবং উহাতে সরকারী কার্য্যেরও সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যদি কোনও কর্ম্মচারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ইচ্ছায় হউক অথবা ভ্রমবশতই হউক কোনপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত বিচারালয়ের দ্বার৷ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। আর একটী দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা এই প্রসঙ্গে বলিব। বোধ হয় তাহার সম্বন্ধে সকলেই অল্পাধিক অবগত আছেন।

ভারতের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হেষ্টিংসকে তাঁহারই মন্ত্রণাসভার অন্যতম সদস্য সার ফ্রান্সিসের (Sir Francis) সহিত ঐরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ফ্রান্সিস্ এদেশে পদার্পণ করা অবধি হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ! অবশেষে ফ্রান্সিসের উপর্য্যুপরি অসদ্ব্যবহারে হেষ্টিংসের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল! তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে সরকারী 'মিনিট বুকে' (Minute book) নিম্ন লিখিত মন্তব্যটী প্রকাশ করেন :—

ফ্রান্সিসের আন্তরিকতায় আমার আস্থা নাই। আমার বিশ্বাস আন্তরিকতা বলিয়া কোন জিনিষ তাঁহার মধ্যে নাই। তাঁহার ভিতরকার খবরসম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—আমি তাহা হইতেই তাঁহার বাহিরের চরিত্র অনুমান

করিতে পারি। আমি ভিতরকার খবর যতদূর অবগত আছি তাহাতে আমার বোধ হয় যে তিনি সাধুতা ও সম্মান-বর্জ্জিত।

ফ্রান্সিস্ সর্ব্বদাই হেষ্টিংসের সহিত কলহ করিবার সূত্র অন্বেষণ করিতেন। তিনি হেষ্টিংসের ঐ উক্তি পাঠ করিবামাত্র তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। হেষ্টিংসও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ১৭ই তারিখে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই ঘাত-প্রতিঘাতের বিনিময় চলিতে লাগিল। অবশেষে ফ্রান্সিস ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন! দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসান হইল বটে, কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে কাগজে কলমে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল।

পশু-যুদ্ধ।

১৭৬৬ খৃঃ লর্ড ক্লাইব পশুযুদ্ধ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল :—

তিনি লিখিয়াছেন, আমরা এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। গত কল্য নবাব বাহাদুর এক ব্যাঘ্র-যুদ্ধের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যে দুইটী ব্যাঘ্র আছে তাহাদের অপেক্ষা এই ব্যাঘ্রটা অনেকাংশে দীর্ঘকায় এবং ভয়ঙ্কর। এই কৌতুক অবশেষে বড় বিয়োগান্ত হইয়াছিল।

পরে তিনজন মানুষের সহিত মহিষের কি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুদ্ধ! ফিল্‌পট্ (Philpott) আমায় বলিলেন যে, একটী মহিষ নাকি তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ঐ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটে :—

আজ ব্যাঘ্র, মহিষ, হস্তী, গণ্ডার এবং উষ্ট্র প্রভৃতির মধ্যে যুদ্ধ হইবার কথা ছিল। একটী প্রশস্ত চতুষ্কোণ স্থান ঐ যুদ্ধের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ছয়টী মহিষের উপর ছয়জন আরোহীকে চড়াইয়া দিয়া ঐস্থানে রাখা হয়। পরে একটী ব্যাঘ্রকে উহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঘ্রটী ছয়টী মহিষের মধ্যে একটীকে আক্রমণ করিবার জন্য একবারও চেষ্টা করিল না। একটী মহিষ সর্ব্বপ্রথম ব্যাঘ্রটীর দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু তাহার পর আর তাহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও ক্রীড়া হইল না।

অতঃপর তাহারা আবার একটী সুবৃহৎ সুন্দর বনের ব্যাঘ্রকে রঙ্গস্থলে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই তাহার পিছনকার পা দুইটী জখম হওয়াতে সে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তবুও সে উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মহিষটীকে ব্যাঘ্রের দিকে চালিত করা হইলে সে ব্যাঘ্রটীকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অনায়াসেই তাহাকে মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দিল। জন্তু দুইটীর মধ্যে বিশেষ কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব না থাকায় খেলা খুব কমই হইয়াছিল এবং আমরাও তেমন আমোদ পাই নাই। পরিশেষে ব্যাঘ্রটী হত হওয়াতে এবং অধিক বিলম্ব হওয়াতে সে দলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কতকগুলি উষ্ট্র রঙ্গস্থলে আনীত হইল। তাহারা পায়ে পায়ে জড়াইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে কোনও আমোদই হইল।

একটী হস্তীকে পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের অগ্রেই সেটী ক্ষিপ্ত হইয়া রঙ্গভূমির চতুঃপার্শ্বস্থ জনতা ভেদ করিয়া পলাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ঐ সময় সেই ভীষণ জনতার মধ্যে সাত আট জন হতও হইল। কিন্তু অচিরেই হস্তীটা বাধাপ্রাপ্ত হইল। তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াতে সে একটা বাগানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দূরে একটী "খড়ো-ঘরের" চাল মস্তক দ্বারা উত্তোলন করিয়া ধরিল। তাহার মাহুত ঐ সময় তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিলে ঘরখানি যে ভূমিসাৎ হইত এবং আরও অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

হস্তীর খেলার এইখানেই শেষ হইল। গণ্ডারগুলি কিছুতেই নড়িল না, কাজেই তাহাদের যুদ্ধদর্শন আর আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

.........২০শে ডিসেম্বর।

আজ আবার হস্তিযুদ্ধ। ক্রীড়া আরম্ভের বহুপূর্ব্ব হইতেই লোকসমাগম হইতে লাগিল। সহরের সমস্ত লোক আসিয়া রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল।

আরোহীর সহিত দুইটী হস্তী এবং দুইটী হস্তিনীকে রঙ্গস্থলে আনা হইল। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এই-রূপে বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল।

যুদ্ধকালে উহাদিগের মধ্যে একটী আর একটীকে উর্দ্ধে তুলিয়া প্রায় মাটিতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। ইহাদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম যে, যদি কোন প্রকারে একটী হস্তী মাটিতে পড়িয়া যায় তবে অপরগুলি তাহাকে পদদলিত করিয়া হত্যা করে। তাহার পর সকলে দৌড়িয়া পলায়ন করে। এক্ষেত্রেও প্রায়—সেইরূপই দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা নিজের মাহুতকে এমন সতর্কতার সহিত রক্ষা করে যে, নিজের জীবনপাতেও তাহার কোনও প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতে দেয় না।

জুয়াখেলা।

কোম্পানির রাজত্বকালে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে জুয়াখেলার প্রভাব প্রবল ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। কথিত আছে, রিচার্ড বারওয়েল (Richard Barwell) ফিলিপ ফ্রান্সিসের সহিত তাসের জুয়ায় ৪০,০০০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত হারিয়াছিলেন।

ফ্রান্সিস নিজেই বলিয়াছেন ;—"On one blessed day of the present year of our Lord (1776), I had own about twenty thousand pounds of whist." অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরের (১৭৭৬) এক শুভদিনে হুইষ্ট (whist) খেলায় (তাসের জুয়ায়) আমি প্রায় বিশ হাজার পাউণ্ড জিতিয়াছি '

লর্ড টেনমাউথ (Lord Teignmouth) বলেন যে, আরণ্য প্রদেশের বীর শাসনকর্ত্তা ক্লীভল্যাণ্ডের (Cleaveland) চরিত্রে একটী দোষ ছিল,—তাহা জুয়া-খেলার প্রতি অত্যধিক আসক্তি।

চার্লস্ চ্যাপম্যান্ (Charles Chapman), যিনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস কর্ত্তৃক কোচীন চীনের উপকূল-আবিষ্কারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ৭০,০০০ পাউণ্ড লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান, কিন্তু ঐ অর্থের প্রায় সমস্তই জুয়াখেলায় ব্যয়িত হইয়াছিল।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিনিময়ে।

গাঙের পারে ভাঙা কুঁড়ের নিতাই চাষা কর্‌ত বাস ;
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে খাটিয়া খেত বারটি মাস।
ভরত পাখী তাহার মত ছিল না এত হর্ষে ভরা,
পরিতৃপ্ত মন সে যে তার—শান্তি-শশী বিরাজ করা !
মনের সুখে করম-শেষে, গাইত গান সন্ধ্যা ভোর,—
"হিংসা আমি করি না কারো কেউ করে না হিংসা মোর।"
শুনিয়া রাজা কহিল,—"সখে, ভ্রম সে তোমার—সত্য নয়,
যা'কিছু মোর তোমার সাথে কর্‌বারে সাধ বিনিময়।
রাজা আমি, ভাণ্ডারে মোর টাকা কড়ির অভাব নাই,
কিন্তু আমি তোমার মত, শান্তি-সুধা কোথায় পাই ?
কালো ছেঁড়া পাগড়ী তোমার, মুকুট হ'তে মূল্যবান্।
শান্তিধন হেরিয়া তব, রাজ-কোষ হয় হেয় জ্ঞান।
জীর্ণ তব কুটীরখানি, উপহাসে সে সৌধ মোর !
বিদায় সখে ! ব'লো না আর, 'কেউ করে না হিংসা মোর।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—*—

রাণা কুম্ভ।

বিগত পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেবার স্বাধীন ছিল। মেবারের গৌরবে ভারতবর্ষ পূর্ণ ছিল। মেবারের রাজগণ দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য ও স্বদেশবাৎসল্য প্রভৃতি গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মেবারের অর্থ, মেবারের সৌন্দর্য্য, মেবারের কলাবিদ্যা,

মেবারের ক্ষমতা অপরাপর নরপতির ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিত। মেবার তখন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ছিল। ব্রাহ্মণের বেদগীতিতে মেবার-ভূমি মুখরিত হইত। প্রতি হিন্দুর গৃহেই তখন রামায়ণ, মহাভারতের সুললিত কাহিনী উচ্চারিত হইত। মেবারের বীরগণ শৌর্য্যে, বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা মৃত্যুকে ভয় করিত না। যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের নিকট ক্রীড়াস্থলস্বরূপ ছিল। স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণদান করাই তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক পরাজয়ের আশঙ্কা থাকিলে মেবারের পুরুষেরা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিত এবং স্ত্রীলোকেরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জহর-ব্রতের উদ্‌যাপন করিত। মেবার তৎকালে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এখনও তাঁহাদের বংশধরেরাই মেবারের সিংহাসনে বিরাজমান।

১৪১৯ খৃঃ অঃ রাণা কুম্ভ মেবারের নরপতি হন। তাঁহারই পিতার রাজত্ব-কালে ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে তৈমুর নামক এক তাতার কর্ত্তৃক দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয় এবং সেই সুযোগে ভারতে কতকগুলি স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপিত হয়। সুতরাং রাণা কুম্ভের সময়ে পাঠান-গৌরবরবি পশ্চিম গগন ম্লান করিয়া অস্তমিত হইতেছিল। মেবার তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও পরাক্রান্ত রাজ্য। রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ একটী গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। কিন্তু কুম্ভ সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৪৪০ খৃঃ অব্দে মালব ও গুজরাটের ভূপতিদ্বয় এক বৃহৎ সেনা সহকারে মেবার আক্রমণ করেন। মালবের এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। অনেক রক্তপাতের পর রাণা কুম্ভ সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং মালবের রাজা বন্দী হয়েন। কিন্তু সে অবস্থায় তাঁহাকে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। অল্পদিন পরেই কুম্ভ তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া উপঢৌকন সহকারে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। রাণা কুম্ভ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিয়া মেবারের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মেবার রাজ্যে গভীর শান্তি বিরাজ করিত। তিনি একাধারে কবি, বীর, দয়ালু ও উদার ছিলেন। পলায়নপর বা অসহায় শত্রুকে তিনি বিনাশ করিতেন না এবং বন্দী রাজগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি বহু দুর্গ নির্ম্মাণ এবং সুন্দর হর্ম্ম্য ও মন্দির প্রস্তুত করিয়া রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

এইজন্য তাঁহার নাম আজও জ্বলন্ত অক্ষরে রাজপুত ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। অশেষগুণালঙ্কৃতা, রূপলাবণ্যময়ী, রাঠোর-রাজকন্যা সুপ্রসিদ্ধা মীরাবাই তাঁহার পত্নী ছিলেন। স্বামীর ন্যায় তিনিও কবি ছিলেন এবং স্বীয় জীবন লোকহিতকর-কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাণা কুম্ভ সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী স্বীয় পুত্র উদা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর মেবার-সূর্য্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সে তিমিরে কতিপয় প্রদেশ মেবারের হস্তচ্যুত হয়।

শ্রীমুকুন্দমোহন সান্যাল।

আহার ও পরিচ্ছদ।

দেশভেদে লোকের আহার ও পরিচ্ছদের ভিন্নতা দেখা যায়। আবার জাতি ধর্ম্ম ও বয়সভেদে একই দেশমধ্যে আহার ও পরিচ্ছদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেই ভিন্নতা কেন হইল এবং তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া সুযুক্তির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

কোন ধর্ম্মের সহিত কোন পোষাকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কোন দেশের কোন ধর্ম্মগ্রন্থে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য কোন পোষাক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তথাপি কোন কোন জাতীয় লোক কোন কোন কার্য্য উপলক্ষে কোন কোন বিশেষ পোষাক পরিয়া থাকে, তন্মধ্যে কোন কোন প্রকার পোষাক ধারণের কারণ আছে। যেমন—

(১) কোন অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যথাসাধ্য উত্তম সাজে যাওয়াই উচিত। কেননা তদ্দারাই প্রথম মর্য্যাদা প্রকাশ হয়।

(২) নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনে ও বিবাহকালে সুন্দর পোষাক ধারণ করা আবশ্যক। কেন না তদ্দারাই তাহাদের পরস্পরের চিত্তাকর্ষণ হয়।

(৩) যোদ্ধাদের পক্ষে সুদৃঢ় দেহরক্ষক আঘাতনিবারক বীরত্বব্যঞ্জক পরিচ্ছদ প্রয়োজনীয়।

(৪) গুরু পুরোহিত ও বৃদ্ধ লোকদের নানাবর্ণশোভিত জমকাল পোষাক দূষ্য, কেননা তাহাতে তাহাদের বিলাসিতা প্রকাশ হয় এবং সম্মানের হ্রাস হয়।

(৫) শীতকালে মোটা আঁটা গরম পোষাক প্রয়োজনীয়। তেমনি গ্রীষ্ম-কালে পাতলা ঢিলা কাপড় ধারণ করা সুসঙ্গত।

আর কতকগুলি পোষাক ধারণের কোন নৈসর্গিক হেতু নাই। তাহা কেবল চিরাগত প্রথানুসারে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। যেমন হিন্দুদের যজ্ঞীয় পোষাক এবং মুসলমানদের নমাজের পোষাক ইত্যাদি। আমরা বাল্যাবধি যে পোষাকে লোকদিগকে ধর্ম্মক্রিয়া করিতে দেখিয়াছি সেই পোষাক ধারণ করিলে আমাদের মনে স্বভাবতঃই ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়। সেই পোষাকের সহিত প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে সেই পোষাকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, বদ্ধমূল সংস্কারই (Long association) তাহার কারণ। আমরা যদি বরাবর লম্পটদিগকে সেই পোষাক পরিতে দেখিতাম, তবে সেই পোষাক ধারণ করিলে আমাদের মনে ধর্ম্মভাব না হইয়া কামভাবের আবির্ভাব হইত। আমি দেখিয়াছি যে, হিন্দুস্থানী আর্য্যেরা চাপকান গায়ে দিয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া উপনয়নকালে ব্রহ্মচারী সাজে। তথায় বহুদিন যাবৎ ঐরূপ পোষাক প্রচলিত হওয়ায় ঐ পোষাকেই তাহাদের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন ধর্ম্মের সহিত কোন পরিচ্ছদের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই।

পূর্ব্বে জাতীয় পোষাক বলিয়া হিন্দু মুসলমানের কোন গোঁড়ামি ছিল না এবং তাহা থাকাও সঙ্গত নহে। বরং যে স্থানে যেরূপ জলবায়ু ও অবস্থা, সেখানে যেরূপ পোষাকে স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হয় তদনুরূপ পোষাক পরাই কর্ত্তব্য। সেই যুক্তি অবহেলন জন্য ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ। ইংরেজেরা সেই স্বদেশে যেমন মোটা আঁটা কাপড় ব্যবহার করেন, ভারতের উষ্ণ ভূমিতে তদ্রূপই করেন। কাজেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেইরূপ উষ্ণ দেশের লোক ঠাণ্ডা দেশে গিয়া যদি খালি গায় থাকে অথবা পাতলা ঢিলা কাপড় পরিয়া জাতীয় পোষাক রক্ষা করিতে চাহে, তবে অবশ্যই ব্যারাম হইয়া পড়িবে।

বস্ত্র অপেক্ষা খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অনেক বেশী। খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্মেরও কতক সম্বন্ধ আছে। সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই খাদ্যাখাদ্য-বিষয়ে কতক বিচার আছে

এবং কোন কোন বস্তু অখাদ্য বলিয়া বিধান আছে। জ্ঞানবান্ লোক অনেক দেশেই সময়ে সময়ে আবির্ভূত হন। তাঁহারা আপনাপন দেশের জলবায়ু, অবস্থা ও প্রয়োজন-দর্শনে সেই দেশের লোকের উপযোগী আচার-ব্যবহার এবং খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে সেই দেশে সেইকালে মহোপকার হয়। কিন্তু দেশান্তরে ও সময়ান্তরে সেই ব্যবস্থা ততদূর উপকারী হয় না, বরং প্রচুর অনিষ্টকারী হইতে পারে।

ইংলণ্ড যেরূপ শীতল দেশ তথায় শরীরের তাপ রক্ষা করাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। পক্ষান্তরে আমাদের উষ্ণদেশে গ্রীষ্মকালে শরীর ঠাণ্ডা রাখাই স্বাস্থ্যকর। সেইজন্য বিলাতী স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকাংশ নিয়ম আমাদের দেশে ফলদায়ক হয় না বরং অনিষ্টকর হয়। এই নিয়ম যে, কেবল বিদেশের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য তাহাও নহে। দেশের মধ্যেও স্থানভেদে, সময়ভেদে খাদ্য ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যেমন—

(১) শীতপ্রধান কাশ্মীরের খাদ্য ও বস্ত্র গ্রীষ্মপ্রধান মান্দ্রাজের উপযুক্ত নহে। তদ্রূপ মান্দ্রাজের প্রচলিত খাদ্য ও বস্ত্র কাশ্মীরের যোগ্য নহে।

(২) পূর্ব্ব বঙ্গের জল ভারী এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। সেই জলদোষ না কাটিলে কফ, কাশি, শোথ, বাত, গলগণ্ড এবং কোষবৃদ্ধি রোগ হয়। সেই দোষ কাটিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে লঙ্কা, মরিচ, মশুরীর দাইল এবং কিছু কিছু গাঁজা সেবন কর্ত্তব্য, আর তথায় অম্ল ও কাঁচা মাস, কলাইর ডাইল খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পশ্চিম দক্ষিণ বঙ্গে রাঢ় দেশে জল বায়ু অতীব উষ্ণ ও রুক্ষ। তথায় জল দেওয়া ভাত, কাঁচা মাষ কলাইর ডাইল, পুঁই শাক এবং প্রচুর অম্ল সেবনীয়। পূর্ব্ববঙ্গে রাঢ় দেশীয় খাদ্যগ্রহণে জ্বর, কাশি, শোথ, বাত প্রভৃতি রোগ হইয়া জীবন শেষ হয়। তেমনি রাঢ় দেশে পূর্ব্ববঙ্গের রীতিতে আহার করিলে রক্ত আমাশয় ব্যারাম হইয়া অচিরে মৃত্যুর কারণ হয়।

আমাদের দেশীয় বহুলোকের কার্য্যকারণবোধ নাই। তাহারা সকল বিষয়েই ইংরেজের অনুকরণ করিতে চাহে। কিন্তু ঐক্য, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, সাহস, উৎসাহ প্রভৃতি যে সকল মহৎ গুণে ইংরেজের উন্নত অবস্থা হইয়াছে তাহা অনুকরণ করা অতি কঠিন, এজন্য নকল সাহেবগণ সে বিষয়ে অনুকরণ জন্য চেষ্টা না করিয়া কেবল আহার ও পরিচ্ছদ-সম্বন্ধেই বিলাতী নকল করিয়া থাকে। শীতল

দেশীয় খাদ্য ও বস্ত্র ভারতের উষ্ণভূমিতে গ্রহণ হেতু ইংরাজদিগেরও অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাল্যাবধি অভ্যাসহেতু তাঁহাদের অনিষ্ট কম হয়! অথচ এতদ্দেশীয় যেসকল লোক বিলাতী রীতিতে খাদ্য ও পোষাক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অতি শীঘ্র আয়ুক্ষয় হয়। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ জজ দ্বারকানাথ মিত্র, কোচ-বেহারের মহারাজ নরেন্দ্রনাথ ভূপ বাহাদুর এবং দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের অকাল মৃত্যুর উপরি-উক্ত কারণ সুবিজ্ঞ ইংরাজ ডাক্তারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখন বিলাতি নকল করিবার প্রবৃত্তি ক্রমেই এদেশীয় লোকের কম হইতেছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক।

আমাদের দেশে শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য আহার ও পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণীয়—

(১) গ্রীষ্মকালে ঢিলা পাতলা কার্পাস বস্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চাদর, চোগা, ওবর কোট প্রভৃতি পাতলা রেশমী কাপড় হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু পশমী কাপড় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

(২) শীতকালে তুলাভরা আঁটা কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। পশমী কাপড়ও অনিষ্টকর নহে। বিশেষতঃ সাল, রুমাল, চোগা, ওবর কোট প্রভৃতি আলগা কাপড় লোমজ হইলে কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু তুলাভরা বালাপোষ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

(৩) ইহা সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য যে, তুলাভরা কাপড়ের ওম যাদৃশ সুখকর এবং উপকারী কোনপ্রকার পশমী কাপড় তদ্রূপ নহে। মোগল সম্রাট্ ও নবাবগণ তুলাভরা কাপড় সর্ব্বোত্তম বলিয়া পছন্দ করিতেন। পারস্যে, মিশরে, রোম সাম্রাজ্যে তুলাভরা কাপড়ের খুব আদর ছিল। ইংরেজেরা বিদেশীয় উত্তম জিনিস অপেক্ষা স্বদেশীয় অপকৃষ্ট দ্রব্যও সমধিক সমাদর করে; সেইজন্য বিদেশী তূলার কাপড় অপেক্ষা স্বদেশী পশমী কাপড়ের প্রতি তাহাদের পক্ষপাত বেশী।

খাদ্যবিষয়ে—

(১) একরসবিশিষ্ট দ্রব্য অতি অল্পই সেবনীয় অর্থাৎ যে যে বস্তুতে কেবলমাত্র লোণা, তিতা, টক, ঝাল, মিষ্ট বা কষায় রস আছে তাহা অতি অল্পই খাইতে হয়।

(২) যাহাতে বহুরস সংযুক্ত আছে অথচ কোন রসের প্রাবল্য নাই তাহাই অন্ন। সেই অন্ন দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে অর্থাৎ পেট করিয়া খাইবে। অথচ অতি ভোজন করিবে না।

(৩) চাউল, গম ও যব এই শস্য হইতে যে খাদ্য তৈয়ারী হয় তাহাই সদন্ন অর্থাৎ উত্তম অন্ন। তাহাতে যে আঠা থাকে তাহাই শরীরের পোষক ও বীর্য্য-বর্দ্ধক।

অনুমান হয় যে, আলু হইতে যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাও সদন্ন মধ্যে গণ্য হইতে পারে ; কেননা তাহাতেও আঠা আছে। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সময়ে এদেশে আলু ছিল না তজ্জন্যই আলু-জাত খাদ্যকে সদন্ন বলা হয় নাই।

(৪) ভোক্তার শরীরের রক্ত যে পরিমাণে গরম সেই পরিমাণ গরম দুগ্ধ সেবনীয়। তদপেক্ষা বেশী গরম দুধ রেচক হয় এবং কম গরম দুগ্ধ শ্লেষ্মা-বর্দ্ধক হয়।

(৫) কলা, কাঁঠাল, আম প্রভৃতি ফল-ভক্ষণের পর জল খাইতে বিস্বাদ বোধ হয়। সেই জল খাইলে পরিপাকের বিঘ্ন হয়। এজন্য তাদৃশ ফলভক্ষণের পর কিছু মিষ্ট দ্রব্য কিংবা হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্য সেবন করিয়া পরে জল খাইবে।

(৬) ডাইল মধ্যে মশুরী ও মাষকলাই অতি পুষ্টিকর। কোন মাংস, মৎস্য বা দুগ্ধ ততদুর পুষ্টিকর নহে। এইজন্য এই দুই ডাইল আমিষ মধ্যে গণ্য। উহা ব্রহ্মচারীর ও বিধবার অসেব্য। কিন্তু মশুরীর ডাইলে রুক্ষতা দোষ আছে এবং মাষ ডাইলে শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দোষ আছে। মশুরীর ডাইলে ঘৃত, আদা ও হিং দিলে তাহা নির্দ্দোষ হয়। মাষ ডাইলে ঘৃত, দারুচিনি ও জৈত্রী দিলে তাহার দোষ থাকে না। অহিংসক লোকদের পক্ষে এই দুই ডাইল শোধন করিয়া খাওয়া উচিত। কেননা উহা মাংস হইতে সুস্বাদ এবং পুষ্টিকর।

(৭) মুগ ও বুটের ডাইল উক্ত দুই ডাইল অপেক্ষা কম তেজস্কর হইলেও প্রায় মৃগ-মাংসের তুল্য পোষক। এই দুই ডাইল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এজন্য সকলকালে সকল লোকেরই সেবনীয়।

(৮) গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে আহারের পর যেমন হাত মুখ ধোবে তেমনি দুই পা ধোবে এবং ভিজা গামছা দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিয়া ফেলিবে।

(৯) আহারান্তে বাম কাত হইয়া হেলান দিয়া বসিবে এবং একদণ্ড বিশ্রাম না করিয়া কোন পরিশ্রম করিবে না।

(১০) ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিন্ত মনে আহার করিবে। নতুবা সুজীর্ণ ও উপকারী হয় না।

(১১) লোকে আকণ্ঠ ভোজন করিলে যে পরিমাণ দ্রব্য খাইতে পারে তাহার তিন পোয়া পরিমাণ আহার করিবে। তদপেক্ষা বেশী খাইলে অজীর্ণ হয় এবং খাইলে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়।

নিম্নলিখিত পর্য্যায়ক্রমে ষড় রস সেবনীয়।

১। লবণ-সংযুক্ত তিক্ত দ্রব্য যৎকিঞ্চিৎ অগ্রে আহার করিবে।

২। লবণযুক্ত ঝাল দ্রব্য।

৩। লবণ ও মিষ্টসংযুক্ত অন্ন বা দধি।

৪। মিষ্ট মধুর দ্রব্য খাইয়া ভোজন শেষ করিবে।

অবশেষে আঁচাইয়া আসিয়া তাম্বুল, হরিতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্য দ্বারা মুখ শুদ্ধি করিবে।

এইরূপে প্রত্যহ ষড় রস-ভোজনে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবে।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

প্রতিধ্বনি।

গত ২৫শে বৈশাখের "প্রবাহিনী"তে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় "নাট্যসাহিত্য ও বঙ্গসমাজ" নামক প্রবন্ধে "বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও খাঁটি নাটক নাই, খাঁটি নাটক এ দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় হইতেই পারে না"—এই মতের প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান জীবনে প্রকৃত নাটক লিখিবার উপকরণ যথেষ্ট আছে। তিনি বলেন,—"যে দেশের সমাজ নিতান্ত

নির্জ্জীব সমাজ,—জড় সমাজ, যে দেশে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, অশ্বের হ্রেষারব শোনা যায় না, যে দেশে 'Armada'র আয়োজন নাই, সে দেশে প্রকৃত নাট্যকার জন্মিতে পারে না। সে দেশের সমাজে ও স্বভাবে প্রকৃত নাটকীয় উপকরণ একটুও নাই"—এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং এ উক্তিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সার্থকতা নাই। এই উক্তির ভ্রম-প্রদর্শনার্থ প্রবন্ধলেখক অমরেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ করা উচিত বিবেচনা করিয়া আমরা সেইটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বঙ্গদেশে কামানের তোপধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শ্রুত হয় না বটে, কিন্তু বাঙ্গালার গৃহে গৃহে যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কি উপায় আছে? এ সংগ্রাম অস্ত্রে অস্ত্রে নহে, এ সংগ্রাম রাজায় রাজায় নহে ;—এ সংগ্রাম চলিতেছে এক সভ্যতার কবল হইতে অপর সভ্যতার আত্মরক্ষণে, এ সংগ্রাম চলিতেছে দেশ-ভক্তির সহিত ইংরাজ-ভক্তির ঘোরতর বিরোধে, এ সংগ্রাম হইতেছে জাতীয় সাহিত্যের সহিত বিজাতীয় সাহিত্যের ভীষণ সংঘর্ষণে! এমন সমাজকে যাঁহারা জড় সমাজ বা নির্জ্জীব সমাজ বলেন, তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। এমন অন্তর্বিপ্লব, এমন ঘাত-প্রতিঘাতের অভিনয় যে সমাজে নিত্য চলিতেছে, সে সমাজে নাটকীয় উপকরণের অভাব আছে, কেমন করিয়া স্বীকার করিব? একদিকে প্রাচ্য সংস্কার অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, একদিকে ভক্তিমতী স্ত্রীজাতি অপর দিকে ইংরেজীনবীশ বাবু, এই দুই দিকের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায় প্রতি সংসারেই নিয়ত চলিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই এক একখানা জীবন্ত নাটক, আমাদের মনের মধ্যেই দুইটা প্রবল স্রোতের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। এমন আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ জগতের আর কোথাও কখনও কি হইয়াছে? এমন অপূর্ব্ব সংঘর্ষণের ফল কি বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্যে প্রতিফলিত হয় নাই? 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' 'হারানিধি' 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতিকে কি আপনারা প্রকৃত নাটক বলিতে নারাজ? কেন নারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কেহ বুঝাইয়া দিবেন কি? না অবজ্ঞা করিবেন? না,—পারিবেন না বলিয়া, অবজ্ঞা দেখাইবেন?

পুস্তক-পরিচয়।

গিরিশচন্দ্র—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বাঁধান ১।৫ পাঁচসিকা মাত্র।

পুস্তকখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে গিরিশচন্দ্র-রচিত গীতাবলী। এই গীতাবলীর মধ্যে তদ্‌রচিত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গীতও আছে। ২য় খণ্ডে—গিরিশ-চন্দ্রের জীবন-চরিতের শেষাংশ। ৩য় খণ্ডে—গিরিশ-প্রসঙ্গ অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের জীবনের নানা কথা। ৪র্থ খণ্ডে—গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর কালনির্দ্দেশ। তদ্ব্যতীত সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে গিরিশচন্দ্রের যৌবনের ও বার্দ্ধক্যারম্ভের আলেখ্য তাঁহার বিবিধ ভাবপ্রকাশক প্রায় কুড়ি প্রকার মূর্ত্তি, বহু সুপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাট্যামোদী ব্যক্তিগণের ইহাতে কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে।

এই পুস্তকের সঙ্গীতাংশ-সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ সঙ্গীতের রচয়িতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র। যাঁহার গান হাটে-মাঠে-বাটে সর্ব্বত্রই প্রচলিত, তাঁহার গানের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। আর সেগুলির প্রশংসা করাও বাহুল্য, কারণ ইতিপূর্ব্বে বহু মনীষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেগুলি প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে অবিনাশবাবু যে 'গিরিশ-প্রসঙ্গ' প্রদান করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই মূল্যবান। এই প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের বিচিত্র চরিত্র স্থানে স্থানে অতি চমৎকাররূপে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আগামী মাসে এই প্রসঙ্গ হইতে গিরিশচন্দ্রের কতিপয় উক্তি 'অর্ঘ্যে'র পাঠক পাঠিকাগণের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিব। গিরিশচন্দ্রের এই চরিত্রোদ্ভাসক প্রসঙ্গ প্রকাশিত করিয়া অবিনাশবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার সম্পাদন-নৈপুণ্যের পরিচয় পদে পদে আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

———

যৌথ-পরিবার ও বাল্য বিবাহ।

[প্রথম প্রস্তাব]

হিন্দুদের যৌথ-পরিবার একটী প্রজাযন্ত্র রাজ্যসদৃশ। সংসারের কর্ত্তা তাহাতে রাজা। তাঁহার ক্ষমতা পরিবারস্থ সকলের উপরেই আছে অথচ সীমাবদ্ধ। কর্ত্তা সমস্ত পরিবারের হিতার্থ কাজ করেন এবং প্রত্যেক ভাগীকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করেন। অন্তঃপুরে গৃহিণী কর্ত্তার অধীনে স্ত্রীলোকদের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন এবং তাহাদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করেন। কর্ত্তার পত্নীই যে গৃহিণী হইবেন, এমন কোন নিশ্চিত বিধান নাই। অনেক পরিবারে কর্ত্তার মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নী, বিধবা পিসী বা বিধবা ভগিনীও গৃহিণী হইয়া থাকেন। সাংসারিক প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখা এবং হিসাবমত তাহা খরচ বা প্রয়োগ করা, বালকবালিকাদের তত্ত্বাবধান করা, রোগীদের ঔষধ-পথ্য দেওয়া গৃহিণীদের প্রধান কার্য্য। কোন পূজা, ব্রত, বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইলে কর্ত্তা, গৃহিণী এবং পরিবারস্থ প্রধান প্রধান ভাগীরা একত্র পরামর্শ করিয়া সেই সকল কার্য্যের যথোপযুক্ত আয়োজন করেন। কোন সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইলেও তদ্রূপ পরামর্শ করিয়া করা হয়। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য কর্ত্তা-কর্ত্রীর নিজ বিবেচনামতেই নির্ব্বাহিত হয়। কোন ভাগী স্থানান্তরে গেলে, তাহার স্ত্রীপুত্রাদির জন্য তাহার

কোন চিন্তা করিতে হয় না। কোন ভাগীর মৃত্যু হইলেও তাহার স্ত্রীপুত্রাদি নিঃসহায় হয় না। সুতরাং নিজের অভাবে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণার্থ জীবন-বীমা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ভাগী কর্ত্তার শাসনাধীন থাকিত বলিয়া লম্পট, মাতাল হইতে পারিত না। প্রত্যেক ভাগী যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা কর্ত্তার হাতে দিত। তিনি তাহা সকল ভাগীর হিতার্থ প্রয়োগ করিতেন। এক ভাগী পত্নী ও নাবালক সন্তান রাখিয়া মরিলে তাহার সেই স্ত্রী-পুত্রাদি জীবিত ভাগীদের স্ত্রী-পুত্রাদির তুল্য মর্য্যাদায় প্রতিপালিত হইত এবং যৌথ-পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইত। জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাত শব্দের অর্থ বড় বাবা এবং ছোট বাবা। যৌথ-পরিবারে সেই সম্পর্কমতেই কার্য্য হইত। কর্ত্তা নিজ পুত্রাদিকে ভ্রাতার স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে কিছু বেশী দিতে পারিতেন না এবং অন্যান্য ভাগী-দিগকেও তদ্রূপ অপক্ষপাত ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতেন। সন্তানেরাও জ্যেঠা-খুড়াকে পিতৃতুল্য মান্য করিত। এক ভাগীর কোন ব্যারাম বা বিপদ হইলে পরিবারস্থ সকলেই তাহার শুশ্রূষা করিত। ইহাই সাংসারিক সুখের চরম উৎকর্ষ এবং ইহাই আর্য্য ঋষিদিগের প্রকটিত যৌথ-পরিবারের উদ্দেশ্য। এইরূপ হিন্দু পরিবারে যে সুখ ছিল, স্বার্থপরতাপ্রণোদিত বিচ্ছিন্ন বিলাতী পরিবারে তাহা সম্পূর্ণ অগোচর। পরানুকরণপ্রিয় লোকেরা বলিবেন যে, "যৌথ-পরিবারে গৃহিণীরা বৌদের উপর অনেক অত্যাচার করিত।" তাহা ঠিক কথা বটে। কিন্তু তাহা যৌথ-পরিবারিক দোষ নহে। উহা মধ্যবর্ত্তী কালের ভ্রান্তিসম্ভূত দোষ। সেই সময়ে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া রীতিসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন গৃহিণীরা বৌদিগকে কষ্ট দিতেন, তেমনই শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে কষ্ট দিতেন। কোন ছাত্রের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলেই পাঠশালায় গুরু মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে বেতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেন। প্রভু ভৃত্যের প্রতি, জমিদার প্রজার প্রতি, সমাজপতিরা সামাজিক লোকের প্রতি নিষ্ঠুর দণ্ডবিধান করিতেন। তখন-কার লোকেরই দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, কঠিন দণ্ডব্যতীত দোষ শোধন হয় না। সেই বিশ্বাস হইতে অধীনদিগের প্রতি অত্যাচার করা তৎকালীন সাধারণ রীতি হইয়াছিল। তাহা কোন মতেই যৌথ-পারিবারিক নিয়মের দোষ বলা যায় না।

য়ুরোপে যৌথ-পরিবার নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি বিবাহ করিলেই অন্যান্য স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র নিজ পত্নী লইয়া পৃথক বাস করে। এই রীতি তাহাদের আধুনিক সভ্যতার ফল নহে। তাহারা যৎকালে বন্য পশুর ন্যায় অসভ্য ছিল, তখন হইতেই তাহাদের এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের একান্ত স্বার্থপরতাই এইরূপ স্বজনবিচ্ছেদের একমাত্র কারণ। আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে যৌথ-পারিবারিক নিয়ম প্রায় সৃষ্টিকাল হইতেই ছিল। যখন বিবাহ প্রথা ছিল না, স্ত্রী-পুরুষগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিত, তখনও একজননীর সন্তানেরা একত্র বাস করিত, এবং পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ ছিল। সেই যৌথ-পারিবারিক নিয়ম বরাবর হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যৌথ-সংসারের সুবিধা দেখিয়া সেই প্রথা অনুসরণ করিয়াছিল। য়ুরোপীয়েরা কোন বিষয়েই হিন্দু-মুসলমানের কোন রীতিনীতি গ্রহণ করে নাই। তাহাদের স্বজাতীয় আচার-ব্যবহার, খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতি যতই কেন কদর্য্য হউক না তাহারা তাহাই স্থির রাখে এবং এদেশেও সেই প্রথাগুলি চালাইতে ইচ্ছা করে। বহু অদূরদর্শী লোক ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া সকল বিষয়েই তাহাদের অনুগামী হয়।

যৌথ ও বিচ্ছিন্ন পরিবারের সুখাসুখ তুলনা করিলে যৌথ-পরিবারের শ্রেষ্ঠতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। পত্নী লইয়া পৃথক বাস পশু-পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর অনুকরণ মাত্র। ইতর জন্তুরা নিজ সন্তানকে পালন করিতে থাকে। তাহার শরীর সবল ও কর্ম্মঠ হইলেই সে স্বেচ্ছা ও সুবিধামত স্থানান্তরে চলিয়া যায়; জনকজননীসহ সন্তানের আর কোন সম্পর্ক বা পরিচয় থাকে না। সেই জনক-জননী যখন অতিশয় বৃদ্ধ বা রুগ্ন হয়, তখন তাহারা কোন নিভৃত স্থান আশ্রয় করে। যদি আরাম হয় তবে পুনরায় আহার-অন্বেষণে বাহির হয়, নতুবা সেই নির্জ্জনে বহুকষ্টে জীবন শেষ করে। বিলাতী সমাজেও লোকের ঠিক সেই অবস্থা হয়। আমার বাসার নিকট অনেকগুলি গরীব ট্যাঁস ফিরিঙ্গী বাস করে। তাহাদের পুত্র-কন্যা আছে। তাহাদের পুত্রগণ নিজ পত্নী লইয়া স্থানান্তরে বাস করে। তাহাদের কন্যাগণ নিজ স্বামীসহ স্থানান্তরে থাকে। বৃদ্ধ ফিরিঙ্গী দম্পতি দুই একজন মুসলমান চাকর লইয়া বাস করে। যাহার পত্নী নাই, সে কেবল চাকরের

সাহায্যেই জীবন ধারণ করে। তাহাদের গুরুতর ব্যারাম হইলে খয়রাতী হাঁস-পাতালে আশ্রয় লয়। যদি আরাম হয়, তবে আবার বাসায় আসে; নতুবা হাঁসপাতালেই বিবিধ কষ্টে জীবন শেষ হয়। তাহাদের সন্তানগণ মৃত্যুসংবাদ পাইলে আসিয়া এক টুক্‌রা কাল ফিতা হাতে বাঁধে এবং মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া প্রস্থান করে। যে হাঁসপাতালে যাইতে অবসর না পায়, তাহার দুর্দ্দশা আরও বেশী। যখন তাহারা শয্যাতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকে কিংবা বমি করে, তখন মুসলমান চাকর তাহাকে স্পর্শ করে না। তখন সেই হতভাগা মল-মূত্রাদি মধ্যে পচিয়া মরে। তাহার পুত্রকন্যাগণ কেহই তাহার কোন শুশ্রূষা করে না। তাহার সন্তানেরা শকুনিগৃধিনীর ন্যায় আসিয়া হাতে কাল ফিতা বাঁধে এবং দায়ভাগ করিয়া লইয়া প্রস্থান করে। যদি ত্যক্ত সম্পত্তি না থাকে, তবে মৃত্যুর পরেও সন্তানেরা কেহ আসে না।

এদেশে কোন ইংরেজ গরীব নাই। মাসে দুইশত টাকা না পায় এমন ইংরেজ এদেশে দেখা যায় না। ধনবানের কুত্রাপি কষ্ট নাই; সুতরাং এদেশে কোন ইংরেজ সুস্থ শরীরে দুরবস্থা ভোগ করে না। কিন্তু পারিবারিক কুপ্রথা হেতু তাহাদেরও অন্তিম অবস্থায় কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। ঢাকায় সিম্‌সন সাহেব খুব নামী ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার উচ্চ বেতন ছিল এবং উপার্জ্জিত টাকাও প্রচুর ছিল। তাঁহার ওলাউঠা হইল, অমনই তাঁহার স্নেহময়ী পত্নী নিজ সন্তানগণ ও টাকাকড়ি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা বুড়ীগঙ্গামধ্যে নৌকায় থাকিলেন। ডাক্তার সাহেব মুসলমান চাকরের জিম্মায় থাকিয়া মলরাশির মধ্যে গতাসু হইলেন। তাঁহার দেহ সমাধি করা হইল, শয্যাবস্ত্র দগ্ধ করা হইল, গন্ধক পোড়াইয়া ঘরের বায়ু শোধন করা হইল, তখন মেম সাহেব আসিয়া কাল ফিতা বাঁধিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তিগুলি হস্তগত করিলেন। তাহার অল্পদিন পরেই মেম সাহেব অন্য স্বামী পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় সধবা গৃহিণী হইলেন। ঈদৃশ দৃষ্টান্ত দার্‌জিলিঙ্গেও অনেক দেখিয়াছি। আমি ভারতবর্ষের বাহিরে যাই নাই; সুতরাং বিদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু ইংরেজী পুস্তকে যাহা পড়িয়াছি এবং বিশ্বস্ত ইংরেজ পাদরীর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইউরোপে জ্ঞাতিকুটুম্বসহ সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। পিতা মাতা নাবালক সন্তানদিগকে পালন করিতে বাধ্য অথচ সন্তান

দ্বারা পিতামাতার কোন উপকার নাই। এই ভাবে সংসারধর্ম্ম করা ইউরোপে বরাবর চলিয়া আসিতেছে। অভ্যস্ত বিষয়ে লোকের কষ্ট জ্ঞান হয় না। সুতরাং বিলাতের লোক এরূপ সংসার কষ্টকর জ্ঞান না করিতে পারে; কিন্তু তাহা আমাদের নিকট বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। হিন্দু যৌথ-পরিবারিক সংসার যে বিলাতী বিচ্ছিন্ন সংসার হইতে উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে তর্ক করিতে পারেন যে, এখন লোকের স্বার্থপরতা অতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং এখন অপক্ষপাতে যৌথ-সংসার চালান যাইতে পারে না। বিলাতী শিক্ষায় এবং বিলাতী আদর্শে এখন বাঙ্গালী হিন্দুদের অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থপরতা বেশী হইয়াছে, বিলাসিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের প্রয়োজনও বেশী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া আমাদের জাতীয় রীতিনীতি অনুসরণ করাই সঙ্গত। এখনও হিন্দুসমাজে কোন রোগীকে ফেলিয়া তাহার পরিজন দূরে চলিয়া যায় না। সুতরাং কেহ মলমূত্রে পচিয়া মরে না।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে, জোজিয়াস্ ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট কনিষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষানবিশ রাখিতে গেলেন। ঠিক নিঃসম্পর্কীয় লোকের সহিত যেমন চুক্তি হয়, তদ্রূপ চুক্তি হইল। পিতা পুত্রের বাড়ীতে দেড় দিন থাকিলেন, তজ্জন্য বাসাভাড়া ও অন্নমূল্য পুত্রকে দিলেন। এরূপ চমৎকার কাণ্ড দেখিলে আমাদের দেশের লোক হতবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ইহাই পাশ্চাত্যদেশের রীতি ও নিয়ম। জ্ঞাতিকুটুম্বসহ এইরূপ কদর্য্য ব্যবহার যে সকল দেশে চিরপ্রচলিত, সেইদেশে অভ্যাসবশতঃ তাদৃশ ব্যবহার কষ্টকর বা নিন্দনীয় হয় না, কিন্তু তদপেক্ষা যে আর্য্যরীতি সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের দেশের কুশিক্ষিত বাবু সাহেবেরা এই সকল কদাচার সভ্যতার লক্ষণ মনে করিয়া হিন্দু সমাজে চালাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কতক সফলও হইয়াছে। তজ্জন্য দেশে দুঃখ ও দারিদ্র্য প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে লোকের বিলাত-ভক্তি কম হইয়াছে। বেগ থামিলেই প্রতিবেগ হইয়া থাকে; এজন্য আশা করা যায় যে, অল্পদিনমধ্যেই আর্য্যসদাচারসমূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দু-নিয়মে যৌথ-পরিবারে থাকিলে সাংসারিক সুখ যত দূর হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারেই ততদূর হইতে পারে না।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল।

গিরিশ-বাণী।

১

জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনা—বিশেষ নাটক-রচনা। নাট্যকারকে অনেক রকম অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি করিতে হয়। প্রকৃত কবি নিজে যাহা অনুভব করেন না, তাহা লিখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য—বেশ্যা ও লম্পট-চরিত্র হইতে জগৎপূজ্য অবতার-চরিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি। সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়, নাট্য-রঙ্গালয়, তাহারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।

২

প্রতিভা চলা পথে চলে না, সে আপনি আপনার পথ করিয়া লয়। পূর্ব্বে বিলাত হইতে জাহাজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ছয় মাসে ভারতবর্ষে আসিত। প্রতিভা সুয়েজ ক্যানাল প্রস্তুত করিয়া ছয় মাসের পথ ছয় সপ্তাহে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। বাষ্পীয় যানের উন্নতিতে তাহাও ক্রমে তিন সপ্তাহে পরিণত হইয়াছে।

৩

কবি সরলতা ও সত্যের উপাসক। প্রকৃত কবি কোনওরূপ মনোভাব সাধারণের নিকট গোপন করেন না এবং সংসারে লোক-চরিত্র যেমন দেখেন, অকপটে তেমনি বর্ণনা করেন। কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে কে সন্তুষ্ট হয়? এজন্য লোকশিক্ষক কবি অনেক সময়ে নিন্দাভাজন হন। জীবনে যশোলাভ তাঁহার ভাগ্যে কদাচ ঘটে। দিব্যদৃষ্টিসহায়ে কবি যে সকল সত্য উপলব্ধি করেন তাঁহার সমসাময়িক লোক তাহা ধারণা করিতে পারে না। পরে যখন সাধারণের সে সকল উপলব্ধি করিবার সময় আসে, তখন তাঁহার আদর হয়। প্রতিভার দুর্ভাগ্য, সে সময়ের অগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সময়ের এবং মানব-সাধারণের দোষগুণ দেখাইয়া দেওয়া নাট্যকারের প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু লোকে কখনও কখনও ভ্রান্তিবশতঃ ঐ সকল দোষ ব্যক্তিগতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সেইজন্য কবিকে সময়ে সময়ে অনেক নিন্দা, শত্রুতা, এমন কি নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয়।

৪

নাটক লেখা কঠিন, সংসার ও লোকচরিত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। * * * পুত্রশোকে মা যেরূপ ভাষায় কাঁদে, পিতা সেরূপ ভাষায় কাঁদে না। শোক উভয়েরই কিন্তু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নাটক সংসারেরই অনুকরণ, ইহা নাট্যকারের সতত স্মরণ রাখা উচিত।

৫

স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সাধারণ অপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু এ শক্তিগুলি তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই। নতুবা আয়ত্তাতীত কল্পনাশক্তির প্রভাবে মানুষ পাগল হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তি আবার এমন হওয়া চাই যে, লিখিবার সময় অনুভূতিসিদ্ধ বিষয়সকল আপনা হইতেই মনে উদয় হয়। নচেৎ মহাবীর কর্ণের ন্যায় কার্য্যকালে মহাস্ত্রসকল বিস্মৃত হইতে হয়। আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা না থাকিলে কল্পনাও কার্য্যে পরিণত হয় না।

৬

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ চিন্তার যে সকল স্তর উদ্ভাবন করিয়াছেন, সাধারণ মানববুদ্ধি যে স্তরে উপনীত হইতে পারে না। নাস্তিকতার অনুকূলে শাস্ত্রকারগণ যে সকল তর্কযুক্তি দেখাইয়াছেন, ইউরোপীয় বড় বড় দার্শনিক নাস্তিকগণের মস্তিষ্কে সে সকল তর্কযুক্তি উদয় হয় নাই। স্বকৃত এই প্রখর তর্কযুক্তি অবশেষে পরাস্ত করিয়া ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, শাস্ত্রকারগণ আমার জন্য পূর্ব্ব হইতেই তর্কযুক্তিচিন্তা দ্বারা আমার জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের মীমাংসা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এমন অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তিচিন্তা কোথাও দেখি নাই, যাহা পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রকারগণের মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই এবং তাহার মীমাংসা তাঁহারা করিয়া যান নাই।

৭

আত্ম-জীবনী রচনা বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ অকপটে বলিয়াছেন, যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করিবার সেইরূপ সাহস হইবে, তখন আত্মজীবনী লিখিবার কথা উত্থাপন হইতে পারে। নচেৎ আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া আপনাকে আপনার উকীল হইতে হয়, কেবল দোষস্খালনের চেষ্টা এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ।

৮

The best art is to conceal art অর্থাৎ কলাকৌশল গোপন করাই শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা।

৯

যত প্রকার রচনা আছে, নাটক-রচনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস লেখা তাহার নীচে।

১০

চিত্রকরের ন্যায় কবিও ছবি চিত্র করেন। একজন বর্ণে—অন্যজন কথায়।

১১

ফিল্ডিং, স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতির উপন্যাস আগে পাঠ করা উচিত। (সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে গিরিশবাবু মেরি কোরেলীর বড়ই সুখ্যাতি করিতেন) ফরাসী উপন্যাস-লেখকগণের গল্পরচনাশক্তি অতি উৎকৃষ্ট :—যেমন ডুমা প্রভৃতি। ইংরাজ উপন্যাস-লেখকগণ যেমন চরিত্র-অঙ্কনে, ফরাসী উপন্যাস-লেখকগণের তেমনই গল্পসৃজনে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভিক্টোর হিউগোর যেমন চরিত্র-সৃজনশক্তি, তেমনই গল্পরচনা—তেমনি কল্পনা-শক্তি ছিল। যদি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের হাস্যরসের অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ইঁহাকেই অনেকাংশে সেক্সপীয়রের সমকক্ষ কবি বলা যাইত।

১২

ঘোরতর দুশ্চিন্তায় মানবের মস্তিষ্ক যখন জড়িত হয়, তখন তাহার ভাব ও ভাষাও জড়িত হয়। সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকার সেইরূপ অবস্থায় চরিত্রের মুখে জড়িত ভাব ও ভাষা ব্যক্ত করেন। হ্যামলেটের মনে যখন আত্মহত্যা উচিত কি অনুচিত, এই দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তখন তিনি বলিতেছেন,—'To take arms against a sea of troubles.' একদিকে বিপদ-সাগর, অপরদিকে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কথা। হ্যামলেটের মস্তিষ্কের ভাব এই একছত্রে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

১৩

গ্রন্থকারের পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিদান আমি আদৌ ভাল বলি না। প্রথমতঃ সত্যের সংসারে এরূপ সকল সময় দেখা যায় না।

সৎকার্য্য করিয়া জীবনে কখন কেহ ফল পায়, কেহ বা ইহজীবনে পায়-ই না। কিন্তু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান—সৎকার্য্যের জন্য,—সুফলপ্রাপ্তির জন্য নয়,—উচ্চ-প্রকৃতি গ্রন্থকার এই উচ্চ আদর্শ মানবচক্ষে ধরিবার প্রয়াস পাইবেন। সংসারে এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা সৎকার্য্য করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং না পাইলে সৎকার্য্যে আস্থাহীন হয়। (যে শ্রেণীর পুস্তকে এই সকল কথা লেখা হয়) সেরূপ পুস্তকে এই সকল লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে, কিন্তু তাহারা যখন কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত দেখে, তখন তাহাদের ধর্ম্মের প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়া যায়।*

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

অভিভাষণ-মন্থন।

"হৃদয়ে কোমলতার culture কর্ষণ বা উৎকর্ষ হয়—সুকুমার-সাহিত্যসেবায়। অথচ এই সুকুমার সাহিত্যের সেবা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কম হইতেছে; পূর্ব্ব-সময় বলিতে আমি বিক্রমাদিত্যের বা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বলিতেছি না; ত্রিশ বৎসর মধ্যে সাহিত্যসেবায় ক্রটী পড়িয়াছে। যদিও বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনাই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আমি কেবল বঙ্গসাহিত্য লইয়া এ কথা বলিতেছি না। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য শুদ্ধ জড়াইয়া লইয়া বলিতেছি। সংস্কৃতে এখন সাংখ্য-বেদান্তের চর্চ্চা হয় ত বাড়িয়াছে, কিন্তু সুকুমার সংস্কৃতসাহিত্যচর্চ্চার পূর্ব্বের মত প্রগাঢ়তা নাই। আর ইংরাজি সাহিত্য আমরা যেভাবে যতটুকু পড়িয়াছিলাম, বা পড়িতাম, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বিস্তৃতিতেও বোধ হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ এখনকার ছাত্রগণ পড়ে না। সেক্সপিয়রের কোনও কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে, সেই বালককালের মত শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর দাদামহাশয়ের নিকট দৌড়াইতে হয়; এ কালের ছেলেদের দ্বারা কোনও ফল পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতি-

* শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

হাসের পর দব-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে ; এক দীনেশ বাবুই যে কত দলীল দাখিল করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই ; আবার ইদানীং সওয়াল জবাবও আরম্ভ হইয়াছে ; কত স্থানে, কত রূপে বঙ্গসাহিত্যের সম্মিলন হইতেছে—উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, ঈশানবঙ্গ, অগ্নিবঙ্গ, কত স্থানেই না মূল, শাখা, প্রশাখা, পল্লব-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তবু বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি, বাস্তবিক কি আমাদের দেশে সুকুমার-সাহিত্য-আলোচনার প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে? সেই যে মুদী-মাকালী, ভাণ্ডারী-ব্যাপারী,—সকলেই অবসর, স্থান ও শ্রোতা পাইলেই কৃত্তিবাস-কাশীদাস পড়িত, তাহারা কি এখনও সেইভাবেই পড়ে? না 'নবীন নামে এক বালক' পড়িয়া তাহাদের বোধোদয় হয় যে, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ," তাহার পর সুগোল, উজ্জ্বল, চাকচিক্যশালী চৈতন্যস্বরূপের—ভক্তি-মুক্তিদাতা রজত-বিগ্রহের উপাসনায় ব্যস্ত হয়? আপনাদিগের সমীপে আবার কাতরে, বিনয়ে নিবেদন করি, আপনারা নির্জ্জন-নিলয়ে, নিশীথে, যেদিন ম্যালেরিয়ার তাড়না নাই, মোকদ্দমার তাগাদা নাই, কন্যাদায়ের বোঝা মস্তকে ঝুলান নাই, এমন শুভ-রাত্রিতে আত্মস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, বঙ্গভাষায় সুকুমার সাহিত্যের প্রচার পূর্ব্ববৎ হইতেছে কি না?—হইতেছে—এমন বিশ্বাসের বাণী কখনই আপনাদিগের মুখ হইতে বহির্গত হইবে না।

বহুকাল হইতেই সঙ্গীত-সাধনাই ছিল—বাঙ্গালীর জীবন। বাঙ্গালী গ্রামে গ্রামে, পালোয়ান, বাগ্‌দী, পোদ, গোপ, চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া, আপনাদের বিত্ত-স্বত্ব রক্ষা করিত, আর সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সেবা করিয়া সঙ্গীত-সাহিত্য-সেবায় সময় অতিবাহিত করিতে। ভারতের প্রাণ ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর প্রাণ, সেই ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনা। চারি পাঁচ শত বর্ষের বাঙ্গালীর ইতিহাস আমরা ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি। এই চারি পাঁচ শত বৎসর বাঙ্গালী এইরূপেই কাটাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বাধা পড়িয়াছে বটে কিন্তু সে অল্পকালের জন্য। যখন মোগল-পাঠানের লড়ায়ে বাঙ্গালা বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী সাহিত্য-সঙ্গীত-সাধনায় বিরাম দেয় নাই। তবে যখন পশ্চিমে মারাট্টা, পূর্ব্বে ফিরিঙ্গী মহাদৌরাত্ম্য করিল, যখন পলাশী-প্রাঙ্গণের প্রাণান্ত-পরীক্ষায় রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, এগার শত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশে কালের করালছায়া পড়িল, যখন নাথেরাজ-বাজেয়াপ্তের আদেশে দেশে মহতী বিভীষিকা দেখা দিল, তখন কিছুকালের জন্য

সাহিত্যসেবার ব্যাঘাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আহারান্তে খড়ের চণ্ডী-মণ্ডপে খুটী হেলান দিয়া 'মুটকলমে' ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথী লেখা এবং বৈকালে কোনও প্রকাশ্য স্থানে গ্রামস্থ সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ভদ্র অভদ্র লোক একত্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির শ্রবণ—এই সকলে কখনই সংসার বাধা দিতে পারে নাই।

এক রামায়ণের যদি দশখানি অনুবাদ থাকে, তাহা হইলে মহাভারতের পঞ্চাশ-খানি আছে। এই এক মঙ্গলগ্রন্থ—কত মঙ্গলই যে আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। চৈতন্যমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কালীমঙ্গল এইরূপ কত মঙ্গলই যে আছে তাহা স্থির করা যায় না। তাহার মধ্যে আবার মনসামঙ্গলে যে কত জনের লিখিত পুঁথী প্রচারিত আছে, তাহারও কিছু স্থির করা যায় না। এক চট্টগ্রামেই বাইশখানি মনসার পুঁথী আছে।

বাঙ্গালীর বইলেখা 'বাই' ছিল। আমরা যখন বালক, যখন ছাপাখানা পুরানো হইয়াছে বলিলেও চলে, তখনও সেই বায়ুর নিবৃত্তি হয় নাই। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্যবিদ্ধ বটতলা তখনও অক্ষয়শরীরে বিরাজমান। "তখন পুস্তকের ফেরি-ওয়ালারা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেমবিলাস, হাতেমতাই, চাহার-দরবেশ প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দু মুসলমান পুরু-ষেরা কিনিত। * * * বটতলা ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই একখানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে আমার বড় পৌট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাটী করিতাম"—কিনিতাম। এইরূপ কত গ্রন্থ যে কিনিয়াছি ও হারাইয়াছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ফুলে দেব-দেবীর পূজা হয়; পরিশ্রম করিয়া ফুল আহরণ করিতে হয়। পূজার ফুলগুলি যাহাতে অপবিত্র স্থানে না পড়ে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—পূজার ফুল রাখিবার ঢাকিবার ব্যবস্থা নাই। আমার নিত্যসরস্বতী-পূজার ব্যবস্থাও সেইরূপই ছিল। পুস্তক কিনিলাম,—মায়ের সেবা হইল,—ঐ পর্য্যন্ত; পুস্তক-গুলি রাখিবার ঢাকিবার ব্যবস্থা করি নাই। নতুবা আপনাদিগের বিশেষরূপে দেখাইতে পারিতাম যে, একটি বিশেষ সময়মধ্যে কতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা পঠদ্দশায় অবস্থিত একজন গৃহস্থ-বালকের হস্তে আসিতে পারে। তাহাতেই বলিতেছিলাম,

আমরা যখন বালক বা কিশোরবয়স্ক, তখন বাঙ্গালীর বইলেখার 'বাই' যায় নাই। ক্রমে সেই বাঙ্গালীর প্রকৃতি উল্টাইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী 'সেয়ানা' হইয়াছে, পয়সার মায়া বুঝিয়াছে, উকীল মোক্তারগণ পয়সা ভিন্ন ভাল করিয়া কথাই কহেন না; ডাক্তার কবিরাজ বিজিট না পাইলে রোগীর জিহ্বা দেখিয়া শাদা কাগজে কালীর দাগ দেন না; পয়সার জোর না থাকিলে ছেলেপিলের শিক্ষাই হয় না, পয়সা না হইলে, এমন কি, আশীর্ব্বাদও পাওয়া যায় না।

এইরূপে ক্রমে বাঙ্গালীর, তাহার চিরসাধনার সামগ্রী—সুকুমার সাহিত্যে অবহেলা হইয়াছে; বিশ ত্রিশ বৎসরে এইটি বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। আর সেক্সপিয়ারের একটি সামান্য শব্দ লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডা শুনিতে পাই না। সমুদ্র দেখিয়া নব-কুমারের মত 'তমালতালীবনরাজিনীলা' কেহ বলিয়া উঠে না; আকাশে কালো মেঘের কোলে রামধনু দেখিয়া, গোপবালকবেশধৃক্ শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার উপর ময়ুরপুচ্ছ কেহ ভাবে না,—সে সকল পাগলামী এখন চলিয়া গিয়াছে; বাঙ্গালী সেয়ানা হইয়াছে, 'আপন গণ্ডা' চিনিয়া লইতে শিখিয়াছে।

* * * * * *

নিষ্কাম সাহিত্যসেবা বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় ছিল, এখনও আছে; নানা কারণে সেবার ঐকান্তিকতা আজিকালি একটু কমিয়াছে বটে, কিন্তু ভরসা করা অসঙ্গত নহে, আর সেই ভরসাতেই জীবন ধারণ করিয়া আছি যে, সুকুমার সাহিত্যের সেবা বাঙ্গালাতে আবার নিষ্কামভাবেই হইবে। অর্থাগমের জন্য সাহিত্য-সেবার বিস্তার বাড়িবে, এরূপ মনে করিতেও আমি পারি না,—অর্থাগম,—সাহিত্য-সেবায়—আমার একেবারেই নাই বলিলেও চলে, অথচ বারবার আমাকে সাহিত্য সভার একরূপ না হয় অন্যরূপ শ্রেষ্ঠ স্থলে স্থাপিত করিয়া, আমার কথা এইরূপ মহতী মণ্ডলী যে একান্তমনে শ্রবণ করিতেছেন, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণ অর্থাগমকেই গৌরবের বাটখারা করিয়াছেন?—তা' কথনই নহে। বাঙ্গালায় সৎসাহিত্যের আলোচনা আপনার গৌরবে আপনিই মস্‌গুল থাকে;—যে সেবা করে, সেও যেমন অর্থাগমের কথা ভাবে না, যাঁহারা সেবকবৃন্দের আদর-আপ্যায়ন করেন, তাঁহারাও উঁহাদের অর্থাগমের কথা ভাবেন না। আমরা প্রায় সকল দিকেই অর্থের দাসত্বে লিপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যসেবায় সেরূপ আজিও হয় নাই। আজিকার এই সাহিত্য-সম্মিলন-সভাই

এই কথার প্রমাণ করিতেছে—আজি অনেকেই দারিদ্র্যের দারুণ দুর্বহ ভার শিরে বহন করিয়া এই সাহিত্য-সভা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর এই যে বহুবর্ষব্যাপিনী সাহিত্য-সেবার প্রবৃত্তি, এইটিকে রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর সকল কার্য্য করিতে হইবে। যে বড় হইতে চায়, সে প্রথমে আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিবে, তাহার পর বড় হইবার প্রকরণপদ্ধতি অবলম্বন করিবে। বাঙ্গালীর প্রাণ—ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনা। ধর্ম্মের কথা এখন সকল সভায় বলিতে নাই বলিয়া বলিব না, কিন্তু সঙ্গীত-সাহিত্যের কথা বলিতেই হইবে। এই সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনায় বাঙ্গালীর যদি ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেটি দুঃখের বিষয় বৈ আর কি বলিব? আমরা আপনারাই যখন আপনাদের শত্রু, তখন আমাদিগকে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণেই অগ্রসর হইতে হইবে। ভাল করিতে করিব না মন্দ পারিব, কি দিবে দাও—আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবটা যেন না হয়।

* * * * *

সম্প্রতি সাহিত্যসেবায় আমাদের কিছু ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে, আমরা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছি, আমাদের মহত্ত্ব কিছু নাই, আমরা লঘু হইতে লঘু হইয়াছি। আমাদের মধ্যে এক জন মনীষী একদিন বলিয়াছিলেন যে, আমরা—They may not know how to fight, but they know how to live and—to die. বাঙ্গালী লড়াই করিতে না জানুক—জানে বাঁচিতে ও মরিতে। রাজসিক শক্তি দুই দিকের চাপে আমাদের কমিয়া গিয়াছে বটে, একদিকে সাত্ত্বিকতার প্রভাবে আমরা রাজসিকতা ছাড়াইয়া উঠিয়াছি, আর কোথাও তামস বৃদ্ধি পাইয়া রাজসিকতার হ্রাস হইয়াছে—কিন্তু এত বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়াও আমরা যাহা আছি, তাহা মহৎ বলিতে কুণ্ঠিত হও, বলিও না—কিন্তু লঘু কোনও মতে বলিতে দিব না।

আমাদের মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগ লোক মদ্যমাংসমৎস্যত্যাগী, নিরামিষ আহারে সন্তুষ্ট ও সংযমী। কাটাকাটি, মারামারি, মাম্‌লা, মোকদ্দমা আমরা কম করি। অন্য জাতির সহিত হঠাৎ তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ আমরা পরাধীন—রাজজাতির সঙ্গে কোনও বিষয়ে তুলনা করা আমাদের সাজেই না, করিতেই নাই; অথচ দিনের পর দিন আমরা যে আপনাদিগকে ক্রমেই লঘু হইতে

লবুতর মনে করিতেছি, সেই তামসভাব মন হইতে অপসারিত করাও একান্ত কর্ত্তব্য। কাজেই যৎকিঞ্চিৎ তুলনা না করিলেও চলে না। জর্ম্মনজাতি আজি-কালি সভ্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের দণ্ডনীতির কথা বলিলে, বোধ হয় কোনও দোষ হইবে না। বার্লিন রাজধানীতে একটী সুবৃহৎ কারাগার আছে, তাহার নাম Moabit Prison। তাহারই অধ্যক্ষ বা Superintendent Dr. Finkelr Burgh; তিনি একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাহার নাম "People who have been punished in Germany" "জর্ম্মনীদেশে কত লোকের সাজা হইয়াছে?" অধ্যক্ষের কথা, দুইটি স্থানের একটু একটু উদ্ধৃত করিব। এক স্থানে আছে—already every sixth man and every twentyfifth woman in German Empire has been punished for violation of some one or other of the many thousands of paragraphs of the German Penal Code." জর্ম্মনসাম্রাজ্যের মধ্যে পুরুষের মধ্যে ছয় ভাগ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে পঁচিশ ভাগ জর্ম্মান দণ্ডনীতির কোনও না কোনও ধারার নীতিভঙ্গ করায় দণ্ডিত হইয়াছে। আর এক স্থানে আছে—"বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মনীতে দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৮,৬৯,০০০ আটত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার, তাহার মধ্যে ৩০,৬০,০০০ ত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার পুরুষ, এবং ৮,০৯,০০০ আট লক্ষ নয় হাজার স্ত্রীলোক। ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের বালকের মধ্যে ৪৩ জনের মধ্যে ১ জন ও বালিকার মধ্যে ২১৩ জনের মধ্যে একজন দণ্ডিত হইয়াছে। দেখুন কি বিভীষিকাময় ব্যাপার! জর্ম্মান—মহৎ, কলকজ্জায় মহৎ, রঙ্গবিরঙ্গ ফলানয় মহৎ, সৈন্যসজ্জায় ও শিক্ষায় মহৎ, হয় ত আর দশ বৎসরে অর্ণবযানসংঘ-সংখ্যায়ও মহৎ হইবে,—তা বলিয়া কি তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা দণ্ডিত লোকশ্রেণীর সংখ্যাপরিমাণ লইয়া মহৎ হইব? মাতঃ ভারতী! চিরদিনই তোমায় লীলাখেলার অভিব্যক্তি আমাদের বোধাতীত; তুমি মা জর্ম্মনজাতিকে সংস্কৃতশিক্ষায় পটুত্ব প্রদান করিয়া, আমাদিগকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে;—দেখ মা, তোমার লীলাভূমির অধম তনয় আমরা যেন সেই আকর্ষণে এরূপ মহত্ত্ব লাভ না করি, যাহাতে আমাদের মধ্যে ছয় ভাগ পুরুষ ও পঁচিশ ভাগ স্ত্রীলোক দণ্ডিত হয়।

আমরা যে কাটাকাটি, মারামারি, মামলা মোকর্দ্দমা কম করি, এবং তাহাতেই যে আমাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়, এমন নহে; আমরা সংযমী ও প্রধানতঃ নিরামিষাশী হইলেও, আমাদের মধ্যে দরিদ্র কৃষকও যেরূপ ফলমূল, সুপক্ক সুমিষ্ট আম, কাঁটাল, তরমুজ, খরমুজ খাইতে পায়, তাহা অন্য দেশের ধনিসন্তানের পক্ষেও দুর্লভ। আমরা সংযমী হইয়াও ভোগবঞ্চিত নহি। কেবল জিহ্বার উপভোগ নহে, সমস্ত সৌন্দর্য্য-উপভোগের শক্তিই সভ্যতার নিদর্শন। সেই শক্তি বাঙ্গালীর বিলক্ষণ আছে। একটু পরে দেখিবেন, এই কলনাদিনী ভাগীরথীর দুই কূলে মুটে-মজুর, বাবু-বিলাসী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বচ্ছন্দে বসিয়া, গঙ্গাবক্ষের অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে, নয়ন ভরিয়া উপভোগ করিতেছে, এবং বিষম বিষময় বিষয়-আশীবিষের দিবসের দংশনজ্বালা এইরূপেই প্রশমিত করিতেছে। একজন সাঁওতাল কসমের লোক ৺বৈদ্যনাথ হইতে কলিকাতায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলে, "বাবু! তোমার দেশে খুব ঘর বাড়ী, আমাদের দেশে কেবল গাছপালা";—খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, এর কোন্‌টা ভাল?" আমি তাহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বুঝিয়া কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া একটু হাসিয়াছিলাম, সেও একটু হাসিয়া যেন লজ্জিত হইয়াছিল।

* * * * * *

আমাদের এতদঞ্চলের কোনও কোনও খ্যাতনামা লেখক নাকি কর্‌চি, যাচ্চি শব্দের এইরূপ আকার চালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ চেষ্টার প্রতিবাদ করি। Do not যোগ হইয়া অর্থাৎ শীঘ্র উচ্চারিত হইয়া do'nt এই আকৃতি ধারণ করে; কথা কহিবার সময় অনেক সাহেবশুভাই do'nt বলিয়া থাকেন; তাই বলিয়া কি কোনও গম্ভীর প্রবন্ধে কেহ do'nt এইরূপ পদ ব্যবহার করিবেন? তাহা কখনই করিবেন না—এখানে ভাষার পার্থক্যের কথাই হইতেছে না, বরঞ্চ ধরিতে গেলে বানানের পার্থক্যের কথাই হইতেছে। ক্বচিৎ কখনও প্রাদেশিক সংক্ষেপ-বিধান গ্রাহ্য হয় বটে, তাই বলিয়া কি লিখিত ভাষার উপর জবরদস্তি কথিত-ভাষার সংক্ষেপ-বিধান চালাইতে হইবে? তাহা কখনই হইবে না। আর এক স্থলেও ভাষাকে জবরদস্তি সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা আছে; সে চেষ্টাও ভাল নহে। যাচ্চি, হচ্চি প্রভৃতির যে চেষ্টা, তাহা হইল বানান বদলের চেষ্টা, কিন্তু যেটি এবার বলিব—সেটি ব্যাকরণ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা। যে

স্থলে আমরা লিখি—"এই কথাটা আমার অভিভাষণমধ্যে না লিখিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না" ; সেই কথাটা অনেক স্থলের গণ্যমান্য লেখক লিখিবেন,—"না লিখিয়া আমি পারিলাম না" ; অর্থাৎ 'থাকিতে' কথাটি অনাবশ্যকবোধে বাদ দিবেন, কাজেই বাক্যটি একটু সংক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু এরূপ সংক্ষেপ করা কেবল 'ব্যাকরণ' নষ্ট করা। এ কথা বড় করিয়া বলিতে গেলে কেবল গুরুমশাইগিরি হইবে, তাহা করিব না। এইটুকু বলি যে, 'পারি' সমাপিকার পূর্ব্বে প্রায় একটি অসমাপিকা বসে। করিতে পারি, যাইতে পারি, থাকিতে পারি,—ইত্যাদি। যাঁহারা ইংরাজিতে পদচ্ছেদ বা analysis প্রভৃতি অতি নিপুণতাসহকারে সম্পাদন করেন, তাঁহারা ধরাইয়া দিলেও যে এই স্থূল কথাটী বুঝিতে পারিবেন না, এমন একটা ধারণাই আমি করিতে পারিতেছি না।

সংস্কৃতবহুলা ভাষায় নানা গুণ থাকিলেও, একটু প্রাণ কম থাকে। ভাষায় প্রাণ না থাকিলে, জীবনেও প্রাণ থাকে না, বা আসে না। সেইজন্য ভাষা যত চলিত-ভাষার কাছাকাছি থাকে তত ভাল। তা বলিয়া ভাষায় যে গ্রাম্য শব্দ, অশ্লীল শব্দ, বা অপবিত্র শব্দ অধিক ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা নহে। আবার এদিকেও বলি—"ভাষার পরিপাট্যসাধন করিতে গিয়া বা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে গিয়া ভাষাকে গুরুভারে পীড়িত করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।" ভাষা যত সহজ হইবে, এবং অবলীলাক্রমে লেখনীমুখ হইতে নিঃসৃত হইবে, ততই ভাল হইবে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ভাষার প্রধান গুণ। তাহার পরে যেখানে যেমন ভাব, সেখানে সেইরূপ গুণ থাকিবে। যেখানে যেমন, কোথায়ও নাচিবে, কোথাও হাসিবে, কোথাও করুণ ক্রন্দনের সুরে এলায়ে এলায়ে গড়ায়ে গড়ায়ে চলিয়া যাইবে। যখন দক্ষদজ্ঞনাশ, তখন ভাষা দেখুন—

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে ;
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে,
হূল স্থূল কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।

কেবল যে ছন্দের বিভিন্নতায় এরূপ রস বিভিন্ন হয়, তাহা ঠিক নহে, ঐ তূণকছন্দে, দক্ষযজ্ঞধ্বংসের ছন্দে, উত্তম করুণগাথা গীত হয়—যথা গৃহদাহ-বর্ণনায়—

"ধেনুপাল আলথাল, উৰ্দ্ধ ফুক্ক চাহিছে,
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গাহিছে।"

ভাব ও ভাষা ঠিক থাকিলে, ছন্দ পুরাতন ভৃত্যের মত যে দিকে যাইতে বলিবে, সেই দিকে যাইবে।

ভাষার সম্বন্ধেও সেই কথা; ভাষার রীতিমত সেবা করিলে ভাষা সেবিকা হইবে, যে ভাবে লাগাইবে, সেই ভাবে যাইবে।

আমরা যতই দুঃখ করি, ক্রন্দন করি, আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমাদের মহদ্বংশে জন্ম। আমরা বিষয়ী হইলেও সংযমী; আমরা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে জানি। ঋষিদিগের জ্ঞানবল, দর্শনবিদ্যা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক আমাদের উপজীব্য। যে সঙ্গীত আমরা সামান্য ভিখারির মুখে শুনিতে পাই, তাহা অন্যান্য দেশে অতি দুর্লভ পদার্থ। আমরা যে সকল স্তব-স্তোত্র পাঠ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা, পূজাহোম সম্পন্ন করি, তদ্বারা আমাদের সাক্ষাৎ দেবদর্শনের ফল হয়। অতিথি-অভ্যাগতকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি; আবার অতিথিসেবা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানি। যেখানে অতিথির সাঙ্গোপাঙ্গ-সেবা করিতে পারি না, সেখানে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া, সুশীতল পানীয় দিয়া, অতিথির সন্তোষসাধনের চেষ্টা করি। সামান্য সামগ্রীসম্ভারে আমাদের গৃহস্থালী-ব্যাপার জগতের শিখিবার জিনিস। যদি কেবল সোনা-দানা, গাড়ী-বাড়ী, ঘড়ি-জুড়ী লইয়া, কলকজা-কারখানা লইয়া জাতীয় গৌরবের নির্দ্ধারণ না হয়, যদি সত্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, ধর্ম্ম, ভালবাসা, ভক্তি, পুরুষের সাধুতা ও নারীর পাতিব্রত্য লইয়া জাতীয় গৌরব স্থির হয়, তাহা হইলে আমরা জঘন্য বা নগণ্য নহি, পরন্তু আমাদের আপনা-আপনি সন্তুষ্ট থাকিবার যথেষ্ট উপচার আছে। পাঁচজনে আমাদিগকে ক্ষুদ্র বলাতে আমরা সরলভাবে বুঝিয়াছি যে, আমরা ক্ষুদ্র। এই বোধ আমাদের অনেকের মধ্যে তামসভাব আনিয়াছে; আমাদিগকে অলস-প্রকৃতি করিয়া তুলিতেছে। সকলের সমবেত চেষ্টায় এই তামসভাব বিদূরিত করিতে হইবে।

* * * * * *

আমাদের আলস্যে, ঔদাস্যে, অবহেলায়, অশ্রদ্ধায় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—স্বভাবপ্রদত্ত এই পঞ্চভূতের অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত

হইতে বসিয়াছি; দেশে এমন জঙ্গল হইয়াছে, মাটীতে আর রৌদ্র হাওয়া পায় না, সেঁতা ঘরে, ভিজা উঠানে, প্রান্তরের জঙ্গলে আমরা আপনারাই মাটী হইয়া যাইতেছি। নদী-নালা ভরাট হইয়াছে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না। স্নান-পানের জন্য, পাকের জন্য পরিষ্কার পয়ঃ আমরা আর পাই না। সূর্য্যের তেজে, রৌদ্রে সকলের সমান অধিকার, কিন্তু বাস্তবাটির চারিদিকের জঙ্গলে অনেক স্থলে সূর্য্যের মুখও দেখিতে পাই না। বায়ু দূষিত হইয়াছে, গাছ-পালার বিস্তারে বায়ু খেলিতে পায় না, পরিষ্কার আকাশ দেখিতে হইলে মাঠে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেখুন আমরা সকল দিকেই বঞ্চিত—ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে। আমাদের বাঙ্গালীর সকল থাকিতেও কিছুই নাই। কিন্তু আমরা ৪ কোটী ৩৬ লক্ষ। আমাদের রাজার দেশের সহিত তুলনা করিলে, আমাদের দেশ বাঙ্গালা আয়তনে কিছু কম। কিন্তু লোকসংখ্যায় প্রায় দশ লক্ষ বেশী। দেখুন, তাঁহারা বিক্রমে সমগ্র পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছেন, বিদ্যুৎ-বজ্রের সহায় লইয়া, মেঘবাষ্প বাহন করিয়া পৃথিবীতে একছত্র হইয়াছেন। আমরা অনুকরণ ভালবাসি, আসুন না আমাদের সমস্ত অধিবাসীর শতাংশের একাংশ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পুষ্করিণী খনন করিয়া, জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ পরিষ্কার করিয়া, আমাদের দেশ বাসোপযোগী করি।*

মেঘ।

সূর্য্যের তেজে জল শুকাইয়া যায়। কোন পরমাণুর বিনাশ নাই। এক বিন্দু জলও কোন কারণে বিনষ্ট হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ভাষায় জল শুকাইল না বলিয়া রূপান্তরিত হইল বলিতে হয়। সূর্য্যের তেজে জল বাষ্পময় হইয়া উপরে উত্থিত হয়। এই জলীয় বাষ্প উপরে উঠিয়া,

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে।

শৈত্য জন্য পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাসমূহ মেঘ নামে অভিহিত হয়।

মেঘের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা আছে। বায়ুর উত্তাপ যত অধিক হইবে, জলীয় বাষ্প সেইরূপ অধিক পরিমাণে তাহাতে অদৃশ্য ভাবে থাকিবে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। উত্তপ্ত জলে চিনি বা লবণ দিলে এরূপভাবে মিশ্রিত হয় যে, তাহা দেখা যায় না। জল শীতল হইলে, চিনি এবং লবণ পাত্রের নীচে পুনরায় জমিয়া যায়। মনে কর, এক ঘন মিটর পরিমিত বায়ুর উত্তাপ ২০ শতাধিক ডিগ্রী হইলে,তাহাতে ১৭॥ গ্রাম জলকণা অদৃশ্যভাবে থাকে। বায়ুর উত্তাপ ১০ ডিগ্রী হইলে, ৩ গ্রাম মাত্র জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে। মনে কর, পূর্ব্বদিক হইতে যে বায়ু বহিতেছে, তাহার উত্তাপ ২০ ডিগ্রী এবং স্থানীয় বায়ুর উত্তাপ দশ ডিগ্রী। এই দুই বায়ু মিশ্রিত হইলে, এক ঘন মিটর বায়ুর উত্তাপ ১৫ ডিগ্রি হইবে এবং তাহাতে ২৬৮ গ্রাম জলীয় বাষ্প থাকিবে, কিন্তু বায়ুর উত্তাপ ১৫ ডিগ্রি হইলে, এক ঘন মিটরে ২৫। গ্রাম মাত্র জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে। এজন্য সওয়া গ্রাম জলীয় বাষ্প দৃশ্যমান মেঘের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এইটী চলিত মত।

"কোদালে,""কুড়ুলে" "সিন্দুরে" "কাল" প্রভৃতি নানা প্রকার মেঘ আছে। পুষ্কর, পার্জ্জন্য, উত্তর পূর্ব্ব প্রভৃতি মেঘের অনেক নামও আছে। হাউয়ার্ড সাহেব মেঘ সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অতি উচ্চে বিক্ষিপ্ত কার্পাস বা শ্বেতঘোটকপুচ্ছসদৃশ যে মেঘ দেখা যায়, তাহার নাম "অলকা।" ইংরেজী নাম Cirrus বা mares' tail। সম্ভবতঃ এই মেঘ ক্ষুদ্র তুষারকণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারই নিম্নে পর্ব্বতাকার রাশীকৃত যে মেঘ দেখা যায়, তাহাকে "স্তূপ" Cumulus মেঘ কহে। গ্রীষ্মকালে স্তূপ মেঘ দেখা যায়; শীতকালে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত-কালের মধ্যে স্তূপ মেঘ দেখা যায়। শরৎ কালের শ্বেত স্তরে সজ্জিত যে মেঘ দেখা যায়, তাহাকে "স্তর" বা stratus মেঘ কহে। স্তর মেঘ অলকা এবং স্তূপ মেঘের নিম্ন দেশে থাকে। এই সকল মেঘের মধ্যবর্ত্তী স্থানে "অলক; স্তূপ" বা cirro-cumulus এবং স্তর স্তূপ বা cirro-

stratus মেঘ থাকে। ঘোর তিমির মেঘের নাম nimbus বা কাল মেঘ। কাল মেঘ অত্যন্ত নিম্নাকাশে দ্রুত পরিভ্রমণ করে এবং নিশ্চিত রূপে জল প্রদান করে। অলকা, স্তর এবং স্তূপ মেঘের সংমিশ্রণে কাল মেঘের উৎপত্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাসকল মিশ্রিত হইয়া জলবিন্দুরূপে পরিণত হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ বলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় ইহাই বৃষ্টি।

শিলা।

মেঘ যখন বায়ুবেগে দ্রুত চালিত হয়, তখন পরস্পর ঘর্ষণ জন্য তড়িন্ময় হইয়া উঠে। পুষ্ট-তাড়িত প্রবল মেঘের জলকণা ক্ষীণ-তাড়িত-প্রবল মেঘে আকৃষ্ট হয় এবং পরে বিপ্রকৃষ্ট হয়। এই আক্ষেপ এবং প্রতিক্ষেপে জলকণা সকল একত্রীকৃত হয়, এবং আকাশের অত্যুচ্চ প্রদেশের শৈত্যগুণে কঠিন ভাবাপন্ন হয়। ইহারই নাম শিলা।

কুয়াশা।

ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুতে মেঘের সঞ্চার হইলে, তাহাকে কুয়াশা কহে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

আদর্শ প্রভু।

গুরুবল সিং দিল্লীর "সার্ভিস্ এম্প্লয়মেণ্ট এজেন্সি" বা চাকুরী সংগ্রাহক অফিস-গৃহ হইতে যখন বাহির হইল, তখন তাহার মুখে আনন্দ বা আশার চিহ্ন ছিল না। সে শুষ্কমুখে একখানি অর্দ্ধমলিন রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতেছিল। সত্য সত্যই চাকুরী আফিসের হাতে আজ অনেকগুলি চাকুরী ছিল, কিন্তু গুরুবল সিংএর উপযোগী একটীও হইল না। সে যদি ফরাসী ভাষা ভাল জানিত, তাহা হইলে ফরাসী-অধিকৃত সাইগনের রেলওয়েতে তাহার একটা চাকুরী মিলিবার সম্ভাবনা ছিল; অথবা ভালরূপ দর্জ্জির কারখানা চালাইবার দক্ষতা যদি তাহার

থাকিত, তাহা হইলে হংকংএর এক মুসলমান পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ীর এমন একজন লোকের প্রয়োজন ছিল ; কিংবা সে যদি পূর্ত্তকারের সহকারিতা করিতে পারিত, বাড়ীঘর, সেতু প্রভৃতির নক্সা এবং পথ তৈয়ারী ও জমি জরিপ করিতে পারিত, তাহা হইলেও তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইতে পারিত। কিন্তু এসকল গুণ গুরুবলের ছিল না। অমৃতসরের বিখ্যাত দেশীয় খৃষ্টান স্বর্গীয় লঙ্গৎ সিংএর একমাত্র পুত্র গুরুবল সিং লাহোরের কোন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিল। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষেরা সম্প্রতি উহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। গুরুবল সিংএর আকৃতিতে শিখজাতিসুলভ মহত্ব ও গাম্ভীর্য্য বিরাজিত ছিল ; তাহার দেহ যেমন দীর্ঘ তেমনই সুগঠিত ছিল। যখনই গুরুবল চাকরী অফিসে আসিত, তখনই তাহার গৌরকান্তি ও সুন্দর বেশভূষা চাকুরী-অফিসের ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ম্যানেজার অপর কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না। কিন্তু গুরুবলকে দেখিলে তাঁহার সহিত দু' একটী কথা না কহিয়া ছাড়িতেন না। আজও তিনি তাহাকে বলিলেন,—

"মিঃ সিং আপনি খাতা-পত্র (Book-keeping) রাখ্‌তে জানেন কি ?"

"না।"

"ফোটোগ্রাফি"

"না—তাও জানিনে।"

"ভাল ঘোড়ায় চড়্‌তে জানেন কি ?"

"ভাল নয়।"

"জমিদারীর কাজকর্ম্ম ?"

"কিছু জানিনে মশায়—কিছু না ?"

গুরুবল সিংএর এই সকল সরল স্বীকারোক্তিতে ম্যানেজার মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তবেই ত তো মিঃ সিং আপনার মত নব্য কলেজের ছোক্‌রাকে আমি কোন্ কাজে বহাল করি ! যা' হোক যখনই এ রাস্তা দিয়ে যাবেন, আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। একটা জুটবেই।"

"যে আজ্ঞে।"

"আর যদি কোন জরুরী কাজ জুটে, আমরা আপনার নামে টেলিগ্রাম করব। এতে আমাদেরও ত কম লাভ নেই। একথা জানবেন, আপনাদের নাম রেজেষ্ট্রি

করার ফি থেকে আমরা কিছুই পাই না; যাদের চাকুরী আমরা ক'রে দিই, তাদের কাছ থেকে প্রথম বছরের মাহিনার শতকরা ৫৲ টাকা যাহা আমরা লই তাতেই আমাদের যা' কিছু লাভ। সুতরাং আপনি যে একটা চাকুরী পান, এবিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য এবং স্বার্থ আমাদের আছে।"

গুরুবল সিং ম্যানেজারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি হইতে নামিতেছিল। তাহার নিকট একখানা কুড়ি টাকার নোট ও কয়েক আনা পয়সা ছিল—ইহাই তাহার শেষ সম্বল। সে সিঁড়ি দিয়া এক পা এক পা করিয়া নামিতেছিল, আর ভাবিতেছিল,—দূর হউক, না হয় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিব। কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, ফুটবল খেলিতে গিয়া একবার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সমর-বিভাগের ডাক্তারের পরীক্ষায় এ দোষ নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। এই ভাবনায় হঠাৎ তাহার মুখ নৈরাশ্য-মণ্ডিত হইল এবং সে কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় যখন সে সিঁড়ির শেষ ধাপটীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক গুরুবলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আর একটু হইলেই ভদ্র লোকটীর সহিত তাহার ধাক্কাধাক্কি হইত। গুরুবল ইঁহার বেশভুষা ও চাল-চলন দেখিয়া বুঝিল, ইনি নিশ্চয়ই একজন বড় ব্যবসায়ী হইবেন। আগন্তুক ভদ্রলোক গুরুবল সিংকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'আর একটু হ'লেই আপনার গায়ে পড়্‌তুম, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি বল্‌তে পারেন,—সার্ভিস এম্‌প্লয়মেণ্ট এজেন্সির অফিস কি এই বাড়ীর উপর-তলায়?"

"হাঁ, আপনি কি কা'কেও চান্?" আপনি কি এজেন্সির ম্যানেজার? বাঁচা গেল, আমাকে আর সিঁড়ি ভাঙ্গ্‌তে হল না।"

গুরুবলের মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে অনুমান করিল, ইনি লোক খুঁজিতে আসিয়াছেন। গুরুবল বলিল, "না ম'শায় আমি একটা চাকুরী খুঁজিতেছি। আমি ভাবছি, আমার মত লোক যদি আপনার দরকার হয়—"আগন্তুক পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন ও গুরুবলের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে দেখে বোধ হচ্চে নব্য কলেজের ছোক্‌রা; কেমন নয় কি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আপনি আপনার সচ্চরিত্রতার জন্য 'সার্টিফিকেট' দিতে পারেন?"
"খুব পারি। আমি স্কুলে খুব মারামারি কর্‌তেম এবং একবার পুলিসের একজন কনেষ্টবলকে মেরেছিলেম ব'লে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার দোষের মধ্যে এই যা আপনাকে বল্‌লেম।"

"পুলিশের লোককে মেরেছেন! তা' আপনাদের অল্প বয়স, কাজেই রক্ত গরম। আমার কি রকম লোকর দরকার জানেন, আমি আপনার মত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সাহসী ও বলিষ্ঠ লোকেই চাই। বর্ম্মা দেশের জঙ্গলে আমাদের কাঠ চিরাইয়ের একটা কল আছে, সেই কলটাতে পাহাড়ী লোকেরা মজুরী করে। তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় কর্‌তে হ'লে সাহসী লোকেরই দরকার। তবে তাদের কাছ থেকে অন্যায় ক'রে কাজ আদায় কর্‌তে বলি না। যে সময়টুকুতে কাজ করায় জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, সেই সময়টুকু তারা ফাঁকি না দিতে পারে, এটুকু লক্ষ্য ক'রে তাদের খাটাতে হবে। আমি অনেক লোককে একাজে নিযুক্ত করেছি, কিন্তু কেউ টিক্‌তে পারে নি। আপনি যদি এ কাজ কর্‌তে সম্মত হন, তা হ'লে হোটেল-ডি-দিল্লিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন। আমি কয়েক দিন সেখানে বাসা নিয়েছি। দেখ্‌বেন ঠিক সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় যাবেন। সেখানে সান্ধ্য ভোজন কর্‌তে কর্‌তে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'বে। হোটেলে আমার নাম—করমচাঁদ বল্লেই তাঁহারা আপনাকে বসাইবেন। হয় ত দু পাঁচ মিনিট আমার দেরীও হ'তে পারে, কিন্তু আপনি ঠিক সময়েই যাবেন। আমার হাতে অনেক কাজ, আমি চল্লুম।

আগন্তুক দ্রুতভাবে গুরুবলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া একখানি চলন্ত প্রথম শ্রেণীর ফিটনে উঠিয়া বসিলেন।

গুরুবল সিং ভাবিল, এইবার তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। সে বাসায় বেশ করিয়া মুখ-হাত-পা ধুইয়া-মুছিয়া ও বেশবিন্যাস করিয়া কেবলই মনে করিতে লাগিল, সন্ধ্যা কখন্ হইবে। সে অনেক দিন ভাল জিনিষ খায় নাই। ছেলেবেলায় তাহার পিতা যখন জীবিত ছিল, তখন সে দু'পাঁচ বার হোটেল-ডি-দিল্লীতে যে না খাইয়াছিল এমন নহে; সেইজন্য এই হোটেলে

সম্ভাবিত সান্ধ্য ভোজের লোভে তাহার রসনা আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল এবং সে মাঝে মাঝে চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছিল, বৈকাল হইতেই গুরুবল হৃষ্টমনে বাসা হইতে বাহির হইল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে হোটেল-ডি-দিল্লীতে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই সে হোটেলের কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মিঃ করমচাঁদ কি এসেছেন?"

কেরাণী উত্তর করিল,—আমি ঠিক বল্‌তে পারি নে। আচ্ছা আমি দেখে বলে দিচ্ছি।"

ঠিক এই সময়ে মিঃ করম চাঁদ উপস্থিত হইলেন। তিনি গুরুবলকে দেখিয়া বলিলেন,—"বেশ আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"দেখুন, আপনি হোটেলের কেরাণীকে বলুন, আমাদিগকে একটা কোণের ঘর দিতে। আর যা যা আপনি ভাল বুঝেন, সেই রকমের দুইজনকার মত ভোজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে বলুন। আমি এসব বলা-কওয়া বড় ভালবাসিনে।

গুরুবল সিং পেটুক লোক। সে নিজের পছন্দ মত ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া মিঃ করম চাঁদের কাছে ফিরিয়া আসিল। মিঃ করম চাঁদ বলিলেন,— "কি মশায় সব ঠিক ঠাক তো। চলুন বসে খাওয়া যাক।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহারা দুইজনে আহারে বসিলেন. আহার করিতে করিতে মিঃ করম চাঁদ বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন আমার কারখানায় দুই তিন জন ভাল লোক আছেন, তাঁরা ব্যবসা ও হিসাবপত্রই ভাল বুঝেন। কিন্তু লোক খাটাতে জানেন না। আপনাকে দেখে আমার বিশ্বাস হয়, আপনি তা পার্‌বেন। আমি আপনাকে এই কাজে নিযুক্ত কর্‌লেম। বছরে আপনি এখন ১২০০৲ টাকা ক'রে বেতন পাবেন। সেখানে থাক্‌বার বাসা আমরাই দিব, কিন্তু খাই-খরচ আপনার। যাবার জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়া আপনি পাবেন। আর যদি দু'বছর কাজ করেন, তবে ফিরে আসবার জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়া আমরাই দিব। যারা দু'চার মাস কাজ ক'রে কাজ ছেড়ে দেয়, তাদের আমি পছন্দ করিনে।"

"না মশায়, আমি বরাবর থাক্‌ব"—গুরুবল সিং সাগ্রহে একথা বলিল।

"মিঃ করম চাঁদ বলিলেন,—"এইত ঠিক। তবে আপনাকে কষ্ট ক'রে চলতি মত বর্ম্মাদের ভাষা শিখতে হ'বে। তা'হলে আপনি তাদেরকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে আনতে পারবেন। বোধ হয় আপনি তিন মাসের মধ্যে এ কাজে সফল হইতে পারবেন। এখন বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে ঠিক করুন,—আপনি এ কাজ করতে পারবেন কি না। বেশ করে ভেবে দেখে জবাব দিবেন।"

এ দিকে কথায় কথায় আহারও শেষ হইয়া আসিল। তখন মিঃ করম চাঁদ বলিলেন, "বাঃ চমৎকার আপনার আহার্য্য-নির্ব্বাচনের শক্তি! বহুদিন যে ব্যক্তি ভদ্রসমাজে না মিশেছেন, তিনি কখনও এরূপ ভাবে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করতে পারেন না। এটাতেও আমি আপনাকে পরীক্ষা করলেম। যাক এখন বলুন, আপনি কাজে সম্মত কি না।"

মাথা নাড়িয়া গুরুবল সিং বলিল—"আজ্ঞে আমি একাজ আনন্দের সহিত গ্রহণ করছি। প্রাণপণ শক্তিতে আমি আপনার কাজ করব।"

"বেশ! তা'হলে আপনি একটু বসুন। আমি একবার উপরতলা থেকে ফিরে আসি। আপনার নাম ও ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি চেক বইখানা উপর থেকে এনে আপনাকে পথখরচস্বরূপ আপাততঃ দুই শত টাকা দিচ্ছি, আপনি কালই যাত্রা করুন। কোন অমত থাকে ত এখনও বলুন।"

"না মশায় আমার কোন অমত নেই। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি কর্ম্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

"আচ্ছা তবে পাঁচমিনিটের জন্য বসুন। আমি এসেই আপনাকে চেক দিতেছি।"

মিঃ করম চাঁদ চলিয়া গেলেন। গুরুবল সিং তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, পনের মিনিট গেল, আধঘণ্টা গেল, মিঃ করম চাঁদ আর ফিরেন না। গুরুবল সিং চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে হোটেলের একজন খানসামা তাঁহার নিকটে আসিয়া একখানি বিল দিল, বিলের পরিমাণ ২০৲ টাকা। বিল দেখিয়াই মিঃ গুরুবল সিংএর চক্ষু স্থির। সে খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি মিঃ করম চাঁদের লোক। মিঃ করম চাঁদ এই হোটেলের উপরতলায় থাকেন। তিনিই বিল দিবেন, আমি বিল দিব না।"

খানসামা আর একজন খানসামাকে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিল। গুরুবল বুঝিতে পারিল, তাহারা আমাকে নজরবন্দী করিল। একটু পরেই একজন সাহেব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে গুরুবল সিং বলিলেন, "মিঃ করম চাঁদ যিনি আপনাদের হোটেলের উপরতলায় থাকেন, তিনিই এই বিলের টাকা দিবেন।"

সাহেব বলিলেন,—"কৈ করম চাঁদ ব'লে কোন লোক আমাদের এখানে থাকেন না। এ নামও আমি কখনও শুনি নি।"

তখন গুরুবল আপনার বিপজ্জনক অবস্থার কথা বুঝিতে পারিল। হোটেলের সাহেবের নিকট গুরুবল সিং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বলিল। সাহেব তখন হোটেলের অর্ডার-রেজিষ্ট্রারকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন দেখি ইনি কি আপনাকে কোন 'অর্ডার' দিয়াছিলেন।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

সাহেব তখন বলিলেন,—"তবে আপনাকেই বিলের টাকা দিতে হ'বে।

"আমি কেন দিব ?"

"না দেন, আপনাকে পুলিশের হাতে দিতে হ'বে।"

তখন গুরুবল ভাবিল, গোলমালে আর ফল কি ? নিজের পকেট হইতে তাহার শেষ সম্বল ২০৲ টাকার নোটখানি সাহেবের হাতে দিয়া সে হোটেল হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু করম চাঁদকে সে হাড়ে হাড়ে চিনিয়া রাখিল।

* * * * * *

এই ঘটনার পর প্রায় তুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, কদর্য্য কুর্ত্তা গায়ে দিয়া এবং মাথায় একটা ময়লা পাগ্ড়ী বাঁধিয়া গুরুবল সিং বোম্বাইএর ষ্টেসনে যখন যাত্রীদিগের লাগেজের মালপত্রে কাগজ আঁটিতেছিল, সেই সময়ে তাহাকে আহ্বান করিয়া জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "পুণার ট্রেণ কি এখনই ছাড়্বে !" গুরুবল উত্তর করিল,—"আর পাঁচ মিনিট মাত্র দেরী আছে।" আগন্তুক ভদ্রলোক তখন তাহাকে একটা আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও বক্সিস, আর এই নাও ৫০৲ টাকার একখানা নোট, আমাকে শীগ্গির একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস পুণা যাইবার টিকিট কিনে দাও। আমার কাছে খুচরা টাকা নাই। আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি।"

অদৃষ্টের ফেরে গুরুবল এখন লাগেজ ঘরে লোকেদের মালপত্রে টিকিট আঁটিত। রেলরসীদ লিখিয়া দিত। বড় বড় যাত্রীদের ট্রেণে উঠাইয়া দিবার সুবিধা করিয়া দিত। ইহাতে কোনরূপে তাহার দিন গুজরান হইত। সে দেখিল, হাতে হাতে আট আনা পয়সা লাভ মন্দ নহে। সে তখনই আগন্তুক ভদ্রলোকের জন্য একখানি প্রথম শ্রেণীর ঠিকিট কিনিয়া আনিল ও বাকী টাকা ফেরত দিল। আর ভদ্রলোকের হাতব্যাগটী লইয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিতে চলিল। ভদ্রলোক প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় উঠিয়া তাহাকে আরও একটা আধুলি দিলেন। এই সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। একজন যাত্রী দৌড়িয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল দেখিয়া কয়েকজন পুলিশ ও টিকেট কালেক্টার সেইদিকে ছুটিল। গুরুবল সিং সেই অবসরে দরজা খুলিয়া এই ভদ্রলোকটীর কামরায় উঠিয়া পড়িল। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল।

কুলীর মত একজন লোককে প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে দেখিয়া ভদ্র যাত্রী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ভুল ক'রে উঠেছ—এটা যে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী।"

"মিঃ করমচাঁদ! তা জানি এ গাড়ীতে একজন প্রথম শ্রেণীর বদমায়েস বসিয়া আছে।"

"আমাকে যে তুমি করমচাঁদ বল্লে? আমার নাম করমচাঁদ নয়। তুমি বুঝে-সুজে কথা কও।"

"তোমার গোঁফের চুলগুলি সব সাদা ক'রে ফেলেছ বটে, কিন্তু হোটেল-ডি-দিল্লীতে গুরুবল সিংএর সঙ্গে ভোজ খাবার সময়ে হাতে যে আংটী ছিল, সেটাতো এখনও হাতে রয়েছে। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনে রেখেছি।"

"দেখ যদি তুমি বেশী চালাকি কর, এখনই ট্রেনের শিকল টানিয়া তোমাকে পুলিশের হাতে দিব।"

"তা' টান। ট্রেণ থাম্‌বার আগে তোমায় আমি আধমরা কর্‌ব। তারপর জুয়াচোর ব'লে তোমাকে ধরিয়ে দিব। শিঁকল টান ত টান, নইলে আমার যা পাওনা আমাকে দাও।"

"আমার টাকা নেই।"

"প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছ, টাকা নেই?"

"দাও, দাও, ২০৲ টাকা দিলেই তোমার ধার চুকে যাবে।"

করমচাঁদ দেখিল, গুরুবল সিং সোজা লোক নহে। উহার দাবী মিটাইয়া দিয়া হাঙ্গামা চুকাইয়া ফেলাই ভাল। এই মনে করিয়া সে প্রথমে গুরুবলকে ১০৲ টাকার একখানা নোট প্রদান করিল। তার পর গুরুবলের রক্তবর্ণ নয়নযুগল দেখিয়া তিন চারিবার পকেটে হাত দিয়া আরও একখানা ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। এইবার করমচাঁদ বলিল, "তোমার টাকা পেলে ত! এখন পরের ষ্টেসনে নেমে যাও।"

"আমি আরও ১২০০ শত টাকা এক বছরের মাহিনা বাবদ তোমার কাছে পা'ব।"

"কিন্তু তোমাকে যে চাকুরীতে নিযুক্ত ক'রেছিলুম, সেটা একটা বিদ্রূপ বৈ ত নয়।"

"তোমার কাছে বিদ্রূপ হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। এ টাকাও আমি এখনই চাই। নইলে তোমাকে জুয়াচোর ব'লে ধরিয়ে দেব। তোমার জামা-কাপড় থেকে ব্যাগ পর্য্যন্ত পুলিশকে দিয়ে তল্লাসি করা'ব।

"তুমি ত ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি!

"আমি আর এক মিনিটমাত্র সময় দিচ্ছি। ১২০০ টাকা দেবে ত দাও। নইলে এখনই শিঁকল টেনে তোমাকে পুলিশে দিব। তোমার মত লোক ফাষ্ট ক্লাসে কেমন ক'রে চড়্‌তে পারে, তার জবাব তোমাকে তখন দিতে হবে।"

করম চাঁদ আর বাক্যব্যয় না করিয়া গুরুবলকে একতাড়া নোট প্রদান করিল। গুরুবল গণিয়া দেখিল,—তাহাতে ১০৲ টাকা করিয়া ১২০ খানা নোট রহিয়াছে। নোটগুলি পকেটে রাখিয়া গুরুবল কুলির বক্‌শিস রূপে প্রাপ্ত একটা টাকা করম চাঁদকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "বোঝার উপর শাকের আটি আমি আর বইতে চাইনে। আমি আশা করি, আপনার বর্ম্মার কাঠ-চিরায়ের কল এখন বেশ চলিতেছে।"

করম চাঁদ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। পরবর্ত্তী ষ্টেসনে ট্রেণ থামিবা মাত্র গুরুবল সিং নামিয়া পড়িল এবং ভাড়া চুকাইয়া দিয়া রাজপথে বাহির হইল।

এক ঘণ্টার মধ্যে নূতন পোষাক পড়িয়া যখন গুরুবল পুনরায় ষ্টেসনের দিকে ফিরিতেছিল; তখন নিকটবর্ত্তী একখানি ষ্টেশনারী দোকানে সেইদিনকার 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র প্লাকার্ডে দেখিতে পাইল—"প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাঙ্কের

ধনরক্ষক প্রতারিত হইয়াছে। খুচরা নোটে ও গিনিতে পনর হাজার টাকা চুরি গিয়াছে।" আগ্রহান্বিত হইয়া গুরুবল সিং একখানি কাগজ কিনিয়া সেই সংবাদটীর একস্থলে পড়িল,—"ধনরক্ষক সেই প্রতারককে ভালরূপ লক্ষ্য করেন নাই। তবে তাহার গোঁফ পাকা ও পোষাক-পরিচ্ছদ জমকাল ছিল।"

গুরুবল সিং ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, ইনি আর কেউ নন, আমার সেই প্রভু—আদর্শ প্রভু।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

মেঘদূত।

(আষাঢ়ে)

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"
পারস্য-পতির বিরহ-বিবশে
বুঝি বা বিদরে বক্ষ!
আপশোসে মরে ওস্‌মান পাসা
"ছতিন্ নয়"—শুধু পড়ে পাশা
বাহাবা—হামারা অক্ষ!
"মুঝে ভরে দে রঙ্গে পেয়েলা"
মহলে মহলে কুজে কোয়েলা
মঞ্জীর মুখর কক্ষ!
অঙ্গে নাহি আজি সাঁজোয়া সঙীন্
সিরাজীতে রাজি!—রভসে রঙীন্
অদূরে মদির মোক্ষ!
আলয়ে আলয়ে আজব গল্প
স্থবির ক্লান্ত কবির কল্প
মেলিয়া দিয়াছে পক্ষ!

সজ্জ কাননে বাজিছে মাদল
গর্জ্জে গগনে বরষা বাদল
ফুকারে বিকারে যক্ষ—
"কোথা আর্ত্তসখা—আবর্ত্ত-জীমূত?
ভুবন-বিদিত পুষ্করের সুত!
দুর্দ্দিনে এ দীনে রক্ষ।

অহো!

দেয়া-ডাক নয়—বিছার কামড়!
ওরে রামা! ঢুলা কেয়ার চামর,
জলে জ্বলে যায় বক্ষ!
এস প্রিয়ে ক্ষিপ্র—এস "শিপ্রা" বুকে
করি "বপ্রক্রীড়া"—দুজনায় সুখে
বৃদ্ধ এ বিপ্রে রক্ষ
লো আমার দ্বিতীয় পক্ষ!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

বিখ্যাত সাহিত্যিক, বঙ্গ-বাণীর নীরব সাধক, নব পর্য্যায় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলাদেশ হইতে একজন নিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবকের তিরোধান হইল,—এ সংবাদে প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীই যে দুঃখিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

শৈলেশবাবু যখন "সমালোচনী" বাহির করেন, সেই সময় হইতে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয়। তিনি সদালাপী, প্রিয়ভাষী এবং অমায়িক-স্বভাব ছিলেন। গল্পরচনায় তাঁহাস সুযশ ছিল। তাঁহার রচিত 'চিত্রবিচিত্র" নামক গল্পের বহিতে তাঁহার অসাধারণ চরিত্রাঙ্কন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'ইন্দু' নামক এক উপন্যাসও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অধুনা-লুপ্ত 'প্রদীপ' মাসিকপত্রে তদ্‌রচিত "কলিকাল", ও "নীলকণ্ঠ" নামক দুইখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছিল। নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শন"-প্রকাশে শৈলেশচন্দ্রই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তদবধি তিনি 'বঙ্গদর্শন'-প্রাণস্বরূপ ছিলেন। নিজে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও 'বঙ্গদর্শন' তিনি প্রকাশ করিতেছিলেন। বঙ্গ-বাণীর সেবায় তিনি কতদূর আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, শৈলেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার সদ্গতি হউক।

পুস্তক-পরিচয়।

রামায়ণ-যুগের ভারত।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, ব-এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি আছে :—

(১) রামায়ণের রচনাকাল, (২) রামায়ণী সভ্যতা ও সমাজ, (৩) রামায়ণ-যুগের শিল্প, (৪) জনপদ (জনপদের মধ্যে, অযোধ্যা, বিদেহ, কিষ্কিন্ধ্যা, সুবর্ণদ্বীপ বা লঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থানের সম্বন্ধে আলোচনা আছে)।

প্রবন্ধ কয়টি স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পরের ভিতর এমন একটী শৃঙ্খলা আছে, যাহাতে রামায়ণ-যুগের ভারতের মোটামুটী রকমের রেখাচিত্র প্রস্ফুট। পুস্তকখানিতে লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও সংগ্রহ-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। লিখিবার ভঙ্গীও মন্দ নহে। 'রাবিশ' কবিতা ও গল্পের পুস্তক-রচনা অপেক্ষা এই শ্রেণীর পুস্তক-রচনায় ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এবং গৌরব-বর্দ্ধন হয়। পুস্তকখানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ অনেকগুলি আছে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেগুলির সংস্কার সাধন করিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন, —"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।" কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের ভূমিকা পুস্তকের কোথাও দেখিলাম না।

গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ বেশ ভাল এবং মূল্যও সুলভ। "অর্ঘ্যে"র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

আকিঞ্চন (কবিতা-পুস্তক)। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র-প্রণীত। কলিকাতা ৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন, 'দীনধাম' হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

'আকিঞ্চনে' সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী কবিতা আছে। তন্মধ্যে দুইটী কবিতা "বঙ্কিম চন্দ্র" ও "উত্তর" যথাক্রমে শ্রীযুত ললিতচন্দ্র মিত্র ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়-রচিত। "আকিঞ্চনে" প্রকাশিত কোন কোন কবিতার সহিত এই দুইটীর অটুট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই উহারা প্রকাশিত হইয়াছে।

"আকিঞ্চন" কবিতার এই নূতন যুগে—যে যুগে কবিতার ভাব অস্পষ্ট হইয়াছে, কবিতা কেবল কতিপয় শ্রুতিমধুর শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং কবিতায় গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে চটুলতা আসিয়াছে ও কবিতার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, পুরাতন যুগের সুস্পষ্টতা, ভাব ও সাদা সিদা ছন্দ-সৌন্দর্য্য লইয়া বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। 'আকিঞ্চনে'র

অধিকাংশ কবিতাই ভাবের মাধুর্য্যে, ছন্দের উৎকর্ষে, শব্দ-শোভায় সকলেরই চিত্ত হরণ করিবে। "শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে গমন", "নারদের ব্রহ্ম-দর্শন", "ব্যাস-নারদ সংবাদ" প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিবার সময় মনে হয়, যেন স্বর্গীয় কবি নবীন চন্দ্রের কবিতা পাঠ করিতেছি। গ্রন্থকার বঙ্কিম বাবুর পক্ষে ইহা বড় অল্প প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা নহে। 'আকিঞ্চনে'র বহু স্থানের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার যোগ্য। কিন্তু "অর্ঘ্যে"র ক্ষুদ্র কলেবরে স্থানাভাব। তবুও আমরা "তর্পণ" শীর্ষক কবিতা (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত) হইতে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের কবিতা-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় পাইবেন।

তেজে দীপ্তিমান্ রবি মধ্যাহ্ন আকাশে।
মাধুর্য্যে, শরতে যেন পূর্ণ শশী হাসে,
দৃঢ়তায় মূর্ত্তিমান্ মহা হিমালয়,
কুসুম-কোমল গুণে কর পরাজয়,
সাহিত্যের অন্ধকারে জ্যোতি পূর্ব্বাশার,
সমাজের মর্ম্মব্যথা মরমে তোমার,
দীনের অতিথিশালা সদা মুক্তদ্বার,
তোমার ঘরের ছেলে জগৎ সংসার;
অনন্ত গুণের সিন্ধু! কে দিল তোমায়,
"বিদ্যার সাগর নাম, অতি ক্ষুদ্র কায়,
হৃদয়-সাগর তুমি হৃদয়-প্লাবন,
হৃদয়-জলধি-মাঝে সকলি লগন;
বিদ্যার সাগর ডুবে হৃদয়-সাগরে,
বিপুলা এ ধরা যথা ব্রহ্মাণ্ড কন্দরে।

এইবার একটা কথা আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। "স্বদেশ-স্তোত্র" ও "ভারতবর্ষ" নামক কবিতা দুইটী আমাদের মতে তেমন ভাল হয় নাই, কারণ এই দুইটীতে কষ্ট-কল্পনা যথেষ্ট আছে, এবং ছন্দের অবাধগতি ও মুক্ত ভাব ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। পড়িলে মনে হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বে স্থান সম্পূরণের জন্য যেন ধরিয়া ধরিয়া লেখা—ভাবের আবেগে রচিত নহে। এমন একটু-আধটু কলঙ্ক ধরি না; আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, 'আকিঞ্চন' পাঠ করিয়া আমরা যেমন পরিতৃপ্ত, তেমনই উপকৃত হইয়াছি। এমন উচ্চ ভাবমূলক কবিতা-গ্রন্থের এ দেশে যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব বাঙ্গালা দেশে কবিতা-রসাস্বাদী লোকের একান্ত অভাব হইয়াছে।

অর্ঘ্য,
৪র্থ কল্প, ১১শ খণ্ড।

যৌথ-পরিবার ও বাল্য বিবাহ।

(শেষ প্রস্তাব)

ইউরোপে বিবাহ হইবামাত্র সেই দম্পতি অন্যান্য জ্ঞাতি-কুটুম্ব হইতে পৃথক হইয়া বাস করে। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষকে পরিবার প্রতিপালন-যোগ্য উপার্জ্জনশীল হওয়া আবশ্যক। আর নববধূকে বিবাহের দিনেই সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহের উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বর ও বধূ উভয়েরই বয়স অধিক হওয়া আবশ্যক। এইজন্য ইউরোপে বাল্য বিবাহ অযোগ্য এবং অপ্রচলিত। ইহা তাহাদের আধুনিক রীতি নহে, চিরন্তন প্রথা। তাহাদের একান্ত স্বার্থপরতা হেতু তাহারা যৌথ-সংসার করিতে পারে না। আবার ইউরোপে জ্যেষ্ঠপুত্র একাকী সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, অন্যান্য সন্তানেরা কিছুই পায় না। এইজন্য পুরুষেরা উপার্জ্জন-সমর্থ না হইলে বিবাহ করিতে পারে না। আবার কুমারীরা পাত্রের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন করিয়া অগ্রে তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করে। তাহাতে পরস্পরের মনোমিলন হইলে বিবাহ হয়। নতুবা তাহারা আপ্যায়ন ভঙ্গ করিয়া অন্য যুটী যোটাইতে চেষ্টা করে। ঈদৃশ প্রাগাপ্যায়ন-কার্য্যেও অধিক বয়স প্রয়োজনীয়, তজ্জন্যই ইউরোপে পুরাতন অসভ্যাবস্থা হইতেই বাল্য বিবাহ নাই। তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দু-মুসলমান মধ্যে বাল্যবিবাহ দেখিয়া মনে করে যে, এদেশের নব দম্পতিকেও সেই সকল কার্য্য করিতে হইবে। অথচ নব-পরিণীত বালক-বালিকারা সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাহারা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়। আমি দেখাইতে চাই যে, হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রয়োজনীয় এবং তাহার ফল সর্ব্বতোভাবেই উৎকৃষ্টতর। মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজেও বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। আমার যুক্তিসমূহ তাহাদের সম্বন্ধেও প্রযুজ্য বটে।

প্রথমতঃ প্রাগাপ্যায়ন হিন্দুসমাজে হইতে পারে না। কামপ্রবৃত্তি অতীব দুর্জ্জয়। যুবক-যুবতী স্বাধীনভাবে আপ্যায়ন করিবে অথচ সংযোগ হইবে না,

ইহা অসম্ভব। পাশ্চাত্য সমাজে যেরূপ প্রাগাপ্যায়ন (courtship) হয় তাহাতে গর্ভ হইলে, যদি মনোমিলন হয়, তবে বিবাহ হয়; যদি মনোমিলন না হয় তবে বরটী সরিয়া যান, কুমারী যথাকালে অনাথ আশ্রমে (Orphan Asylum) গিয়া সন্তান প্রসব করিয়া আসেন। এরূপ কার্য্যে ইউরোপে কোন দোষ নাই। এইরূপ কানীন সন্তানরক্ষার জন্য ইউরোপে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনাথাশ্রমে প্রসূত সন্তানদের জনক-জননীর সহিত পরিচয় হয় না। তাহাদের ভাগ্যে কতদূর দুর্গতি হয়, তাহা অনেকেই জানেন। এদিকে হিন্দুসমাজে কন্যার অভিভাবকেরা পাত্র পছন্দ করিয়া কন্যার অল্প বয়সেই বিবাহ দেন। মনুষ্যেরা যেরূপ সংসর্গে থাকে, সেই অনুযায়ী গুণ প্রাপ্ত হয়। আবার সেই সংসর্গের ফল শৈশবে যত কার্য্যকারী হয়, বেশী বয়সে তত হয় না এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির উপর সংসর্গের দোষগুণ সমধিক বর্ত্তিয়া থাকে। হিন্দু বালিকারা বিবাহের সময় অল্পবয়স্কা থাকে। তখন তাহাদের চরিত্র গঠিত হয় না। তাহারা বিবাহিতা হইয়া যে সংসারে যায়, সেই পরিবারের রীতিনীতি-চরিত্র দেখিয়া নিজেও তদনুরূপ হয়; সুতরাং মনোমিলনের জন্য প্রাগাপ্যায়ন আবশ্যক হয় না; পরন্তু পাশ্চাত্য বধূদের কেবল স্বামীর সহ মনোমিলন আবশ্যক। এদেশের বধূদের স্বামীর পিতামাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি বহুলোকসহ একত্র বাস করিতে হয়, সুতরাং সেই সকল লোকের সহিত মনোমিলন প্রয়োজনীয়। তাহা প্রাগাপ্যায়ন দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্যও অল্পবয়সে বিবাহ প্রয়োজনীয়। কেন না অল্পবয়স্কা বালিকা যে সংসারে যায়, সেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সংসর্গে সেই চরিত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে সমর্থা হয়।

ইউরোপে দম্পত্যকলহ যত বেশী, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-সমাজে তদপেক্ষা অনেক কম। পাদরী ষ্টোন বলেন; "ইউরোপে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলিয়া সেখানে পত্নীরা পতিসহ বিবাদ করিতে ভয় পায় না; সুতরাং তাহারা স্বামীর কার্য্য অপ্রীতিকর হইলে স্পষ্ট বিবাদ করে।" এদেশে পত্নীরা স্বামীর অধীন বলিয়া সহজে স্বামীর সহিত ঝগড়া করে না। আবার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির দ্বিতীয় স্বামিলাভের আশা না থাকায় তাহারা সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, কিছুতেই পতির সহিত বিবাদ করিতে পারে না। সেইজন্য

এদেশে বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে দাম্পত্যকলহ কম হয়। পাদরী সাহেবের সিদ্ধান্ত কতক সত্য বটে, কিন্তু বাল্যকালাবধি একত্র অবস্থান হেতু যে মনোমিলন সংঘটিত হয়, তজ্জন্য পরস্পরের কার্য্য অধিকাংশই পরস্পরের অনুমোদিত হয়। ইহাই দাম্পত্য কলহের অল্পতার প্রধান কারণ। ইউরোপে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রীর যে অল্পকালব্যাপী প্রাগাপ্যায়ন হয়, তাহাতে উভয়েই নিজ চরিত্র প্রচুর পরিমাণে ছাপাইয়া চলে; সুতরাং তৎকালীন মনোমিলন সর্ব্বথা প্রকৃত নহে। বিবাহের পর যখন প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হইতে থাকে, তখন অনৈক্য ও কলহ আরম্ভ হয়। অনেক স্থলেই স্ত্রীত্যাগ দ্বারা সেই কলহের শান্তি করিতে হয়, যে সকল দেশে বাল্য বিবাহ আছে, সে সকল দেশে এরূপ স্ত্রীত্যাগ, স্বামিত্যাগ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সাংসারিক কার্য্য।—হিন্দুসমাজে যেমন বাল্য বিবাহ হয়, তেমনই সাংসারিক কার্য্যভার সেই নবদম্পতির উপর পড়ে না। নূতন বর যেমন পঠদ্দশায় বিবাহ করে; বিবাহের পরও তেমনই পঠদ্দশাতেই থাকে। পরিবারের কর্ত্তারা নিজ বিবেচনামত বালকদের বিবাহ দেন। বিবাহের পূর্ব্বে যেমন কর্ত্তা-কর্ত্রীর উপর সাংসারিক ভার থাকে, ঐ বিবাহের পরেও তদ্রূপই থাকে। নব বধূ বা ফুল বৌ দুই একটী সহজ কাজ কর্ত্রীর উপদেশমত করিয়া ক্রমে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে থাকে। ইউরোপের বধূদের আগে কাজ শিখিয়া পরে বিবাহ হয়, হিন্দুসমাজে বিবাহের পর বৌএর গৃহকর্ম্ম শিক্ষা আরম্ভ হয়। সচরাচর বিবাহের বহুদিন পরে বৌদের উপর সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার বর্ত্তিয়া থাকে। এদেশে ভদ্রলোকের মধ্যে গড়ে একাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ হয়—ইউরোপেও ভদ্রবংশীয়া কন্যাদের গড়ে ১৫ বৎসর বয়সেই বিবাহ হয়। সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা কদাচ সংসারের সমস্ত কার্য্যে সুদক্ষ হইতে পারে না; অথচ বিবাহের দিনই সেই বালিকার গৃহিণী হইয়া সমস্ত কর্ম্ম একাকী নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হয় না, কাজেই বিস্তর কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয় এবং বিস্তর ঠকিতে হয়। হিন্দু বালিকারা বিবাহের পনের বিশ বৎসর পরে গৃহিণী হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বেই তাহারা অভিজ্ঞা ও সুশিক্ষিতা হইয়া উঠে। সুতরাং গৃহিণী হইয়া তাহারা ঠকে না বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তেমনই বিবাহিত হিন্দু বালক বিবাহের বহুকাল

পরে সংসারের ভার প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সে তখন সর্ব্বথা অভিজ্ঞ এবং কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য পরিবারের কর্ত্তা-কর্ত্রী অপেক্ষা হিন্দু পরিবারের কর্ত্তা-কর্ত্রীর কাজ প্রচুর বেশী। পাশ্চাত্য কর্ত্তার কার্য্যমধ্যে (১) নিজ ব্যবসায়-চালনা এবং (২) নিজ পত্নী ও নাবালক সন্তানদিগকে প্রতিপালন; কেবল এই দুইটি মাত্র। পাশ্চাত্য গৃহিণীরও কার্য্য কেবল দুইটী মাত্র (১) নিজ সংসারের বৈষয়িক কর্ম্মনির্ব্বাহ এবং (২) নিজ নাবালক সন্তানদের সংরক্ষণ। তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মমধ্যে প্রতি রবিবারে চার্চ্চে গিয়া পাদরী সাহেবের বক্তৃতা শুনা। সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহাদের কোন বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম অথবা অভিজ্ঞতা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে হিন্দু কর্ত্তার অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হয়। যথা, (১) ব্যবসায়িক কাজ চালাইতে হয়। (২) যৌথ-পরিবারের সমস্ত লোককে প্রতিপালন করিতে হয়; (৩) যৌথ ভাগীদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিতে হয়; (৪) বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা করিতে হয়; (৫) অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, ব্রত, দোল, দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা পূজা প্রভৃতির আয়োজন করিতে হয়। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মসমূহে প্রচুর ব্যয়, পরিশ্রম এবং বুদ্ধি-চালনা আবশ্যক। সেই সকল যজ্ঞ ও পূজার আয়োজনে যত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা যোগাইতে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়। সুতরাং দেশের আর্থিক পরমার্থিক উভয় প্রকার উন্নতিই হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! তুমি বড় ভাল মানুষ, তুমি বড় দয়াবান্, তুমি বড় বুদ্ধিমান প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য বাক্যব্যয়ে হিন্দুধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। ইয়োরোপে যেমন পিতা মাতা প্রভৃতির বৃদ্ধকালে কোনরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিতে কিংবা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না, তাহারা হস্পিটালে গিয়া পড়িয়া মরুক, মৃত্যুর পর হাতে একটু কালা ফিতা বাঁধিলেই সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়; তেমনই ধর্ম্মা-ধর্ম্মের পর্ব্ব-সংখ্যা অতি অল্প, তাহাতেও কোন ব্যয় নাই, পরিশ্রম নাই, শুদ্ধ গোটা কয়েক লম্বা চৌড়া বাক্য বলিলে উপাসনাকার্য্য সুসম্পন্ন ও সমাপ্ত হয়। হিন্দুর গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম যেমন অনেক বেশী এবং ব্যয় ও শ্রমসাধ্য, তেমনই ঈশ্বর-উপাসনার পর্ব্বও অনেক বেশী এবং তাহাতে ব্যয় ও পরিশ্রম

অনেক বেশী করিতে হয়। সেই সকল পার্ব্বণিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কর্ত্তা-কর্ত্রীদের প্রচুর অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এইজন্য হিন্দু পরিবারে নবোঢ় যুবক-যুবতী কর্ত্তা-কর্ত্রী হইতে পারে না। তাহাদের হাতে কর্তৃত্ব পড়িবার পূর্ব্বে বহুদিন তাহাদের শিক্ষা আবশ্যক। আবার এই সকল শিক্ষার্থ অল্প বয়সে বিবাহ কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ইউরোপে বিবাহের পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে আপ্যায়নসময়েই ঘনিষ্ঠতা হয়। কোন কোন পাত্রীর গর্ভ হইবার পর বিবাহ হয়; নিতান্ত পক্ষে বিবাহের দিন হইতে দৈহিক মিলন নিশ্চিতই হয়। এজন্য ইউরোপীয়েরা ঐ উভয়কেই তুল্যার্থক বোধ করেন; কিন্তু হিন্দুসমাজে বিবাহের অনেক পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়। অনেক স্বামী স্ত্রীর তিন চারি বৎসর পরে একত্র বাস হইলেই সন্তান হয় না; স্ত্রী জাতির প্রথম ঋতু হইবার পর ৩২৪ দিন গত না হইলে গর্ভ হইতে পারে না; ইহা বিধাতার নিয়ম। সুতরাং স্ত্রীর গর্ভধারণের ক্ষমতা না হইলে, কদাচ গর্ভ হয় না। অতএব যাঁহারা মনে করেন যে, বাল্য-বিবাহ হেতু অকালে সন্তান হয়, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তবে যেখানে স্বামীর বয়স বেশী অথচ স্ত্রী বালিকা সেইস্থানেই স্বামী উগ্র কামপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইলে বালিকা পত্নী বহু কষ্ট পায়। ইহা বাল্যবিবাহের দোষ নহে বরং পুরুষের অধিক বয়স্ক হইয়া বিবাহ করার দোষ। স্ত্রীজাতির যৌবন পুরুষ অপেক্ষা ৪।৫ চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। এজন্য পাত্রী অপেক্ষা পাত্রের বয়স চারি পাঁচ বৎসর বেশী হওয়া উচিত। তাহা হইলে উভয়ের সমকালে যৌবন আরম্ভ হয়। উভয়ের ইন্দ্রিয়-বেগ সমান থাকে। বয়স-সম্বন্ধে এই নিয়ম যতই উপেক্ষিত হয়, ততই অসুখজনক হয়। যাহারা নিজে উপার্জ্জনশীল হইয়া বিবাহ করে, অথবা যাহারা প্রথম পত্নীর অভাব হইলে পুনরায় বিবাহ করে, তাহাদেরই বয়সের অসামঞ্জস্য ঘটে এবং তাহাদের কর্তৃকই বালিকা-পত্নী-পীড়ন ঘটিয়া থাকে। যেখানে বালক-বালিকার বিবাহ হয়, সেখানে উভয়ের বয়সের অসামঞ্জস্য হয় না; সুতরাং কোনরূপ পীড়ন হয় না।

চতুর্থতঃ, সাংসারিক ব্যয়। দরিদ্র লোকেরা অর্জ্জন-সমর্থ হইয়া বিবাহ করে। তাহারা যাবৎ উপার্জ্জনশীল না হয়, তাবৎ তাহাদের বিবাহ হয় না। দরিদ্র হিন্দুদের ঘরে বাল্য বিবাহ নাই। কিন্তু অনেক লোক অক্ষম দরিদ্র

কুলীনসহ কন্যার বিবাহ দেয়। তাহারা কন্যা জামাতা এবং তাহার সন্তান-দিগকে পালনের ভার স্বীকার করিয়াই এরূপ কুলকার্য্য করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই বাল্য বিবাহের উভয় পক্ষ নিতান্ত পক্ষে পাত্রপক্ষ সঙ্গতিপন্ন লোক। তাহারা যেমন বালক পুত্রের বিবাহ দেয় তেমনই তাহারাই নাবালক নব-দম্পতিকে প্রতিপালন করে। ফলতঃ হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহহেতু দম্পতি অর্থাভাবে কোন কষ্ট পায় না কিংবা সামাজিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয় না। তবে কিনা দৈবনিগ্রহ অনিবার্য্য। দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া আমার ন্যায় দরিদ্র হইয়া কষ্ট পাইতে সকলেই পারে।

পঞ্চমতঃ, সন্তানপালন। ইহা বলা হইয়াছে যে, বাল্যকালে বিবাহ হইলেই যে বাল্যকালে সন্তান হয়, তাহা নহে। আবার হিন্দু পরিবারে রমণীগণের যখন প্রথম সন্তান হয়, তখন সেই সন্তান-রক্ষণ ও পালনকার্য্যের অতি অল্প অংশই সেই প্রসূতিকে নিজে করিতে হয়। নবপ্রসূতির মাতা শাশুড়ী প্রভৃতি অভিভাবকেরাই অধিকাংশ যত্ন করিয়া থাকেন। প্রসূতি নিজে যাহা করে, তাহা গুরুজনের উপদেশমতে করিয়া থাকে; সুতরাং সমস্ত কার্য্য অতি সুচারু-রূপে নির্ব্বাহিত হয়। বিলাতী সংসারে প্রসূতি একাকিনী; নবজাত সন্তানের রক্ষণ-পালন তাহাকে একাকিনী করিতে হয়। তাহার অন্যান্য নাবালক সন্তানের যত্নও তাহাকেই করিতে হয়। বিলাতে সকলেই ধনী নহে, দাস-দাসী সকলেই রাখিতে পারে না। এমত অবস্থায় বিলাতের নব প্রসূতি এবং তাহার সন্তানেরা বহু কষ্ট পাইয়া থাকে; হিন্দু সমাজে নবপ্রসূতি কিংবা তাহার সন্তানগণ তাদৃশ কষ্ট পায় না।

হিন্দুসমাজে নবযুবকের যখন সন্তান হয় তখন সেই সন্তানের জন্য পিতার যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা পিতামহ প্রভৃতি অভিভাবকগণ দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। সেই অল্পবয়স্ক জনকের নিজ সন্তানের জন্য 'কিছুই করিতে হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপীয়েরা হিন্দু যৌথ-পরিবার ও বাল্য-বিবাহ-সম্বন্ধে যে কিছু দোষারোপ করেন তাহা সমস্তই ভ্রমপূর্ণ, একটীও প্রকৃত নহে। হিন্দু যৌথ-পরিবারের গঠন এবং বিবাহাদি কার্য্য-প্রণালী সমস্তই ইয়োরোপীয় প্রথা হইতে উৎকৃষ্টতর। পাশ্চাত্যদিগের বৈষয়িক উন্নতি-দর্শনে যাহারা আর্য্যরীতি অপেক্ষা তাহাদের রীতি-নীতি শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং অদূরদর্শী

ষষ্ঠতঃ, শিক্ষার বিঘ্ন। ইয়ুরোপে বিবাহ হইবা মাত্র সেই দম্পতি অন্যান্য জন হইতে পৃথক থাকে; সুতরাং পত্নীর ভরণপোষণ এবং সংরক্ষণ জন্য স্বামী সম্পূর্ণ বিব্রত থাকে। স্বামী কোথাও যাইতে হইলে, পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কাজেই য়ুরোপে বিবাহের পর রীতিমত শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুসমাজে বালক-স্বামী বালিকা-পত্নীর অভিভাবক নহে, এইহেতু বালিকা-পত্নীর রক্ষণ বা ভরণপোষণ জন্য সেই বালক-স্বামীর কোনই চেষ্টা কিংবা চিন্তা করিতে হয় না। সুতরাং তাহার শিক্ষাকার্য্যের কোন বিঘ্ন হয় না। বরং অনেক সময়ে শ্বশুরের সাহায্যে পাঠের সুবিধা হয়; জামাতা উকীল মোক্তার ডাক্তার বা কবিরাজ হইলে শ্বশুরকুলের সাহায্যে পসার জমকানের সুবিধা হয়। জামাতা শিল্পী কিংবা বণিক হইলে ব্যবসায়ের মূলধন যোটাইতে শ্বশুরকুলের সাহায্য পাইতে পারে। সংক্ষেপতঃ বিবাহিত বালকের একজনের স্থলে দুইজন সহায় যুটে; সুতরাং বাল্যবিবাহে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ইহা স্বীকার্য্য বটে যে, কোন কোন কামুক বালক বিবাহ হইলেই মদনের চেলা হইয়া শিক্ষা-কার্য্যে ও বৈষয়িক কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া থাকে। তাদৃশ বালকের বিবাহ না হইলে তাহারা বেশ্যা কিংবা উপপত্নী-আসক্ত হইয়াও ঐরূপ অকর্ম্মণ্য হইতে পারে। অতএব বাল্যবিবাহ বালকদিগের লম্পট বা মাতাল হইবার কারণ নহে এবং শিক্ষাকার্য্যের অন্তরায় নহে।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।



রণপদক।

—:○:—

সূর্য্যোদয়ের একটু পরে কারাগৃহের দ্বারদেশে বৃদ্ধা দাঁড়াইয়াছিল। বার্দ্ধক্য-ভারে তাহার শরীর কিঞ্চিৎ আনমিত ও চর্ম্ম শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে। একখানি জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্রের গ্রন্থিবহুল অর্দ্ধাংশ দিয়া সে বহু কষ্টে তাহার শরীরটী ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বস্ত্রখানি সূক্ষ্ম হইলেও দীর্ঘকাল বর্ষাতপ ভোগ করিয়া উহা আপন সৌন্দর্য্যটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে। বস্ত্রখানি দেখিয়া বেশ বোঝা যায় যে, বৃদ্ধা সম্ভ্রান্তবংশীয়া।

বার্দ্ধক্য তাহার বিরল ও রুক্ষ কেশগুলিকে তুহীন-ধবল করিয়া তুলিয়াছে। কালের নির্ম্মম অঙ্গুলি-সম্পাতে বৃদ্ধার মাংসল মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও তাহার বিশ্রামের একটু অবসর নাই। দুর্ব্বল চরণের ব্যথা সহিয়া তাহাকে হাঁটাহাঁটি ও পরিশ্রম করিতে হয়। বৃদ্ধা মহেশ্বরীর একটু মালা জপিবার কিংবা ক্লান্ত দেহকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার সময় নাই; কারণ তাহাকে অনেক-গুলির মুখে অন্ন যোগাইতে হয়।

তাহার পোষ্যবর্গের মধ্যে একটী আজ হাস্যোজ্জ্বলমুখে ঠাকুরমার হাত ধরিয়া কারাগৃহের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। বালিকা মহেশ্বরীর মুখের দিকে ছোট চোখ দুটি তুলিয়া বলিল,—

"দেখ ঠাকু'মা, বাবা আজ আস্‌বে দেখে সূর্য্যি কেমন হাস্‌ছে।"

বৃদ্ধা ধীরে উত্তর করিল, "হাঁ দাদু"। এক গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত মহেশ্বরীর মুখ দিয়া বাহির হইল, "হায় অনেক দিন আগে বাছার হৃদয়খানি এইরূপ নির্ম্মল সূর্য্য-করে হেসে উঠেছিল।"

"ঠাকু' মা, বাবা আর কতক্ষণ জেলের ভিতরে থাক্‌বে।"

"না দাদু এই এল বলে।"

"ঠাকু'মা, ঈশ্বর কি আমাকে এই কালো জেলের মধ্যে বেঁধে রাখ্‌বে?"

"বালাই, ছি দাদু তা কেন হ'বে!"

মহেশ্বরী নিজ পৌত্রীর বাচালতা একটু চাপিয়া দিল ও তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিল।

চৌর্য্যাপরাধে দীননাথের প্রতি দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দীননাথের পতিব্রতা পত্নী যশোদা স্বামি-বিদায়ক্ষণ হইতে রুগ্ন-শয্যায় দুর্ব্বল হৃদয়ে শায়িতা; মহেশ্বরীর উপর তিনটী ছোট ছেলেমেয়ের ও যশোদার ভার পড়িয়াছে।

দীননাথ যখন নিষ্ঠুর বিচারকের কঠোর দণ্ড মাথায় করিয়া কারাগৃহে যায়, তখন মহেশ্বরী বিচারালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার ভাবনা দীননাথ কিরূপে এ অপমান সহ্য করিয়া বাঁচিবে?

* * * * * *

যখন সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল বহ্নি কানপুরে শ্বেতাঙ্গ-শিশুদিগকে গ্রাস

করিতেছিল, তখন দীননাথের পিতা বিশ্বেশ্বর অসীম সাহসের সহিত কতিপয় রণোন্মত্ত সিপাহীর হস্ত হইতে অনেকগুলি শ্বেত শিশু ও রমণীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সে যুদ্ধে বিশ্বেশ্বর একটী হস্ত ও পদ হারাইয়াছিল। কিছুদিন পরে সাহসের পুরস্কারস্বরূপ বিশ্বেশ্বর একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইল ও দয়ালু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বেশ্বরের অবশিষ্ট অঙ্গগুলিকে অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বিশ্বেশ্বরের দুর্ব্বল অঙ্গগুলি যখন অগ্নিময় রথে চড়িয়া বাল্যবন্ধুগণের সঙ্গলাভ করিল, তখন সরকারী বৃত্তির কিছু অংশও বিধবার অধিকারচ্যুত হইল না।

বৃদ্ধার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রই তাহার একমাত্র ভরসাস্থল ও আশার আলোক। অপরগুলি অকালে গতাসু হইয়াছিল। দীননাথ পঁয়ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিলেও মহেশ্বরী তাহাকে খোকা বলিয়া ডাকিত।

যথাসময়ে দীননাথের বিবাহ হইল। বৃদ্ধা স্নেহময়ী মাতা পুত্র ও পুত্রবধূর মায়া কাটাইয়া কাশীবাসের ইচ্ছা করিয়া কাশী যাত্রা করিল, কিন্তু সেখানে থাকিতে পারিল না। দীননাথের কুটীরে ফিরিয়া আসিল। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে তাহার জন্য তাহার খোকার যেন কিছুমাত্র দুঃখ না হয়।

কিছুদিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। ক্ষুদ্র কুটীরে শান্তির প্রস্রবণ বহিল। দুরদৃষ্টক্রমে দীননাথ অসৎ সংসর্গে পড়িল, অবশেষে মিথ্যা প্রতারণার অভিযোগে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইল। বিপক্ষের ব্যারিষ্টার তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কৌশল প্রয়োগ করিল যে বিচারক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন। বিচারকের সহানুভূতিপূর্ণ মুখমণ্ডল ও সজল চক্ষু দুটী দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, তিনি দীননাথের বিরুদ্ধে এরূপ কঠোর দণ্ডের আদেশ করিবেন।

মহেশ্বরী একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া বিচারালয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যখন শুনিল যে, তাহার স্নেহের খোকা দুই বৎসর তাহাদের মায়া কাটাইয়া লোহার বেড়ী পায়ে পরিয়া কারাগারে থাকিবে, তখন তাহার চক্ষু দুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, দীনবন্ধু বিদায়কালে মলিনমুখে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, “মা আমি চল্‌লাম। অভাগিনী ও তাহার ছেলে তিনটী তোমার কাছে রইল।”

বৃদ্ধার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বক্ষের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে মহেশ্বরীর চোখে মুখে একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষিত হইল, বৃদ্ধা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভয় কি বাবা, ভগবান আমাদের মঙ্গল করবেন। আমি যতদিন থাকব, ততদিন এ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হাত দু'টী তাদের জন্য বিশ্রাম পা'বে না।"

দেখিতে দেখিতে দীননাথ জননীর দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িল। বৃদ্ধা একটী বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভগ্ন কুটীরে রুগ্না নিঃসহায় পুত্রবধূ ও ছোট ছেলেদের মুখের অন্নসংস্থান করিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

শরীর জীর্ণ, তবুও তাহাকে আজ কায়ক্লেশে পৌত্র-পৌত্রী ও পুত্রবধূর মুখের গ্রাসের আয়োজন করিতে হয়।

স্বামীর জীবদ্দশায় মহেশ্বরী শারীরিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া সমূহ গৃহকর্ম্ম একাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। যৌবনের অভ্যাস আজ বার্দ্ধক্যে তাহার অনুকূল হইয়া উঠিল, দীননাথের পত্নী যশোদা বড়ই দুর্ব্বল ও রুগ্না। স্বামি-বিচ্ছেদের বহুপূর্ব্ব হইতেই সে এইরূপ দুর্ব্বল। দীননাথের কারাবাসের দিন হইতে যশোদা শয্যাশায়িনী।

সে পরিক্লান্ত শিশুর ন্যায় বেদনাক্ষুব্ধ বুকে নিশ্চেষ্টভাবে শয্যার উপর পড়িয়া ছিল।

যশোদা মহীরুহকোলে লতার ন্যায় দীননাথকে আশ্রয় করিয়াছিল। সেও আপনার কোমল বাহুর নিবিড় বেষ্টনে কোমল ও স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের স্পর্শ-প্রদানে পত্নীকে জীবন্ত রাখিয়াছিল। স্বামীর অপ্রত্যাশিত বিরহে ও অপমানে সতী আজ কুসুমের ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

তাই আজ বৃদ্ধা মহেশ্বরী ক্ষুদ্র পরিবারের এক মাত্র ভরসাস্থল, সে আজ পুত্র-বধূর স্থান অধিকার করিয়াছে। সে সাধ্যমত রুগ্ন পুত্রবধূর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে ও গভীর স্নেহে দীননাথের পুত্র-কন্যাগুলির মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে।

স্বামীর নামে প্রদত্ত সামান্য বৃত্তিতেও যখন তাহাদের অভাব মোচন হইল না, তখন বৃদ্ধা অন্য উপায় দেখিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল, তাহার প্রয়াস

ব্যর্থ হইল। অবশেষে উপায় স্থির করিল যে, নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে কিছু ফল তরকারি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তাহা পাড়ার মধ্যে বিক্রয় করিবে, মহেশ্বরী স্বামি-বর্ত্তমানে কখনও বাটীর বাহির হয় নাই, কিন্তু আজ উপায়হীন, তাই সকল মান-অভিমানকে জলাঞ্জলি দিতে হইল! এইরূপে তাহাদের দিন চলিতে লাগিল।

শীতের প্রচণ্ড প্রভাতে ও নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নেও তাহাকে বাজারে দেখা যাইত; বর্ষার উপদ্রব অগ্রাহ্য করিয়াও সে দীননাথের পত্নী-পুত্রদের অন্ন-সংস্থানের জন্য বোঝা মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিত।

ক্রমে সকল দিক রক্ষা করা মহেশ্বরীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যশোদাকে রোগমুক্ত করিতে হইলে অনেক টাকার ঔষধপথ্য চাই। এদিকে ছেলে-মেয়েদের মহেশ্বরী ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া রাখিতে পারিত না। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ দুই বৎসর অতীত হইল। ছেলে-মেয়েগুলি একটু বাড়িয়া উঠিল; কিন্তু শাশুড়ীর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যশোদার স্বাস্থ্য অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। মহেশ্বরী ভাবিল, "দীননাথ ব্যথিতহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন মাতৃহীন শিশু-সন্তানদের বিশুষ্ক মুখগুলি দেখিবে তখন কিরূপে জীবন ধরিবে!"

স্বামীর কারামোচনের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, প্রাণপ্রিয় পতির দর্শনবাসনা তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিয়া তুলিল।

আশ্বস্তকণ্ঠে যশোদা বলিল, "মা আমার যাওয়ার পূর্ব্বে কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব? কি সুখের মরণ হ'বে যদি তাঁকে দেখে যেতে পাই।"

অবশেষে দীননাথের মুক্তির দিন আসিল। ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে রুগ্না যশোদা শায়িতা। তাহার শীর্ণ হাত দুটী যুক্ত, ক্ষয়রোগের একটা বিকট ছবি তাহার চক্ষু দুইটীতে পরিস্ফুট। প্রাণপ্রিয়ের প্রথম চরণক্ষেপশব্দ শুনিবার জন্য তাহার শ্রবণযুগল উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

ঠাকুরমার মুখে বাবার আসিবার কথা শুনিয়া ছোট ছেলেমেয়েগুলি বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহারা পিতার সহিত পরিচিত নয়, দীননাথ যখন জেলে যায় তখন তাহারা খুব ছোট, কিছুই বুঝিত না। আজ তাহাদের অপরিচিত পিতার আগমন-প্রতীক্ষায় হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত অতি কষ্টে চঞ্চলতা দমন করিয়া রাখিয়াছিল।

*   *   *   *   *

আজ জেলের ফটকের নিকট মহেশ্বরী মাতুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে রুক্ষকেশ ও বিশীর্ণকান্তি দীননাথকে কারাগৃহের রাস্তার মধ্যে দেখা গেল।

বাহিরে সূর্য্য অবিশ্রান্ত উজ্জ্বল কিরণ ঢালিতেছিল, কারাগৃহের পার্শ্বের পথ বহিয়া দুই একটী পথিক চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটী যখন মাতৃভক্ত সন্তানের অশ্রুসিক্ত নয়নের সহিত মিলিয়া গেল, তখন ক্ষণিকের জন্য যেন বহিঃপ্রকৃতির অস্তিত্ব লোপ পাইল।

দীননাথ মাতৃচরণে প্রণত হইলে মহেশ্বরী "বাবা, বাবা" বলিয়া আকুল আবেগে দুর্ব্বল হাত দুটী দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, বৃদ্ধার উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত স্নেহাশ্রুস্রোতে তাহার বিশীর্ণ বিশুষ্ক কপোল প্লাবিত হইয়া উঠিল।

মায়ের চরণ স্পর্শ করিতে আজ দীননাথের হাত কাঁপিয়া উঠিল। সে আজ কলঙ্কিত, তাহার অপবিত্র করস্পর্শে পুণ্যশীলা জননীর পবিত্র চরণযুগল স্পর্শ করিতে তাহার আশঙ্কা হইতেছিল। তারপর একটু সলজ্জভাবে দীননাথ মাতুর দিকে চাহিল। সে ভাবিতেছিল, বোধ হয় বালিকা তাহার নিকটে আসিবে না। মাতু পিতার হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দীননাথের স্নেহ হৃদয়কূল প্লাবিত করিয়া উছলিয়া উঠিল। বিপুল স্নেহে বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া অবিরল চুম্বনে বালিকার কপোল রক্তবর্ণ করিয়া দিল। দীননাথ কন্যাকে ক্রোড় হইতে নামাইল। মাতু হাসিতে হাসিতে পিতার কাপড় ধরিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

"বাবা"

"কি মা"

"মা বাড়ীতে তোমার জন্য চেয়ে আছে, তুমি আজ আসবে শুনে তার চোখে ঘুম নাই।"

দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মা—সে কেমন আছে ?" যাহা বলিবার মহেশ্বরী ধীরে ধীরে বলিয়া শেষ করিল, তাহাকে প্রতারণা করিয়া কি লাভ! যশোদা আজ মৃত্যুশয্যায়।

"বাবা সে শুধু তোমার মুখ চেয়ে বেঁচে রয়েছে।" দীননাথ উপর্য্যুপরি মাকে অনেক প্রশ্ন করিল। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ দুই বৎসরের বিষাদপূর্ণ ঘটনাগুলি

তাহার কর্ণগোচর হইল। কারাগৃহে পাপের প্রায়শ্চিত্তকালে তাহার আশ্রয়হীন সন্তানগুলির ভীষণ দুঃখকষ্ট ও একমাত্র বৃদ্ধা জননীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ভাবিয়া ক্ষোভে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

তাহারা একটু বেগে হাঁটিতে লাগিল। মহেশ্বরী পুত্রের হাত ধরিয়াছিল, ও আর একটী হাত মাতুর হাতের সহিত আবদ্ধ ছিল।

সে আরও বেগে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুশয্যায় শয়ানা, প্রেমময়ী পত্নীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে ভাদ্রের ভরা নদীর মত বলবতী। কারা-গৃহের অন্ধকারময় কক্ষে অলস ও ক্লান্ত সময়ের মধ্যে প্রতি রজনী যে মধুর স্বপ্নময় দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, আজ তাহা সম্মুখে। তাহার সুখ—আজ বহুদিন পরে সে তাহার দুঃখিনী পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইবে; তাহার ভাবনা—হয়ত তাহার দৃঢ় বাহুবেষ্টনীর মধ্যে তাহার ক্ষীণ জীবন প্রদীপটুকু নিভিয়া যাইবে। দীননাথ ভাবিতেছিল, সে কিছুতেই মরিবে না। ইহা কেবল স্বামীর প্রতি পত্নীর স্বাভাবিক অভিমান। তাহার মুখ দেখিয়া তাহার এ অভিমান টিকিবে না। দীননাথের হৃদয়ে এইরূপ কত আশা ও আতঙ্ক জাগিতেছিল।

সহরের মধ্যস্থিত একটি তৃণপূর্ণ মাঠের ধার দিয়া তাহারা যাইতেছিল। গাছে একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল। কি জানি কেন সে গানে দীননাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ কুটীরে রুগ্না, মলিনা যশোদার বিষণ্ন মুখচ্ছবি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ যেন দূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সে কন্যা ও জননীকে পশ্চাতে ফেলিয়া দৌড়িল।

দীননাথের স্বভাব উত্তেজিত হইলে বা গভীর চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইলে সে না দৌড়িয়া স্থির থাকিতে পারে না। সে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে পশ্চাতে অনেকগুলি লোক "চোর পাক্‌ড়ো" বলিয়া তাড়া করিল। জনতার মধ্যে একটি কনেষ্টবল ছিল। সেও দীননাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল এবং তাহাকে থামাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

অনতিকাল পূর্ব্বে কারামুক্তির কথা মনে করিয়া হউক বা কনেষ্টবলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া হউক, সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কনেষ্টবল দৃঢ়রূপে তাহার হাত ধরিল। মহেশ্বরী ও মাতু তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। দীননাথের হাত মোচড়াইয়া ধরিয়া একটি ধাক্কা দিয়া

তাহার পকেট হইতে একটি টাকার থলি টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর সকলই প্রকাশ পাইল।

জনতা তাহাদের চতুর্দ্দিকে বিস্মিতনেত্রে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের মধ্যে একটি রোষ-দীপ্ত যুবক দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছিল।

দীননাথকে কায়দা করিয়া ধরিয়া কনেষ্টবল বলিল, "এই ব্যাগ আপনার মহাশয়?"

যুবক উত্তর দিল "হাঁ, কিন্তু এ লোকটা চুরি করে নাই।"

"মহাশয়, আপনি লোক চেনেন না। ওরই কাজ। ওর সঙ্গীরা ওর হাতে দিয়ে সরে পড়েছে। গাঁটকাটারা প্রায় এরূপ ক'রে থাকে।" এই বলিয়া সে আরও কঠোরভাবে দীননাথের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

মৃত ব্যক্তির ন্যায় দীননাথের মুখ শুকাইয়া গেল। সে মূকের ন্যায় স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে জনতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। মাতু ঠাকুরমার আঁচল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিল "ঠাকুরমা, বাবার আবার কি হ'ল?"

দীননাথের ম্রিয়মানা পত্নী এদিকে ভগ্নকুটীরে রোগক্লিষ্ট হৃদয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামীর আশা-পথ চাহিয়া আছে।

দীননাথ ভাবিল, হায় কত দুঃখ সহিয়া এখনও যশোদা তাহার জন্য প্রাণ ধরিয়া আছে। যদি আজও তাহার সাক্ষাৎ না পায় তবে সে কি আর বাঁচিবে? এই চিন্তায় সে পাগল হইয়া উঠিল। আজ দীর্ঘ দুই বর্ষের পর সে তাহার হৃদয়-রাণী অভাগিনীর রোগক্লিষ্ট মুখের শেষ হাসিটুকু দেখিবার জন্য দৌড়িয়াছিল। হঠাৎ এক নূতন, অচিন্তিত বিপদ তাহাকে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে টানিয়া লইয়া গেল।

এই চিন্তা দীননাথের দেহে সিংহবল আনিয়া দিল। প্রাণান্ত-চেষ্টায় কনেষ্টবলের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে পুলিশের কঠোর হস্তের ভীষণ স্পর্শন গলদেশে অনুভব করিল, উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল।

দীননাথ অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী, আজ উন্মত্তের ন্যায় অবিরল বজ্রমুষ্টি-প্রহারে আক্রমণকারীর মুখখাগুল রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

তখনও পুলিশ তাহাকে ছাড়ে নাই। চারিদিক হইতে সাহায্য আসিল। ক্লান্ত দীননাথ নিশ্চেষ্ট হইল। তাহার মুখ দিয়া অনবরত ফেনা নির্গত হইতেছিল। ক্রোধে ও হতাশে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে তাহার স্কন্ধদেশে ভীষণ বজ্রমুষ্টি প্রয়োগ করিল। তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। জনতা ভেদ করিয়া দীননাথকে থানার দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

বৃদ্ধা মহেশ্বরী কম্পিত বক্ষে অশ্রুসিক্ত নেত্রে ও শোক-শিথিল হস্তে মাতুর হাত ধরিয়া অভাবিত বিপদের করুণ কাহিনী মরণোন্মুখ যশোদাকে বলিবার জন্য গৃহের দিকে চলিল। যশোদা স্বামীর আশায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। মহেশ্বরী যখন মাতুর হাত ধরিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার অধরপ্রান্ত সংলগ্ন আনন্দের পূর্ণ পাত্রটি মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

* * * * *

যথাসময়ে দীননাথ যুবকের টাকা চুরি ও পুলিশকে প্রহার করার অপরাধে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইল।

স্বামীর অদর্শনে যশোদা মৃতপ্রায়া। কেবল শাশুড়ীর আশ্বাসে তাহার ক্ষীণ প্রাণ এখনও বাহির হয় নাই। মহেশ্বরী যশোদাকে প্রবোধ দিতেছে, খোকা দু এক দিনের মধ্যেই আসিবে।

দীননাথ যে কনেষ্টবলকে প্রহার করিবার অপরাধে ধৃত হইয়াছে—মহেশ্বরী যশোদার নিকট তাহা প্রকাশ করে নাই। কারণ সে মনে করিয়াছিল এ সংবাদ যশোদা সহ্য করিতে পারিবে না। মাতুও ঠাকুরমার ভয়ে তাহা মায়ের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই।

মহেশ্বরী কারা-কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিল। তাহার মুক্তির জন্য একবার এ বৃদ্ধবয়সে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। কিন্তু এত প্রচুর অর্থ সে কোথায় পাইবে! বৃদ্ধার যা কিছু ছিল সবই বিক্রয় করিল। তবুও যথেষ্ট অর্থ লাভ হইল না। ভিক্ষা আরম্ভ করিল। অপমান-লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই লাভ হইল না। আর একটি জিনিষ ছিল,—তার কথা ভাবিতে বৃদ্ধা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। স্বামিলব্ধ স্বর্ণপদকটি তাহার শেষ আশা। স্বামী মৃত্যু-শয্যায় অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া

গিয়াছিল, "মহেশ্বরী আমার শেষ নিদর্শন তোমায় দিয়ে গেলুম। আমি এর জন্য আমার হাত পা হারিয়েছি। তুমি কি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এটি কাছে রেখে আমার স্মরণ করবে না।"

ম্রিয়মান পতির রোগ-দুর্ব্বল হস্ত বহু আশায় যাহা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে, আজ সে কিরূপে তাহার প্রেমে, স্নেহে ও আদরে জলাঞ্জলি দিয়া উহাকে অধিকার-চ্যুত করিবে? কি করিবে, একদিকে স্বামী-ভক্তি অন্য দিতে পুত্র-স্নেহ। বহু চিন্তার পর মহেশ্বরী পদকটি বাঁধা দিয়া অবশিষ্ট অর্থ স গ্রহ করিল।

* * * * *

বিচারের দিন মহেশ্বরী মলিন বস্ত্রে বিচারালয়ের এক পার্শ্বে মাতুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বিশ্বাস তাহার উকিল আজ দীননাথকে নিশ্চয় খালাস করিবে।

যথাসময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ দীননাথ আনীত হইল। বিচার আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে দীননাথের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদত্ত হইল। অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি! তাহার পক্ষে কেহ একটীও কথা বলিল না। ঘটনার পর ঘটনা তাহার বিরুদ্ধে গ্রথিত হইতে লাগিল।

বাদী পক্ষের উকীল বক্তৃতা আরম্ভ করিল, "বন্দী অল্পক্ষণ মাত্র কারামুক্ত হইয়া একটী টাকার ছোট ব্যাগ চুরি করিয়া দৌড়িতেছিল। পথে জনৈক কনেষ্টবল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী তাহাকে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়াছে।

এই অভিযোগ-শ্রবণের পর দীননাথ গৃহকোণস্থিত জননীর প্রতি করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধার অশ্রুস্রোত অমনি বর্ষার প্রবল-প্রবাহের ন্যায় কূল প্লাবিয়া ছুটিল।

বিচারপতির চঞ্চল দৃষ্টি হঠাৎ মহেশ্বরীর উপর পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে?"

আসামী পক্ষের উকীল বলিলেন, "আসামীর মাতা, আমার প্রার্থনা, হুজুর এই সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া দুঃখিনী রমণীর দুএকটি কথা শুনেন।"

বিচারপতি সম্মতি জানাইলেন। শুভ্রকেশা মহেশ্বরী জলভরা চোখে দুঃখ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। মহেশ্বরী করুণ ও অশ্রুরুদ্ধ ক্রন্দন-কম্পিতকণ্ঠে দীননাথের কারাদণ্ডের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তিলাভের

পর মৃতপ্রায় পত্নীর সহিত শেষ সাক্ষাতের তীব্র বাসনায় দৌড়িবার ও পথে মিথ্যা সন্দেহে ধৃত হওয়ার কথা বিচারপতির নিকট ব্যক্ত করিল। সে আরও বলিল, একমাত্র পত্নীর জীবন তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। এ জীবনে হয়ত আর তাহার সহিত দেখা হইবে না, এই চিন্তায় দীননাথ অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে ও কনেষ্টবলের হাত হইতে মুক্তির আশায় তাহাকে দুই একবার প্রহার করিয়াছিল।

মহেশ্বরী পুত্রের দুঃখের কাহিনী এরূপ করুণভাবে বিবৃত করিল যে, কেহ তাহাকে বাধা দিল না। বিচারপতি আগ্রহের সহিত তাহার কথা শুনিতে-ছিলেন ও মাঝে মাঝে দীননাথের দিকে চাহিতেছিলেন। প্রত্যেকবার পত্নীর নাম-শ্রবণে তাহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছিল; ও তাহার মলিন গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া চোখের জল ছুটিতেছিল।

বিচারপতির হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি রায় দিলেন, "তোমার মাতার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা বিশ্বাসযোগ্য। টাকার থলে তোমাদ্বারা অপহৃত হয় নাই। তোমার পকেটে কেহ উহা রাখিয়া দিয়াছিল। অতএব তুমি নির্দ্দোষ তাহা বেশ বোঝা যায়, তোমার দ্বিতীয় অপরাধ কনেষ্টবলকে প্রহার করা, তবে তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছিলে তাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরে আবশ্যক হইলে তোমায় উপস্থিত হইতে হইবে এই সর্ত্তে তোমার মুক্তি প্রদান করিলাম।"

মাতা-পুত্রে বিচারালয় হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিল। আর কি সে তাহার জীবন-সঙ্গিনীকে দেখিতে পাইবে। আর কি তাহার স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ তাহার কারাক্লান্ত শরীরকে শীতল করিতে পাইবে? হয়ত এতক্ষণে কুটীরে ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিভিয়া গিয়াছে।

* * * * *

সন্ধ্যার অন্ধকারে যশোদা স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এইবার সুখে মরতে পারব।"

রজনীর গাঢ় তিমিরে স্বামীর বক্ষে যশোদার ক্ষীণ জীবন-দীপ নিভিয়া গেল। প্রভাতের সূর্য্যকিরণ গৃহের মধ্য দিয়া আসিয়া যশোদার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। সতী আজ স্বামীর বক্ষের উপর স্রস্তচিকুর মস্তকটি রাখিয়া চির

নিদ্রার শায়িতা। তাহার মৃত্যু-মলিন অধর এক অতি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-মধুর হাস্যে যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার রুগ্ন করযুগল স্বামীর গলদেশে রক্ষিত, ও হৃদয়-স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ।

মহেশ্বরী আজ একটা শ্বেত কম্বলের আসন পাতিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছে। তাহাকে আর কোন কাজ করিতে হয় না। দীননাথ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। বিচারালয়ে যাহারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়াছিল, তাহারা দীননাথকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিল।

আজ ক্ষুদ্র কুটীরে বৃদ্ধা মহেশ্বরী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সেই দীননাথের সহিত পতিব্রতার শেষ সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছে; সে-ই স্বামীর শেষ স্নেহচিহ্ন স্বর্ণপদকটী বাঁধা দিয়া দীননাথকে মুক্ত করিয়াছে। সে অতি বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল অঙ্গগুলি খাটাইয়া তাহার পুত্রকন্যাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

স্বর্ণপদকটী আজ আবার মহেশ্বরী হাতে পাইয়াছে। আজ যে ইহা শুধু তাহার বিজয়ী স্বামীর অদ্ভুত কার্য্যের পরিচয় দিতেছে তাহা নহে, আজ স্নেহ-বৎসল পুত্রকে কারামুক্ত করিয়া স্নেহলীলা জননীর অগাধ স্নেহ ও ত্যাগের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ইহা অধিকতর উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

অযোধ্যার শেষ নবাব।*

আত্ম-বিগ্রহে যখন মোগল সাম্রাজ্য ক্ষীণ-শক্তি হইয়া উঠে, তখন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে নব-রাজ্যের গঠন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়। এই সময় দিল্লী-দরবারের বহু সম্রান্ত আমীর অবসর বুঝিয়া বহু রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। এইরূপে খোরাসনের চতুর বণিক, অযোধ্যার কুটীল সুবাদার সদৎ আলি খাঁ অযোধ্যার এক নব-রাজ্যের পত্তন করেন। সে রাজ্যের অধীশ্বরবৃন্দ সুশাসনের গৌরব করিতে পারুন আর নাই পারুন, বিলাসিতার-স্রোতে

*Journal of the Moslem Institute হইতে সংকলিত।

শিথিল অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অযোধ্যার কেন্দ্র-স্বরূপ লক্ষ্ণৌ সহরটীকে এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ওয়াজেদ আলি শাহ্ এই বিলাস-পরায়ণ রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি। তিনি রাজ্য-শাসনে কৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, এবং পরিণামে সে অক্ষমতার সমুচিত দণ্ডও পাইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার চরিত্র নিন্দনীয় ছিল না। যাঁহারা তাহার স্বভাব ও চরিত্র উত্তমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে তিনি কখনই অত্যাচারী ছিলেন না।

ওয়াজেদ আলি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে লক্ষ্ণৌ ভারতের মধ্যে প্রধান বিলাস-কেন্দ্র বলিয়া পরিচয় লাভ করে। তথাকার জনবৃন্দও বহির্জগতের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া রাজার অনুকরণে এক বিলাস-স্রোতেই আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। তখন গৃহে গৃহে বিলাসিতা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল। নৃত্য-গীতের আলোচনায় সহর মুখরিত হইত; পোষাকের আড়ম্বরে ও আদব-কায়দার বাহুল্যে কৃত্রিম সভ্যতার এক অদ্ভুত মূর্ত্তি-প্রকট হইত।

ওয়াজেদ আলি কেবল যে এক সংগীত-বিদ্যায় নব-জীবন আনিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার উৎসাহে অনেক নব-শিল্পের উদ্ভব হয়, স্থপতি-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে এবং বেশ-ভূষার পারিপাট্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ওয়াজেদ আলি পণ্ডিতদিগকে সবিশেষ সমাদর করিতেন; তাঁহার যত্নে লক্ষ্ণৌ বিদ্যা-কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দিগ্‌দেশ হইতে পণ্ডিত ও ছাত্রবৃন্দ তথায় সমাগত হইয়া বিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। উর্দ্দু ভাষার প্রথম নাট্যগ্রন্থের জন্য ভারতবর্ষ ওয়াজেদ আলির নিকট ঋণী।

বন্দী অবস্থাতেও ওয়াজেদ আলির বিলাস-বাসনা ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সিংহাসন হারাইয়া তাঁহাকে কিছুকাল কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বন্দী থাকিতে হয়। (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) এই কয় দিন তাঁহার কষ্টের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তিনি যখনই কলিকাতার সন্নিকটে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মেটিয়াবুরুজে কতকটা স্বাধীনভাবে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন, তখনই তিনি আবার বিলাস-স্রোতে ভাসিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া উঠিলেন। মেটিয়া-বুরুজকে দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌএ পরিণত করাই যেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া

উঠিল। তিনি অযোধ্যা হইতে যে সকল রত্নরাজি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের বিনিময়ে তিনি অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি প্রতি বৎসর ইংরেজ রাজের নিকট বার লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। এই অর্থে তিনি মেটিয়াবুরুজের অনেকটা স্থান ক্রয় করিয়া তদুপরি সুদৃশ্য উদ্যান, বিশাল পশু-পক্ষীশালা ও সুরম্য অট্টালিকাসকল নির্ম্মাণ করাইয়া মেটিয়া-বুরুজের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই সকল অট্টালিকা-নির্ম্মাণকালে নবাব বাহাদুর কোন ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজে গৃহাদির নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঐ সব অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মেটিয়াবুরুজে নবাব বাহাদুর যে সকল উদ্যান, পশু-পক্ষীশালা ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনি সেগুলির দুই সীমার দুইটি নাম রাখিয়াছিলেন। একটির নাম সদ্-দে-সুলতানী, অপরটির নাম হদ্-দে-সুলতানী। আধুনিক ইডেন গার্ডেন এই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। এই উদ্যান নবাব বাহাদুরের সুরুচির ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে।

নবাব বাহাদুরের বিশেষ চেষ্টায় কয়েক বর্ষ মধ্যেই (১৮৬৫—৬৬খৃঃ) মেটিয়াবুরুজ ক্ষুদ্রাশয়ে দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌ হইয়া উঠে। কলিকাতার জনবৃন্দ নবাবের এই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেও, নবাব বাহাদুর কিন্তু কাহাকেও তাঁহার 'ক্ষুদ্র রাজত্বের' সীমা অতিক্রম করিতে দিতেন না। তিনি সারাদিন এই রাজত্বটুকু লইয়া আপনাকে ব্যস্ত রাখিতেন। কখনও কৃত্রিম উৎসের সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিয়া, কখনও ফুলের কেয়ারি রচনা করিয়া, কখনও পশু-পক্ষীশালার মূক জীবদিগের সহিত খেলা করিয়া, কখন বা কোন সভাসদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া তিনি আপনার দিনগুলি আনন্দে কাটাইয়া দিতেন।

সর্ব্বদাই তিনি এই 'নন্দন-কাননে' উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া কোন সভাসদ্ বা আমীর সাহস করিয়া বাহিরের লোককে তন্মধ্যে লইয়া যাইতেন না। যে দুই একজন এইরূপ দুঃসাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই নবাব বাহাদুরের বিরাজভাজন হইতে হয়। শেষে নবাব বাহাদুর যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ-সন্দর্শনের জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব, তখন হইতে তিনি প্রতি বৎসর দুই তিন দিন সাধারণকে এই কাননে প্রবেশ-অধিকার

দিয়া তৃপ্ত করিতেন। বৎসরের ঐ কয়দিন নানা লোকের সমাগমে কানন আর এক বিচিত্র শোভায় শোভিত হইয়া উঠিত।

নবাব বাহাদুর সব কাজ নিজে করিতে ভালবাসিতেন। উদ্যান-রচনার জন্য তিনি কাহারও পরামর্শ লইতেন না; তিনি যেমন ভাল বুঝিতেন, সেইরূপই উদ্যান সাজাইতেন। আবার পশু-পক্ষী-শালার জন্যও তিনি কোন সুদক্ষ পশু-পক্ষীতত্ত্ববিৎ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন নাই। তিনি নিজে উহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। সে সময়ে কলিকাতার অনেক ধনী-গৃহেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা ছিল; কিন্তু মেটিয়াবুরুজের চিড়িয়াখানাই সব চিড়িয়াখানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। পশু-পক্ষীদের যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, এজন্য নবাব বাহাদুর যেমন যত্ন লইতেন, তেমন যত্ন আর কেহ কোথাও লইত কিনা সন্দেহ। প্রতি জন্তুর জন্য তিনি একাধিক সেবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ওয়াজেদ আলির রাজসভা বিদগ্ধগুলীতে পূর্ণ থাকিত। ভারতের বিভিন্ন অংশের বিখ্যাত কবি, গায়ক, বাদক, লেখক, চিত্রকর, চিকিৎসক ও সিন্না মৌলবীগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া নানা সৎ আলোচনায় নবাব বাহাদুরের তৃপ্তি সাধন করিতেন। শুনা যায়, এই সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া কলিকাতার মুসলমান অধিবাসিবৃন্দের স্বভাব ও ভাষা অনেকটা মার্জ্জিত হইয়াছে।

কেবল বিদ্বানদের সেবা করিয়াই নবাব বাহাদুরের তৃপ্তি ছিল না; তিনি অবসরমত বাগ্‌দেবীর চরণেও পূজোপহার দিতে ভালবাসিতেন। উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। ঐ ভাষায় তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা-পদ্ধতি প্রাঞ্জল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল। তাঁহার কবিতাগুলি একত্র করিয়া তিনি স্বীয় মুদ্রাযন্ত্রে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার নাম—কুল্লিয়ৎ-ই-অখতর্। ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা-সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি মনোরম ও প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তৎ-কাল-প্রচলিত গীতবাদ্যের তিনি বহু সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ঠুংরী সুর তাঁহারই সৃষ্টি। কথাটা সত্য হউক আর নাই হউক, তিনি যে বহু সুরের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া ছিলেন, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। তাঁহার উৎসাহে মেটিয়াবুরুজে প্রতিদিনই কবির লড়াই হইত। ইহাতে উর্দ্দু ভাষার যে যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওয়াজেদ আলির রাজত্বের পূর্ব্বে উর্দ্দু ভাষায় নাট্য-গ্রন্থ ছিল না। তিনিই প্রথম এই অভাব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মনোরম বিষয় অনুসন্ধানে তাঁহার অনেক সময় গিয়াছিল। অবশেষে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের গল্প লইয়া উর্দ্দু কবি অমনৎকে দিয়া এক নাট্য-গ্রন্থের রচনা করান। গ্রন্থখানির নাম রাখা হইয়াছিল—'ইন্দ্রসভা'। 'ইন্দ্রসভা' উর্দ্দু সাহিত্যে এক যুগান্তরের সূচনা করিয়া দেয়। নাটক হিসাবে নিখুঁত না হইলেও রচনার গুণে ও গল্পের মনোহারিত্বে এই নাটকখানি এখনও উর্দ্দু সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং নানাস্থানে অভিনীত হইয়া শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। নাটকের গল্পাংশ মোটামুটি এইরূপ—

ইন্দ্র পরী ও দেবতাদের রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় অনেক সুন্দরী পরী ছিল। নৃত্য-গীতে ও নানারূপ ভাবভঙ্গীতে ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিসাধন করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। সবজপরী তাহাদের মধ্যে রূপে ও গুণে সকলের সেরা ছিল। যুবক গুলফমকে দেখিয়া সবজ পরী মন হারাইয়া ফেলে। তখন সে তাহার মনচোরাকে রথে তুলিয়া পরীস্থানে লইয়া যায়। অদৃষ্টের ভোগ—গুলফমের সৌভাগ্যে দেবতারা হিংসায় জ্বলিয়া গেল। তাহারা কথাটা ইন্দ্রের কাণে তুলিল ও নানা ছলে ইন্দ্রের মনটা ভারি করিয়া দিল। ফলে সবজপরী হৃতমান হইয়া পরীস্থান হইতে বিতাড়িত হইল এবং গুলফম এক কূপে বন্দী হইয়া রহিল। মনের দুঃখে সবজপরী বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া যায়। সবজপরীর সে রূপ, সে লাবণ্য দুঃখের চাপে সব চাপা পড়িয়া গেল। একদিন যখন সে যোগিনীর বেশে গান করিতেছিল, তখন ইন্দ্র হঠাৎ তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। ইন্দ্রের ফরমাসমত কতকগুলি গান শুনাইলে ইন্দ্র তাহাকে নানা বহুমূল্য পুরস্কার দিতে চাহিলেন। যোগিনী কিন্তু কোন মতেই পুরস্কার লইবে না, ইন্দ্রও ছাড়িবেন না। অবশেষে বিশেষ পীড়াপীড়িতে রাজি হইয়া যোগিনী বলিল, সে যাহা চাহিবে, ইন্দ্র যদি তাহাই দিতে রাজি থাকেন, তবে সে তাঁহার পুরস্কার লইবে। ইন্দ্র ত্রিসত্য করিলে সে পুরস্কারস্বরূপ গুলফমকে ফিরিয়া চাহিল। ইন্দ্র গুলফমের নাম শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। শেষে ক্ষণিক আলাপের পর ইন্দ্র যোগিনীর স্বরূপ পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রেমিক-যুগলের মিলন করাইয়া দিলেন।

গ্রন্থ রচিত হইলে ওয়াজেদ আলি তাহার অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বহু অর্থব্যয়ে লক্ষ্ণৌএর কৈসর বাগটিকে রঙ্গমঞ্চে পরিণত করা হইল। বাগানের একাংশ রাজসভার উপযোগী ভাবে সজ্জিত হইল, সেখানে ইন্দ্রদেব তাঁহার দরবার করিবেন। বাগানের আর এক অংশ বনে পরিণত করা হইল। সেখানে সবজ পরী মনের দুঃখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং

দুঃখের ও প্রেমের গান গাহিয়া নিজেকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিবে। কোন অংশ মনোরম পরীস্থানরূপে কল্পিত হইল। সেখানে পরীরা রূপের গর্ব্ব ছড়াইয়া মনের সুখে দেবতাদের চঞ্চল চিত্তকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিবে। এইরূপে বাগানটিকে নাটকের নানাদৃশ্যের উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছিল। তার পর, আমীরদিগের সহিত মিলিয়া নবাব বাহাদুর সেই বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রসভার অভিনয় করিতেন। তিনি নিজে গুলফমের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

বলা বাহুল্য, নাটকের উপাখ্যান-অংশ যাহাই হউক, নাটকখানিতে তাৎকালীন নবাব-দরবারের একটা নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উটিয়াছিল। ইন্দ্রের দরবার ওয়াজেদ আলিরই দরবার ; ইন্দ্রের কানন ওয়াজেদ আলিরই কৈশরবাগ ; ইন্দ্রের পরী ওয়াজেদ আলিরই নৃত্য-গীত-কুশলা ভামিনীবৃন্দ। ইন্দ্রের বিলাস-পরায়ণতায় ওয়াজেদ আলিরই চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং নাটকখানি কেবল যে উর্দ্দু ভাষার প্রথম নাটক, তাহা নহে, তাৎকালীন লক্ষ্ণৌ-সমাজের একটা সুন্দর চিত্রও বটে।

মেটিয়াবুরুজে অবস্থান-কালেও নবাব বাহাদুর মাঝে মাঝে এই সুন্দর নাটকখানির অভিনয় করিতেন। তবে লক্ষ্ণৌএ যেমন ভাবে ইহার অভিনয় হইত, এখানে স্থানের সংকীর্ণতার জন্য তেমন হইত বলিয়া মনে হয় না।

ওয়াজেদ আলির একটা অদ্ভুত গুণ ছিল। তিনি যেমন রসিক ছিলেন, তেমনি আবার লোক ও জন্তুর কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাদের সুন্দর সুন্দর নাম দিতে পারিতেন। তাঁহার প্রিয় জন্তুগুলির প্রত্যেকেরই একটা না একটা নাম ছিল; তাঁহার আমীরদেরও তিনি নিজের মনের মত নাম রাখিয়া ছিলেন।

ওয়াজেদ আলি বিলাসীর রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না, এমন কি তাম্রকূট পর্য্যন্ত সেবন করিতেন না। তাঁহার বহু স্ত্রী ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন ও তাঁহাকে অসংযত-চরিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অসংযত ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি সিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। সিয়া সম্প্রদায়ে মুটা-প্রথা বহু প্রচলিত ও শাস্ত্রসম্মত। এই প্রথা-অনুসারে পুরুষ বহু স্ত্রীর

পাণিগ্রহণের অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যাবাহুল্য দেখিয়া তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ওয়াজেদ আলির মন অতি সরল ও উদার ছিল। সিপাহি-বিদ্রহের সময় বহু লোক অযোধ্যা হইতে পলাইয়া অসিয়া মেটিয়াবুরুজে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব বাহাদুর তাহাদের অভাব-বিমোচনের জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেন। যাহারা কার্য্যক্ষম, তিনি তাহাদের উপযোগী কার্য্য দিয়া তাহাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিতেন। এইরূপে বহু শিল্পী তাহাদের অন্নের সংস্থান করিয়াছিল। যাহারা কোনরূপ কঠিন কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জনে অক্ষম, তিনি তাহাদেরও অন্ন-সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানের শুষ্ক পত্র কুড়াইয়া কত শত নারী ও শিশু আপনাদের জীবিকার উপায় করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার এরূপ উদার ও সদয়-চিত্ততার জন্য লক্ষ্ণৌএর বহু প্রজাই মেটিয়াবুরুজে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল। রাজ্যচ্যুত নবাব রাজ্য হারাইয়াও মেটিয়াবুরুজের সহস্র লোকের হৃদয়ে স্বাধীন নবাবরূপেই বিরাজ করিতেন।

কিঞ্চিদধিক ত্রিংশবর্ষ কাল কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থান করিলেও সাধারণ জনবৃন্দ তাঁহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। তিনি সকলের নিকট বিলাসের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কলিকাতার জন-সাধারণের সহিত একেবারেই মিশিতেন না, তাহাদের সুখ-দুঃখের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না বলিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। কত ইংরেজ, কত দেশীয় ভদ্র ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সমুৎসুক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কাহারও ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই। বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার উদ্যান ও প্রাসাদাবলীর বাহিরে যান নাই। মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার এইভাব কতকটা দূর হইয়াছিল। রমজন মাসের উপবাস-ক্লেশ দূর করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় বেড়াইতে যাইতেন। কিন্তু তাহাও বৎসর মধ্যে কেবল ঐ এক মাস মাত্র।

নবাব বাহাদুরের বহু স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে নবাব খাসমহল সাহেবা প্রধানা ছিলেন। তিনি সর্ব্বাংশে ওয়াজেদ আলির উপযুক্তা ছিলেন। ইংরেজ রাজ

যখন নবাবকে বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, তখন নবাব খাস মহল সাহেবা মুগার সহিত সে বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য নবাব বাহাদুরকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বৃত্তিগ্রহণে নবাবের সমূহ ক্ষতি হইবে। কিন্তু নবাব বাহাদুর তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, নবাবের ন্যায় নবাব-মহিষীও প্রখরা বুদ্ধিমতী, বিদূষী ও নৃত্য-গীতে নিপুণা ছিলেন। কবিত্ব-শক্তিতে তিনি স্বামী অপেক্ষাও ভাগ্যবতী ছিলেন। 'মসৌবী-ই-আলম্' নামে তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। সেখানি উর্দ্দু সাহিত্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের কতকগুলি এত সুন্দর ও মনোরম হইয়াছিল যে, এখনও কতশত লোক অবসরসময়ে সেইগুলি গান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, কত নৃত্য-গীত-ব্যবসায়ী সে সব গান গাহিয়া দেশের লোকের মনে এক স্বপ্ন-রাজ্যের আবেশ জন্মাইয়া দেয়।

নবাব বাহাদুর এই মনোরমা স্ত্রীর সাহায্যে যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, সাধারণে তাহার কোন সংবাদই জানে না। প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র লোক তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইত। তাঁহাদের যত্নে কত যে অন্নহীন শিল্পী এই অন্নহীনতার দিনে অন্নের সংস্থান করিয়া লইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের উৎসাহে উর্দ্দু সাহিত্য কিরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ সকলেই জানেন।

এইরূপভাবে জীবন-যাপন করিয়া শান্তস্বভাব ওয়াজেদ আলি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নরদেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করেন। কেবল বিলাস-সেবাই যে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। বিলাসের ভিতর দিয়া কি করিয়া লোকসেবা, ভাষার উন্নতি ও শিল্পের উৎকর্ষসাধন করা যায়, তাহা এই রাজ্যচ্যুত নরপতির বিচিত্র ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যুদূত।

(পারস্য গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

সেদিন তখন ফাল্গুন-প্রভাতে কিরণ-ছুরীর খেলা,
রাশি রাশি রাঙ্গা আবীর মাখিয়া রঙ্গীণ মেঘের মেলা,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুমের দলে জাগে মধুপের তান,
উৎসের মত উৎসারি উঠে শত বিহগের গান ;—
রাজার কাননে আলো, ফুলে, গানে প্রভাত হ'য়েছে রাতি,
বকুল, চামেলী, পারুলের দলে মলয় উঠেছে মাতি,
বন-বীথিকার তোরণে তোরণে দোলে কুসুমের হার,
ভ্রমে নরপতি সঙ্গের সাথী প্রিয় সভাসদ্ তাঁর।
সহসা কে আসে রাজার কাননে সাহসের নাহি তুলা,
চারিদিকে যত প্রহরীর চোখে কেমনে সে দিল ধূলা,
শিহরি উঠিল রাজ-সহচর কেন সে নাহিক জানে,
বিস্মিত অতি চাহে নরপতি অজানা অতিথি-পানে,
আধেক ঢেকেছে আনন তাহার অবগুণ্ঠন কালো,
কালো ছায়া তা'র ম্লান ক'রে দিল প্রভাতের যত আলো!
কম্পিত ঘন দুরু দুরু হিয়া চরণ নাহিক চলে,
নৃপতিরে চাহি রাজসহচর কাতরকণ্ঠে বলে,—
"শোন মহারাজ, করযোড় করি কহিতেছি তব আগে,
হৃদয়ের মাঝে নাহি জানি কেন অজানা শঙ্কা জাগে,
যাদু-বলে তব পাঠাও ত্বরিতে যোজন শতেক দূরে,
দূর সীমানার দুর্গ-মাঝারে দুর্গম গিরিচূড়ে ;
না পারি সহিতে নয়নের ওর নরক-অগ্নি-শিখা,
নাহি জানি মোর কি যে আছে হায়, আজিকে ললাটে লিখা।"
পলক ফেলিতে যাদুতে নিপুণ রাজার মন্ত্রবলে,
শত যোজনের সুদূর দুর্গে চকিতে গেল সে চলে।

চলে গেল যবে রাজ-সহচর নৃপতির মুখ চাহি,
জিজ্ঞাসা করে নিয়তির দূত নয়নে নিমেষ নাহি,—
"অনুচরে তব আজি এ কাননে হেরিতেছি কোন্ কাজে,
এখনি যে তা'র মৃত্যু-লিখন দূর দুর্গের মাঝে।"
শুনিয়া নৃপতি পিছু হটি গেল সর্পাহতের মত,
করযোড় করি কহিলা তাহারে চরণে হইয়া নত,—
"মৃত্যু-দেবতা নিয়ম তোমার বল কে রোধিতে পারে!
সেই সে সুদূর দুর্গ-মাঝারে এখনি পাইবে তারে।
রক্ত তপন উঠেছে তখন আকাশে অনেক দূর,
বহ্নিবরণ রশ্মির তারে বাজিছে রুদ্র সুর;
কুসুমকুঞ্জে ভেঙ্গেছে তখন বনমধুপের মেলা;
কচি কিসলয় দুলে দুলে আর বাতাসে করে না খেলা;
আকুল বকুল ঝরে তরুমূলে নীরব পাখীর গান,
ভ্রমে নরপতি একাকী কাননে চিন্তিত ম্রিয়মান।

শ্রীসন্তোষকুমার পাল।

মহাভারতে দ্যুতক্রীড়া।

দ্যুতক্রীড়া যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে কৌরব-পাণ্ডবে যে দ্যুতক্রীড়া হইয়াছিল, তাহাতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়াছিলেন। সেকালের ক্ষত্ররাজগণ দ্যুতক্রীড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দ্যুতক্রীড়া জানিতেন বলিয়াই বোধ হয়। দ্যুতক্রীড়া বা অক্ষক্রীড়া ক্ষত্ররাজগণের প্রিয় ছিল। এমন কি "ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে দ্যুতের বা রণের নিমিত্ত আহূত হইলে" কোন ক্ষত্র নৃপতিই সেই আহ্বানের প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। করিলে রাজন্যসমাজে তাঁহার সম্মানের হানি হইত।

দ্যুতক্রীড়া ক্ষত্ররাজগণের প্রিয় ক্রীড়া হইলেও ইহা যে অতি নিকৃষ্ট ও অনুচিত ক্রীড়া তাহা তাঁহারা জানিতেন। লোকাচারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এই ক্রীড়া করিতেন। অক্ষক্রীড়া যে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য, তাহার উল্লেখ মহা-

ভারতের সভাপর্ব্বে আছে। মহামতি বিদুর বলিয়াছেন,—"দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল, দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দ্যূতই মহৎভয়ের হেতু। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়" অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ায় পরস্পর প্রতিযোগী দলে যে মনোবাদ হয়, তাহা হইতেই ক্রমশঃ বন্ধুত্ব-নাশ ও শেষে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কৌরব-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া কপট ক্রীড়ায় তাঁহাকে পরাজিত করিলে অপমানিত পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, পরে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অসংখ্য প্রাণীর রক্তপাতে তাহার নিবৃত্তি হয়।

দ্যূতক্রীড়ায় রাজন্যবর্গ আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতেন। পণে জয়-পরাজয় অবশ্যই ছিল। রাজারা ধন রত্ন, হস্তী-ঘোটক, দাস-দাসী, পদাতিক-অশ্বারোহী প্রভৃতি পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন।

এই দ্যূতক্রীড়ার পণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সে যুগের রাজন্যবর্গের সমৃদ্ধির একটী পরিস্ফুট চিত্র আমাদের নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন-প্রতিনিধি শকুনির মধ্যে অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হইলে যুধিষ্ঠির যে সমুদয় পণ করেন, তাহার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সামগ্রীগুলি দেখিতে পাই:—(১) মহামূল্য সাগরাবর্ত্ত-সম্ভূত কাঞ্চন-খচিত মণিময় হার; (২) এক লক্ষ অষ্ট সহস্র সুবর্ণপূরিত কুণ্ডী; (৩) কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্টাশ্ব-বাহিত সহস্র রাজরথ; (৪) নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব মাল্যদামে বিভূষিত, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টিকলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী শত সহস্র তরুণী দাসী; (৫) প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, যুবা এবং দিবারাত্রি অতিথি ভোজন করাইতে সমর্থ সহস্র দাস; (৬) সহস্র মত্ত মাতঙ্গ; (৭) মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন-ভোগী সরথ রথী; (৮) নানাপ্রকার বাহন-সংযুক্ত অযুত শকট ও রথ এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষা ষষ্টিসহস্র বীর পুরুষ; (৯) বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, ধেনু, ছাগ, মেষ এবং সিন্ধুনদীর পূর্ব্বস্থিত আমার সমুদয় ধন।

যে রাজা এই সকল সামগ্রী পণস্বরূপ রাখিতে পারেন, তাঁহার সমৃদ্ধি কিরূপ ছিল, তাহা কল্পনায় অনুভব করিতে পারা যায়। এই সমৃদ্ধি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারতীয় যুগে ভারতীয় আর্য্যেরা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে সভ্যপদবাচ্য ইউরোপের রাজন্যবৃন্দও যেমন ঘোড়দৌড়ের খেলা ও অন্যান্য জুয়াখেলা করিয়া থাকেন, তখনকার দিনে ভারতের নৃপতিরাও সেইরূপ জুয়াখেলারই নামান্তরস্বরূপ অক্ষক্রীড়া করিতেন। এই খেলায় রাজাদিগের তখনও যেমন 'বাই' ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। তবে তখনকার মত সর্ব্বনাশকর পণ, এখন আর নাই।

জীবন-সন্ধ্যায়।

ভবের বাজারে একটী কোণেতে
দোকান পাট্‌টি পাতি,
লাভের আশায় বসে আছি শুধু
সারাদিন সারারাতি।
বেচি পুণ্য কত, কিনি পাপ শত,
সারা নিশিদিন ধরি,
বুদ্‌বুদ্‌ সম সুখের স্বপন
মনে মনে কত গড়ি।
জীবন-আকাশে সন্ধ্যার রেখা
সহসা গো দেখা গেল,
বেচা হল আয়ু, লাভ হ'ল পাপ,
দোকান ভাঙ্গিয়া এল।
সন্ধ্যা-আঁধারে গেল কে কোথায়
কারেও খুঁজি না পাই,
লাভের কড়িতে বোঝা বড় ভারী
চলৎ-শকতি নাই।
আঁধারে আঁধারে খুঁজি কত ক'রে
পেনু যদি ভাঙ্গা তরী,
নাহি আছে দাঁড়, নাহি কর্ণধার,
পার বা হই কি করি?
ভারী বোঝা কোলে জীর্ণ তরণী
যুঝিছে তুফান-সনে;
হায়, বুঝি হায় অতল-মাঝারে
ডুবে যায় ধনে জনে!

ক্ষুধিত ভীষণ জলজীবগণ
এই বুঝি হায় গ্রাসে!
মনে কি তা' ছিল দিবা-অবসানে
সন্ধ্যা ঘনা'য়ে আসে!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্নেহের বন্ধন।

গৃহকাজে যা'বে মাতা 'খোকা'রে ভুলা'য়ে,
ক্ষুদ্র শিশু দাঁড়াইল পথ আগুলিয়া।
'কোন্ ভাগ্যে দিলা বিধি তোমারে মিলায়ে',—
হাসিমুখে কন মাতা শিশুরে চুমিয়া!
শিশু ভাবে এ আমার বিজয়-গৌরব,
মাতা গৃহকাজ ভুলি কোলে নিল তারে,
মাতা ভাবে এ আমার অচিন্ত্য বৈভব;
শিশু ভাবে আমি জয় করিয়াছি মারে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

স্নেহের অপসরণ।

স্নেহবন্ধন টুটিয়া যে যায়,
সে নাকি আবার আসে!
অলি যায় ফিরে আসে কি আবার
দল-ঝরা ফুল বাসে!
পাখী উড়ে যায় কাননে সুদূর;
সুখময় গীতি স্মৃতিটী মধুর,
পড়ে থাকে কোথা হৃদয়ে প্রচুর,
বাসনার কোন্ পাশে!
স্নেহবন্ধন টুটিয়া যে যায়
সে নাকি আবার আসে!
খালি খাঁচা হ'তে যত ডাক তারে,
আয়, পাখী আয় আয়—
মায়া ছেড়ে গেছে বারেক যে চ'লে,
সে কি আসে পুনরায়!

জাগিয়া উঠিবে শুধু হা-হুতাশ,
তাপিত ব্যথিত পরাণে হতাশ ;
ঘুরে ফিরে যাবে মত্ত বাতাস
নিদারুণ উপহাসে।
স্নেহ-বন্ধন টুটিয়া যে যায়
সে নাকি আবার আসে ?

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

পুস্তক পরিচয়।

সাধনা (বিবিধ প্রবন্ধ)। (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রণেতা—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম্-এ। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'সাধনা' কয়েকটী প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটী প্রবন্ধ এই পুস্তক-খানিতে আছে। প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্থানে চিন্তাপ্রণালী নূতন, কিন্তু 'উৎকট মৌলিক' নহে। অবশ্য গ্রন্থকারের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি বটে, কিন্তু গ্রন্থকার যে শুভ-উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমালোচ্য পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করি। 'সাধনা'র ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের দুই এক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে পথও গ্রন্থকার পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"ছাত্রজীবনের যতগুলি অসম্পূর্ণতা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মাতৃভাষায় অনধিকার অন্যতম, সুতরাং মাতৃভাষা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসই জীবনের সাধনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।" বঙ্গবাণী তাঁহার ভক্ত-সন্তানকে অবশ্যই সিদ্ধিদান করিবেন; সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, গ্রন্থকার "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা", "হিন্দু ও মুসলমান", "নিম্নশ্রেণীর অধিকার," "সমাজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব," "আমাদের কর্ত্তব্য," "নেতৃত্ব," "আধুনিক বঙ্গসমাজ ও মালদহ," "আমাদের জাতীয় চরিত্র" "ভাবুকতা"—এই নয়টী প্রবন্ধে যে ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, সে ভাষা সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যের আদর্শ ভাষা বলিয়া বিবেচনা করি না। যে ভাষায় বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার

বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক-প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষাই সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যের ভাষা। সকল জেলার বাঙ্গালী—হউন তিনি মেদিনীপুরবাসী অথবা চট্টলবাসী এ ভাষা বুঝিতে পারিবেন। সাহিত্যের ভাষার সহিত কথোপকথনের ভাষার মিশ্রণে যে "খিচুরীর"র সৃষ্টি হয়, তাহা বিষাদ বলিয়া অবশ্য বর্জ্জনীয়। বিনয়কুমার বঙ্গবাণীর অকপট সাধক, আজিকালিকার হঠকারী "ভুঁইফোড়" "সবজান্তা" সাহিত্য-সেবী নহেন, তাই তাঁহাকে এতগুলি কথা বলিলাম।

বড়ই আনন্দের বিষয়, পরবর্ত্তী ছয়টী প্রবন্ধে গ্রন্থকার আদর্শ সাহিত্যের ভাষাই অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রবন্ধগুলির ভাষা-সংস্কার যদি তিনি এই দ্বিতীয় সংস্করণে করিতেন, তাহা হইলে আমরা আরও আনন্দিত হইতাম। আশা করি, তৃতীয় সংস্করণে তিনি ইহার সংস্কার করিবেন।

আমাদের শেষ কথা,—'সাধনা'র মত সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসীরই ইহার এক একখণ্ড ক্রয় করা উচিত।

রচনা-প্রণালী। শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, এম্-এ, প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষ।

আমরা 'রচনা-প্রণালী' পাঠ করিয়া শুধু যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহা নহে; উপকৃতও হইয়াছি। আজকাল বাঙ্গালা ভাষার রচনা-পদ্ধতি নব্য যথেচ্ছাচার লেখকগণের হস্তে পড়িয়া যেরূপ দুর্দ্দশালাভ করিতেছে, তাহাতে এইরূপ পুস্তকের যে সবিশেষ প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য-পাঠ্য হইয়াছে। সুতরাং ছাত্রেরা যাহাতে বিশুদ্ধ-ভাবে বাঙ্গালা লিখিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। নলিনী বাবুর "রচনা-প্রণালী" তাহাদিগকে যে সেই সুবিধা প্রদান করিবে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। নব্য লেখকগণেরও এক এক খণ্ড "রচনা-প্রণালী" সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

অঞ্জলি। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

অঞ্জলি—ছোট গল্পের বই। দশটি গল্প রচনা করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গ-বাণীর চরণে 'অঞ্জলি' দান করিয়াছেন। গল্পগুলি মন্দ নহে। পুস্তকখানি সচিত্র এবং অবসর-রঞ্জনের পক্ষে মন্দ হয় নাই।

উপেক্ষিতার জয়।

"কি গো তুমি যে অমন মুখ ভার ক'রে রইলে!"

স্ত্রীর এই কথায় স্বামী উত্তর করিলেন,—"যাও যাও আমায় এখন বিরক্ত কর'না। আমি একখানা নভেল লিখ্‌ছি, অনেক ভাব্‌তে হচ্ছে, এসময় তোমার মত মূর্খ স্ত্রীর কাছে না আসাই ভাল। আজ কতদিন থেকে বল্‌ছি লেখাপড়া ভাল ক'রে শেখ, তা'ত শিখ্‌বে না! শিখ্‌লে স্বামীর কাজে অনেক সাহায্য কর্‌তে পার্‌তে! তা যখন কর্‌তে পার্‌বে না, তখন তোমায় আমায় ভিন্ন থাকাই ভাল। তুমি কাছে এলে আমার একটুও সুখ হয় না। তুমি কাছে এস না, আমি মনে কর্‌ব, রঙ্গমতী মরেছে।"

স্বামীর এমন কথায় কোন্ স্ত্রীর না রাগ হয়? রঙ্গমতীরও রাগ হইল। কিন্তু রাগ হইলে কি করিবে, সে রাগ তাহাকে সহ্য করিতে হইল। এদিকে রাগের সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনাও দেখা দিল, রঙ্গমতী ভাবিল, "স্বামী কত যত্ন ক'রে লেখাপড়া শিখা'তে চেষ্টা করেছিলেন, কত সাধ্যসাধনা করেছিলেন, তখন তাঁর কথা শুনিনি। এখন তার ফলভোগ কর্‌ছি। তা'তে রাগ কর্‌লে আর ফল কি।" তার পর আবার ভাবিল,— "হলেমই বা মূর্খ, তবু স্বামী কেন আমাকে কাছে আস্‌তে দেবেন না, আমি জীয়ন্ত থাক্‌তেও মনে কর্‌বেন আমি মরেছি, এই বা কেমন কথা! উনি বই লিখেন, আর ওঁর ঘর-সংসারের কাজ দেখে কে? তা উনি যখন আমায় দেখ্‌তে পারেন না, তখন আমি আর এখানে থাক্‌ব না। বাপের বাড়ীতে যা'ব। আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যদি ওঁর মত বই লিখ্‌তে পারি, তবেই ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব, নইলে নয়।"

সেদিন হইতে রঙ্গমতী ও তাহার স্বামী যামিনীভূষণ রায়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। দু'জনেই দু'জনকার দৃষ্টি এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন রঙ্গমতী বাঁকা বাঁকা অক্ষরে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া জানাইল,— "আমার এখানে আর ভাল লাগিতেছে না, শরীরও খারাপ, মনও খারাপ, আমাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আমার দাদার কাছে যাইতে অনুমতি দাও।"

যামিনীভূষণ সে চিঠির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল,—'তুমি যেতে পার, তুমি তফাতে থাক্‌লে আমি সুখী হ'ব।'

২

প্রায় মাস খানেক হইল, রঙ্গমতী চলিয়া গিয়াছে। যামিনীভূষণ যে তাহার অভাব পদে পদে অনুভব করিত না, তাহা নহে। কিন্তু তাহার বাহিরের চাল-চলন ও ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে কেহ বিরহ-কাতর মনে করিত না। একটা বিরাট গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদাই তাহার আকৃতি-প্রকৃতিকে এরূপ ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, যামিনীভূষণের মনের ভিতরকার বিরহ-ক্লেশ কিছুতেই সে আবরণ ভেদ করিয়া মুখে চোখে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার গৃহ শূন্য বোধ হইলেও সে তাহার মনের শূন্যতাকে সাবধানে চাপিয়া রাখিয়াছিল। যে বালক-সুলভ সরল উচ্চ হাস্যধ্বনি যামিনীভূষণের মুখ হইতে পূর্ব্বে নিঃসৃত হইত, তাহা বরং এখন আরও একটু উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারা দেখিতেন, সে হাসিতে আগেকার মত প্রাণ ছিল না।

যামিনীভূষণের দূরসম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন। তাঁহার কেমন একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, তিনি লোকের বাহিরের চেয়ে মনের ভিতরের দিকটাই বেশী দেখিতে পাইতেন। বিশেষতঃ রঙ্গমতীর এরূপ আকস্মিক তিরোধানহেতু বৃদ্ধা সেবা-শুশ্রূষার যে যথেষ্ট অভাব অনুভব করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র ছিল না। একদিন বৃদ্ধা যামিনীভূষণকে ডাকিয়া বলিল,—"বাবা, বৌমা কবে আস্‌বে।"

যামিনী। কবে যে আস্‌বে তা বল্‌তে পারিনে। শরীরটা সেরে উঠ্‌লেই আস্‌বে।

পিসিমা মিথ্যা কথার উপর বড়ই বিরূপ ছিলেন। কাহারও মুখে মিথ্যা

কথা শুনিলে তিনি একেবারে রাগে অন্ধ হইয়া যাইতেন। কাজেই তিনি রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন—"তোর শরীরে রোগ, না রোগ তোর মনে? তা তোর এ রোগ সার্‌তেও দেরী হ'বে। তুই আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে।"

যামিনীভূষণ ভাবিল,—বুড়ীর কাছে যখন ধরা পড়েছি, তখন গোলমাল হ'বার আগে তাঁকে কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

যামিনীভূষণ পিসিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তা আপনার বয়সও হয়েছে, কাশীবাসের সময়ই ত এই।"

পিসিমা দেখিলেন, যামিনীভূষণ একটীবারও তাঁহাকে থাকিতে বলিল না; আর সে যখন আমাকে যাইতেই বলিতেছে, তখন আমার আর এখানে থাকাটা ভাল দেখায় না। ভাল মনেই হউক আর মন্দ মনেই হউক, সে যখন আমাকে কাশীতে পাঠাইতেছে, তখন এ সুযোগ ছাড়া ভাল নহে। তাই পিসিমা বলিলেন, 'বাবা আজ বেশ দিন ভাল, আমি যাত্রা কর্‌ব।'

যামিনীভূষণ দ্বিরুক্তি করিল না। সেইদিনই রাত্রির ট্রেণে পিসিমা কাশীযাত্রা করিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে ট্রেণের 'হাতল' ধরিয়া যামিনীভূষণ পিসিমাকে বলিল,—"খুব সাবধানে থাক্‌বেন, কোন কিছু অসুখ-বিসুখ কর্‌লেই আমাকে টেলিগ্রাম কর্‌বেন।' যামিনীভূষণ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ট্রেণ ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল। পিসিমা বলিলেন, 'বাবা তবে চল্‌লেম। বৌমাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসিস্। রাগ ক'রে থাকাটা কি ভাল?'

ট্রেণ ছাড়িল; যামিনীভূষণ গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৩

রঙ্গমতী যে দিন পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল, সেদিন শুনিল তাহার ছোট দাদাকে বিবাহের জন্য দেখিতে আসিবে। রঙ্গমতীর ছোটদাদা সম্প্রতি এম্ এ পাশ করিয়াছে। দেখাদেখির জন্য বাড়ীতে কিছু গোলমাল হইতেছে, সুতরাং ওই গোলমালের ভিতর পড়িয়া রঙ্গমতীর মনের ভারও অনেকটা কমিয়া গেল। তারপর ছেলেদেখার কাণ্ড মিটিয়া গেলে যখন বাড়ীর লোকজন একটু সুস্থ হইল, তখন রঙ্গমতীর মা রঙ্গমতীকে বলিলেন,—'রঙ্গ তুই এমন রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস্ কেন?'

রঙ্গমতী উত্তর করিল,—'কি হয়েছে জানি নে। ঔষধ-পত্রও ত অনেক 'উনি' খাইয়েছেন, তা সারতে পারছি না। তাই বলেছেন, বড় দাদার কাছে কিছু দিন থেকে হাওয়া বদ্‌লে আস্‌তে।'

মা। যামিনী ত আমাদের এ সব কথা কিছুই জানায় নি।

রঙ্গ। তা আমি কি ক'রে জান্‌ব মা?

শ্বাশুড়ী যামিনীভূষণকে বেশ চিনিতেন। তাহার মত মুখচোরা, লাজুক, গৃহকোণবাসী, অসামাজিক যে কাহাকে কিছু না বলিয়া একটা কার্য্য করিতে পারে, ইহাতে রঙ্গমতীর মাতার অবিশ্বাস করিবার কিছুই ছিল না।

রঙ্গমতীর শরীর বাস্তবিক পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। স্বামীর উপেক্ষায় কোন্ স্ত্রীর শরীর ভাল থাকিতে পারে? স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কথা কোন বাঙ্গালী স্ত্রীই পরের কাছে—বিশেষতঃ গুরুজনের কাছে বলিতে পারে না; খুব সমবয়সীর মধ্যে বরং বলিতে পারে। কাজেই রঙ্গমতীর মনের রোগ চাপাই রহিল, শরীরের রোগ দূর করিবার জন্য স্নেহময়ী মাতা তাহাকে তাহার বড় দাদার কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

৪

রঙ্গমতীর বড় দাদা কাশ্মীরের রাজ-সরকারে উচ্চ রাজকার্য্য করেন। রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য-পরিচালনার জন্য কাশ্মীর-রাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে একজন যোগ্য লোক চাহিলে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট উঁহাকেই সেখানে পাঠাইয়া দেন। বাস্তবিকই রঙ্গমতীর বড় দাদার সুযশ ও সুনাম কাশ্মীরে যথেষ্ট। কাশ্মীরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যজনক বলিয়া রঙ্গমতী যে তাহার বড় দাদার কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, তাহা নহে। তাহার বড় দাদা, স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী. নিজে পড়াইয়া নিজের স্ত্রীকে বিদুষী করিয়াছেন, তাঁহার কাছে গেলে লেখাপড়া শেখার খুবই সুবিধা হইবে ভাবিয়া রঙ্গমতী বড় দাদার কাছে গিয়াছিল।

একদিন রঙ্গমতীর বড় দাদা আহারে বসিয়াছেন, রঙ্গমতী পাখা হাতে করিয়া তাঁহার গায়ে হাওয়া দিতেছে, এমন সময় তিনি রঙ্গমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হ্যারে রঙ্গ! তুই ত চিরকাল আমার ওপর চটা। আমি কত ক'রে বল্‌তেম্ লেখাপড়া শেখ্, তা' তখন শিখিস্‌নি। কত ধমক্-ধামক্

দিতেম, তা' তুই রাগ ক'রে আমার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতিস্ না। এখন বুঝি আমার কাছে আস্তে ভয় কর্লে না। এখন যদি আবার লেখাপড়া শিখাবার কথা বলি, তা' হ'লে ত পালা'তে পার্বি না; শিখ্তেই হ'বে। তা' যা' তোর ভয় নেই, তুই মূর্খ হ'য়েই থাক, এখন আর তোকে আমি লেখাপড়া শিখ্তে বল্ব না। তুই মনের স্ফুর্ত্তিতে থেকে শরীরটে শুধ্রে নিয়ে যা। বিশেষ আমি আর এখানে বেশী দিন থাক্ব না। বড় জোর বছর চার পাঁচ।"

রঙ্গমতী বড় দাদার কথা শুনিয়া বলিল,—"দাদা এখানে বসে বসে আর কি কর্ব? বরং একটু একটু লেখাপড়া শিখ্ব। আর বিকালে তোমার সঙ্গে হাওয়া খেয়ে আস্ব।"

রঙ্গমতীর কথা শুনিয়া তাঁহার বড়দাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"সে ত বেশ কথা। তোর যা' ইচ্ছে হয় তা' কর্বি।"

রঙ্গমতীর যে একেবারে 'বর্ণপরিচয়' হয় নাই, তাহাকে এমন নিরক্ষর কেহ মনে করিবেন না। রঙ্গমতী প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুকের আধখানা ও আখ্যানমঞ্জরী শেষ করিয়াছিল। টাকা আনা পয়সাও লিখিতে পারিত। ধোপার হিসাব, গয়ণার হিসাব নিজে রাখিত। চিঠিপত্রও বেশ লিখিত। সে শ্বশুরবাড়ীতে বৃদ্ধা পিসিমার নিকট বসিয়া বসিয়া বটতলার রামায়ণ, মহাভারত আট দশ বার শেষ করিয়াছিল।

ইহাতেও কিন্তু রঙ্গমতী তাহার স্বামীর ও বড়দাদার নিকট মূর্খ! বিশেষতঃ যখন তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িয়া গেল, তখন রঙ্গমতী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহার বড় দাদাকে বলিল,—'দাদা, তুমি ব্যবস্থা ক'রে দাও, আমি লেখা পড়া শিখ্ব। তোমরা আমায় মূর্খ ব'লে নিন্দে কর্বে, তা' আমি সইতে পারিনে।"

রঙ্গমতীর বৌদিদি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ব'ললেন, "ও ঠাকুরঝি 'তোমরা' বল্লে যে, ঠাকুর-জামাইও বুঝি ঠাট্টা করে? তা ভাই অমন একটু-আধটু সইতেই হয়। তোমার মত বয়সে তোমার দাদা আমাকে এই নিয়ে কত ঠাট্টাই কর্তেন। কি কর্ব ভাই সব সইতে হয়েছিল। তা ওঁরা যা চান ওঁদের মতই ত আমাদের হ'তে হ'বে। আমারা পুতুল বৈ ত নয়!"

রঙ্গমতীর দাদা রঙ্গমতীর বৌদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই ত

বেশ 'লেক্‌চার' দিচ্ছ! তবে বল যে আমি 'লেক্‌চার' দিতে পার্‌ব না।"

রঙ্গমতীর দাদা চলিয়া গেলেন।

রঙ্গমতী বৌদিদির শরণাগত হইল। গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গেলেই প্রত্যহ রঙ্গমতী তাহার বৌদিদির কাছে পড়িতে বসিত। তাহার যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনই অদ্ভুত মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে সে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের পুস্তক-সমূহ, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রধান পুস্তক, বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিল। তারপর ইংরাজী ছোট খাট নভেল, গল্প প্রভৃতিও পড়িতে আরম্ভ করিল।

রঙ্গমতীর অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি দেখিয়া তাহার বিদুষী বৌদিদি একদিন তাহাকে বলিল, "ভাই আমার দ্বারা আর তোমার লেখাপড়া হ'বে না। এবার হয় তোমার দাদাকে ধর, নইলে আমি চিঠি লিখে আমার ঠাকুর-জামাইকে আনাই।"

রঙ্গমতী বৌদিদিকে একটা ছোট কিল দেখাইয়া বলিল,—"বৌদিদি তুমি বড় দুষ্টু।"

বৌদিদি। এখন তুই যা শিখেছিস্, এতেও যদি সে তোকে মূর্খ বলে, তা'হলে আমি তার কান ম'লে দিব।

রঙ্গমতী। দিদি সব কথা ত তোমায় বলেছি। আমাকে আরও লেখা-পড়া শিখ্‌তে হবে। শিখ্‌তে যদি পারি, তবে তাঁর চরণ-তলে ফিরে যেতে পার্‌ব, নইলে এই শেষ।

এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গমতীর চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। বৌদিদি রঙ্গমতীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল,—"তুই কাঁদচিস্ কেন ঠাকুরঝি? তোর অভিমান বজায় রাখিয়ে যার ধন তাকে ফিরিয়ে দেব।"

পরবর্ত্তী দুই বৎসর রঙ্গমতী তাহার দাদার নিকট সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, আর একজন শিক্ষিতা শ্বেতাঙ্গ-মহিলার নিকট ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়িতে লাগিল। মধ্যে কিছুদিন তাহার ছোটদাদা কাশ্মীরে বেড়াইতে আসিয়াছিল, তাহার নিকটে সে বিজ্ঞানও কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিল।

এখন রঙ্গমতীর আর অন্য কোন কাজে মন নাই। সে উৎকৃষ্ট রচনা-

পদ্ধতি শিখিতে চেষ্টা করিতেছিল। উপন্যাস লিখিবার দিকেই তাহার ঝোঁক কিছু বেশী। সে শ্রেষ্ঠ ইংরাজ ঔপন্যাসিকদিগের গ্রন্থাবলী পড়িতেছে, বাঙ্গালার উপন্যাসগুলিও খুব যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। তাহার স্বামী যামিনী-ভূষণও বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার। স্বামীর বইগুলিও সে পয়সা দিয়া কিনিয়া পড়িয়া দেখিতেছে।

এই সকল পুস্তকাদি পড়িতেও রঙ্গমতীর আর এক বৎসর কাটিল। এই: বার সে মনে মনে সংকল্প করিল,—আমি একখানি উপন্যাস লিখিব। উপ-ন্যাসের পরিকল্পনাও সে করিয়া ফেলিল! 'আজ আরম্ভ করিব', 'কাল আরম্ভ করিব' রঙ্গমতী এইরূপ মনে করিতেছে, এমন সময়ে একদিন তাহার বড় দাদার মুখে শুনিল,—কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টে তাহার দাদার যতদিন কার্য্য করিবার সময় ছিল, তাহা উত্তীর্ণপ্রায়। এইবার তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিবেন। দাদার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কাশ্মীর-সরকার তাঁহাকে পনের হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

রঙ্গমতীর বড়দাদা রঙ্গমতীকে বলিলেন,—"দেখ্ রঙ্গ, এই টাকাটা আমরা আর সিন্দুকে তুল্‌ব না; আমার ইচ্ছা—কোন একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় একটা বাড়ী তৈরি করি। তুই কি বলিস্।"

রঙ্গমতীর কলিকাতায় ফিরিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। সে বলিল, "দাদা, আপনি ত এক বছরের ছুটীও পেয়েছেন, এই সময়ে চলুন না কেন, আমরা দেওঘরে গিয়ে থাকি আর দেখে শুনে নিজেদের পছন্দমত একটা বাড়ী তৈরী করি।"

রঙ্গমতীর বড় দাদা বলিলেন,—'এ কথা ভাল।'

৫

রঙ্গমতীরা এখন দেওঘরে। কিন্তু সুবিধামত জায়গা না পাওয়ায় অগত্যা রঙ্গমতীর দাদা শিমুলতলাতেই একটি নূতন বাড়ী তৈয়ারী করাইতেছেন। বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য একরূপ শেষ হইয়াছে। কেবল চুণ-কাম ও রংএর কাজ বাকী আছে। আর মাসখানেকের মধ্যে এ সকল কার্য্যও শেষ হইবে।

রঙ্গমতী দেওঘরেই তাহার উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; শিমুল-

তলার নূতন বাড়ীতে আসিয়া তাহা শেষ হইল।

রচনা শেষ হইলে রঙ্গমতীর বৌদিদি রঙ্গমতীকে বলিল,—‘ঠাকুরঝি ঠিক মুখের মতন দিয়েছিস্। সেদিন তোর মামাত’ ভাই রমেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে ঠাকুরজামাইয়ের দেখা হয়েছিল। ঠাকুর-জামাই তাকে বলেছে, আমি শিমুল-তলায় যাব যাব মনে করছি, কিন্তু যেতে পার্‌ছি না। আর সে যখন বড়দাদার কাছে রয়েছে, তখন সে আমার বাড়ীর চেয়ে যে খুব ভালই আছে, তা'তে সন্দেহ নেই। পূজার মধ্যে আমার একখানা উপন্যাস বেরুবে, সেইজন্যে বড়ই ব্যস্ত আছি। পূজার পরে শিমুলতলায় নিশ্চয়ই যা'ব। ঠাকুর-জামাই খুব চাপা লোক! ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন জান্‌তে দেয়নি যে. তার সঙ্গে তোর ভিতরে ভিতরে এমন বিচ্ছেদ হয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই তোর বড় দাদার কাছে একখানা ক'রে চিঠি এসেছে, তাতে তোর সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কেবল তোর স্বাস্থ্যের খবর জান্‌তে চাইত। এত বড় ঝড়-ঝাপ্‌টা হ'য়ে গেল, কৈ কেউত জান্‌তে পার্‌লে না। তা' যা'ক ঠাকুর-জামাই যখন বই লিখেছেন, আর পূজারও বড় দেরী নেই, তখন তোর বইখানাও ছাপিয়ে ফেল্‌তে হ'বে। কল্‌কেতার বিখ্যাত বইওয়ালা ঘোষ বসু কোম্পানির মালিক আমার মামা। আমি তাঁর কাছে আজই রেজেষ্টারী ডাকে বইখানা পূজার ভিতরে ছাপিয়ে বার কর্‌বার জন্য পাঠিয়ে দিই—কি বলিস্! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি এই বইখানাই এবার পূজার বাজারে সকলকার চেয়ে ভাল উপন্যাস হ'বে!”

রঙ্গমতীর মুখে লজ্জা ও গৌরব লুকোচুরি খেলিয়া গেল। বৌদিদি যে তাহার প্রশংসা করিল তাহাতে লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা গৌরবে সে ফুলিয়া উঠিল, সে গৌরব পুস্তকরচনার জন্য গৌরব নহে,—স্বামীর নিকট বিজয়িনী হইয়া ফিরিবার গৌরব!

রঙ্গমতী এতদিন স্থির ধীর ভাবে ছিল, আজ অধীর হইয়া পড়িল। এক মাসের মধ্যে তাহার পুস্তকখানি ছাপা হইল বটে, কিন্তু এই এক মাসকে সে একটা যুগ মনে করিতেছিল, আর প্রত্যেক নিমিষে সে স্বামীর নিকট হইতে দূরে পড়িতেছে, এইরূপ ভাবিতেছিল।

৬

রঙ্গমতীর উপন্যাসখানির নাম হইল,—“প্রত্যাখ্যান।” কিন্তু বৌদিদির

পরামর্শে রঙ্গমতী আপনার নাম উহাঁতে প্রকাশ করিল না। সকলে জানিল 'প্রত্যাখানে'র রচয়িত্রী শ্রীমতী কুরঙ্গনয়না দাসী। 'প্রত্যাখ্যান' নূতন লেখিকার নূতন পুস্তক হইলে কি হয়, বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে উহার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার যামিনীভূষণের নূতন উপন্যাস "দেশ-লক্ষ্মী" 'প্রত্যাখানে'র ১ সপ্তাহ পূর্ব্বে বাহির হইয়া যে যশঃ লাভ করিয়াছিল, 'প্রত্যাখান' প্রকাশের পর তাহা ঢাকা পড়িয়া গেল। 'প্রত্যাখানে'র সুখ্যাতি ও প্রশংসা আজ প্রত্যেক বাঙ্গালী-পাঠকের মুখে ধ্বনিত হইতেছে। অবশ্য "দেশ-লক্ষ্মী"কে যে লোকে নিন্দা করিয়াছিল, তাহা নহে। 'দেশলক্ষ্মী'কেও লোকে আদর-সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল, প্রশংসাও করিয়াছিল, কিন্তু "প্রত্যাখানে"র মত নহে। সমালোচকেরা একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "দেশ-লক্ষ্মী" যামিনীবাবুর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, কিন্তু এ বৎসরের পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস—কুরঙ্গনয়নার "প্রত্যাখ্যান।"

যামিনীভূষণ অনেক পরিশ্রম করিয়া 'দেশলক্ষ্মী' রচনা করিয়াছিল। কিন্তু 'দেশলক্ষ্মী' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইতে পারিল না বলিয়া সে একটু নিরাশ হইয়া পড়িল। আজ নৈরাশ্যে অবসন্ন-হৃদয় যামিনীভূষণ প্রতিপদে রঙ্গমতীর অভাব অনুভব করিতে লাগিল। সে মনে করিল, রঙ্গমতীর কোন দোষ ছিল না, সে লেখাপড়া জানিত না বলিয়াই তাহাকে আমি উপেক্ষা করিতাম। আজ ত লেখাপড়া জানিয়াও আমি জগৎ-সমক্ষে মূর্খ হইলাম। অনেক দিনের পাকা উপন্যাস-লেখক হইয়াও আজ একজন নূতন উপন্যাস-রচয়িত্রী আমাকে মূর্খ বলিয়া সপ্রমাণ করিল। লেখাপড়া জানিয়াও যখন আমি মূর্খ হইতে পারি, তখন লেখাপড়া না জানিয়া রঙ্গমতীর মূর্খ হওয়ায় তাহার বিশেষ কিছুই দোষ ছিল না। আজ মূর্খ প্রতিপন্ন হওয়ায় আমার যে কষ্ট হইতেছে, রঙ্গমতীকে প্রতিদিনই আমার কাছে সেইরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমি কি নিষ্ঠুর!

রঙ্গমতীর মামাত ভাই রমেশ এই সময়ে যামিনীভূষণের বাটীতে উপস্থিত হইল। সে বলিল, "যামিনী বাবু পূজা ত আস্‌ছে, এই সময় চলুন না একবার শিমুল-তলায় বেড়িয়ে আসি। শুন্‌ছি, রঙ্গমতীর বড় দাদার স্ত্রীর অসুখ করেছে, তা এক ঢিলে দু'পাখী মেরে আসা যাবে। জায়গাটাও দেখা হ'বে, কুটুম্বিতাও করা হ'বে।"

যামিনীভূষণ দেখিল, প্রস্তাব বড় মন্দ নয়। মনে মনে ভাবিল, রঙ্গমতীকে

মূর্খ বলিয়া যে কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়াও আসিব। সে বলিল, "তবে রমেশ বাবু, দেরী ক'রে কি হ'বে ? দু' একদিনের মধ্যেই চলুন। বৌদিদির অসুখ, শুনে ত চুপ ক'রে থাকা যায় না।"

রমেশ সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। যামিনীভূষণও বেড়াইতে বাহির হইল। বাড়ীতে ফিরিবার সময় সে একখানি "প্রত্যাখ্যান" কিনিয়া আনিল। রাত্রিতে পুস্তকখানি পড়িবে বলিয়া পাতা উল্টাইতেই 'উৎসর্গপত্র' বাহির হইল। উৎসর্গ-পত্রে লেখা আছে :—

"জীবন-সর্ব্বস্ব যা——

তোমারই সন্তোষের জন্য মূর্খ রমণীর এই নিষ্ফল চেষ্টা—

"প্রত্যাখ্যান"

তোমারই হাতে সঁপিয়া দিলাম।"

—পড়িয়া যামিনীভূষণ চমকিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আজ কে কঠোর-ভাবে আঘাত করিয়া বলিল, "রঙ্গমতীকে মূর্খ বলিয়া তুমি ঘোর অন্যায় করিয়াছ।" যামিনীভূষণ ভাবিল,—শিমুলতলায় গিয়া রঙ্গমতীর হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তবে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়। রঙ্গমতী কি ক্ষমা করিবে না ?

তারপর যামিনীভূষণ পুস্তকখানি যতই পড়িতে লাগিল, ততই দেখিতে পাইল যে, ইহা যেন—যেন কেন সত্য সত্যই তাহার জীবন-কাহিনী। তবে কি কেহ আমাদের দাম্পত্য-কলহের কথা জানিত ? যামিনীভূষণ পুস্তকখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

৭

রমেশ ও যামিনীভূষণ যেদিন শিমুলতলায় রঙ্গমতীর বড় দাদার নূতন বাটীতে উপস্থিত হইল, সেইদিন বৌদিদি স্বয়ং আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। যামিনীভূষণ বলিল, "আপনার শরীর কেমন ?" "হাঁ, আমার ক'দিন আমাশয় হয়েছিল বটে, কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে গেছি। ভাগ্যি ঠাকুরঝি ছিল, তারই সেবায় বেঁচে উঠ্‌লেম। ঠাকুরঝি কল্‌কেতায় না গেলে সেই আপনাদের অভ্যর্থনা কর্‌ত, আমাকে এ কাজ কর্‌তে হ'ত না !"

যামিনীভূষণ বৈঠকখানায় বসিয়া গায়ের কোট খুলিতে খুলিতে ভাবিল,—"রঙ্গমতী নাই। তবে উপায় ? ক্ষমা চাইব কি ক'রে ? এমন সুযোগেও

যখন তা'র সঙ্গে দেখা হ'ল না, তখন কি ক'র্ব ? দেখি তু' পাঁচ দিন থেকে বাড়ী ফিরে যাব"।

পূজার ছুটী পাইয়া অনেক লোক এখন শিমুলতলায় আসিয়াছে; যামিনীভূষণও তাহদের মধ্যে একজন। সকালে বিকালে যামিনীভূষণ লাট্টু পাহাড়ে বেড়াইতে যান, আর ফিরিয়া আসেন। সঙ্গে কোন দিন রমেশ যায়, কোন দিন যায় না। বেশীর ভাগ যামিনীভূষণ একাকীই বেড়াইতে যায়। এইরূপে প্রায় ৫।৬ দিন কাটিয়া গেল। বৌদিদির প্রগাঢ় যত্নে, বৌদিদির ছেলেপুলেদের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে যামিনীভূষণের দিনগুলি একরূপ মন্দ কাটিতেছিল না। কিন্তু তবুও যামিনীভূষণের সে স্থান ভাল লাগিতেছিল না। এজন্য যামিনীভূষণ বলিল, "বৌদিদি যদি অনুমতি দেন, আমি বাড়ী যাই।"

বৌদিদি বলিলেন, "তা আমার কি সাধ্য আপনাকে ধ'রে রাখ্তে পারি! তবে কাল্কের দিনটা আপনাকে কিছুতেই ছাড়্ব না। কাল আমাদের বাড়ীতে একটা ছোটখাটো ভোজের ব্যাপার হ'বে, এই ভোজের ব্যাপারে কেবল ক' জন সাহিত্যক আর লেখককে নিমন্ত্রণ করা হ'বে। আপনার ভরসায় এ কাজ করেছি। আরও আনন্দের কথা, এ বছরের নূতন উপন্যাস লেখিকা শ্রীমতী কুরঙ্গনয়নাও আমাদের বাটীতে আস্বেন। তিনি এখানে এসেছেন, আমি তাঁকেও নিমন্ত্রণ করেছি। তিনি কাল আপনার সহিত আলাপ কর্বেন। তিনি বলেছেন, যাঁর বই থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ কর্তে পেলে তিনি খুব সুখী হবেন।"

যামিনীভূষণ বলিল, "আপনার অনুরোধ—না না আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি কালকের দিনটা থেকে যাব।"

বৌদিদি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

যামিনীভূষণ ভাবিতে লাগিল, যে লেখিকা পরের ঘরের কথা অমনভাবে পুস্তকে লিখিতে পারে, তাহার সহিত দেখা করিব না। তারপর ভাবিল, সে দেখা করিবে, আমিত করিব না, ইহাতে আর বাধা দিয়া কি করিব ?

৮

আজ রঙ্গমতীর বড় দাদার বাড়ীতে সান্ধ্যসম্মিলন ও ভোজের অনুষ্ঠান। যে কয়েকজন নব্য কবি ও সাহিত্যিক সন্ধ্যার সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন,

তাঁহারা তখনই খাইয়া চলিয়া গেলেন। নাতি-বিস্তৃত হল-ঘরে রমেশ ও যামিনীভূষণ বসিয়াছিল। বৌদিদি আসিয়া যামিনীভূষণকে বলিল,—'ঠাকুর জামাই আপনি একবার আমার সঙ্গে আস্‌বেন কি? 'প্রত্যাখ্যানে'র রচয়িত্রী আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য পাশের ঘরে অপেক্ষা কর্‌ছেন। তিনি খুব শিক্ষিতা।'

যামিণীভূষণ বাক্যব্যয় না করিয়া বৌদিদির পশ্চাদনুসরণ করিলেন। পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া যামিনীভূষণকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিয়া বৌদিদি বাড়ীর ভিতর যাইলেন।

রঙ্গমতী বাস্তবিক কলিকাতায় যায় নাই, বৌদিদি মিথ্যা করিয়া রঙ্গমতীর স্বামীকে এ সংবাদ দিয়াছিল। রঙ্গমতীকে বৌদিদি পূর্ব্ব হইতেই মোজা বুট বনেট ও ব্রাহ্মিকা সাড়ী পড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তাহাকে তিনি যামিনীভূষণকে যে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই ঘরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "এই আসুন রায় মহাশয়, শ্রীমতী কুরঙ্গনয়নার সহিত পরিচয় করুন।"

যামিনীভূষণের চক্ষু যেই "কুরঙ্গনয়না"র উপর নিপতিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই পাঁচ বৎসরের সমস্ত স্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে অভ্রান্তভাবে স্মরণ করাইয়া দিল——"এ ত কুরঙ্গনয়না নহে, এ যে রঙ্গমতী!" যামিনীভূষণ চীৎকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ তুমি!"

আজ "প্রত্যাখ্যানে"র সকল গৌরব তাহার নিজের গৌরব বলিয়া মনে হইল। এক লম্ফে উঠিয়া যামিণীভূষণ উপেক্ষিতা পত্নীকে দৃঢ় ভুজপাশে বাঁধিয়া ফেলিল।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

কথায় কথায় কেন উথলে নয়ন?

কথায় কথায় কেন উথলে নয়ন?
লুটায়ে আঁচল প্রায়
থাকি পড়ি পায় পায়
নীরব নূপুরসম চুম্বি ও চরণ—
কথায় কথায় তবু উথলে নয়ন!

কথায় কথায় হায় উথলে নয়ন!
যা হেরি, পরশি, শুনি,
তাহে পরমাদ গণি,
হৃদয়-অম্বরে ত্রাস চমকে সঘন,
সভয়ে শিহরি—হ'ল অশনি-পতন!

আকুল পরাণ সদা, সশঙ্কিত মন,
ভজন-পূজন হায়
সকলি বিফল যায়,
স্বপনেও হই যদি ভ্রমে নিপতন—
অমনি উথলে তোর কমল-নয়ন!

সারা দিন রবি-সনে করিয়া সমর
উদিলে বিজয়-সুধা-পূর্ণ সুধাকর,
শ্রম-বিমোচন তরে
মলয় ব্যজন করে—
পবন-পরশে যদি জুড়াই অন্তর,
সরোষে ফুলিয়া উঠে সরস অধর!

তরল তরঙ্গে মাতি জাহ্নবী-জীবন
রবিকরে ঢালি অঙ্গ আনন্দে যখন
চঞ্চল আঁলোক প্রায়
তালে তালে ভেসে যায়।
প্রবাহ-সঙ্গীত যদি শুনি বিমোহন,
বক্ষঃ তোর স্বর্গধাম! কাঁপে সেইক্ষণ!

লুকায়ে গহন বনে লাজে সরোবর
একটি সরোজ ধরি বুকের ভিতর
শিহরি শিহরি সুখে
পরশে সরোজ-মুখে ;
দেখি যদি গুপ্ত-প্রেম-রঙ্গ মনোহর,
অশ্রু নীরে ভাসে তোর নয়ন-প্রান্তর !

নিশির শিশির-রাশি বরষি মাথায়,
জাগিলে কুসুমদল লতায় পাতায়,
অপূর্ব্ব সৌরভে মন
হয় যদি আকর্ষণ—
অমনি অশনি পড়ে অভাগা মাথায়
উথলে নয়ন তোর কথায় কথায় !

অক্ষত হৃদয় সঁপি, অরুদ্ধ জীবন,
হইয়ে অনন্যমন
করিতেছি অনুক্ষণ
তোমা-ময় প্রেম-যোগ যতনে সাধন !
কথায় কথায় কেন উথলে নয়ন ?

—নির্ব্বাসিত।

—(*)—

জাগো।*

১

সুদূর পূর্ব্বে আলো তবু তব কেন গো রুদ্ধ দ্বার,
সমীর বহিছে মত্ত, তাহার লুপ্ত হৃদয়-ভার,
প্রভাতের মৃদু স্নিগ্ধ পরশে জাগিল গোলাপরাণী,
তোমারে কি আজ জাগাবে না তার স্নিগ্ধ কোমল পাণি?
জাগো এণাক্ষি! আঁখি মিলে চাও শোন গো একটি কথা,
তোমার লাগিয়া আমি আছি চাহি হৃদয়ে গভীর ব্যথা।

২

জাগ্রত আজি প্রেম-সঙ্গীত আলোক তোমার লাগি,
নিবিড় রক্ত গগনের কোলে অরুণ উঠিল জাগি,
মুক্তপক্ষ চাতকের সুরে ভেসে আসে মৃদু তান,
এখনো কেন গো নিদ্রার ঘোরে মুদ্রিত দুনয়ান?
জাগো এণাক্ষি! আঁখি মিলে চাও শোন গো একটি কথা,
তোমার লাগিয়া আমি আছি চাহি হৃদয়ে গভীর ব্যথা।

৩

প্রাণের বাঞ্ছা ভ্রান্তির বশে হারাইয়া ফেলি কত,
প্রাক্তন-সুখ ভাঙ্গিতে তোমার কেন গো প্রয়াস এত?
পূর্ণ করিতে হৃদয় তোমার সঞ্চিত প্রেম রাখি,
তব অনিন্দ্য শোভার লাগিয়া অমুদিত মোর আঁখি;
জাগো এণাক্ষি! আঁখি মিলে চাও শোন গো একটি কথা,
তোমার লাগিয়া আমি আছি চাহি, হৃদয়ে গভীর ব্যথা।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

---

* ভিক্টর হিউগোর কবিতার ভাবে লিখিত।

বস্তুতন্ত্র নাটক।

বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-নাট্যশালা প্রধানতঃ বস্তুতন্ত্র নাটকগুলির অভিনয় দ্বারাই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। মিঃ স, মিঃ গ্রানভিল্ বার্কার, মিঃ আর্ণল্ড বেনেট এবং মিঃ গ্যাল্সওয়ার্দ্দি প্রভৃতি লেখকগণের অধিকাংশ নাটকই প্রধানতঃ বস্তুতন্ত্রতা-মূলক।

নাট্যকারেরা অন্ততঃ তিনপ্রকার উপায়ে মনুষ্য-চরিত্র অঙ্কিত করেন। প্রথম হইতেছে, আদর্শ-মূলক অর্থাৎ মনুষ্য চরিত্র যেমন হওয়া উচিত। দ্বিতীয় হইতেছে,—বস্তুতন্ত্রতা-মূলক অর্থাৎ মনুষ্য-চরিত্র যেমন সাধারণতঃ হয়, তাহাকে ঠিক সেইরূপভাবেই চিত্রিত করা; মানুষ 'পূর্ণ' নহে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারগণ তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্র-গুলিও 'অপূর্ণ' রাখেন। তাঁহাদের নায়ক-নায়িকা পূর্ণমাত্রায় বীর বা বীর-রমণী হয় না। বীর বা বীর-রমণী হইয়া তাহারা যে অমানুষিক বীর্য্য-প্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অজেয় থাকিবে, অপরে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না, এরূপ ভাবের চরিত্র তাঁহারা অঙ্কিত করেন না। আবার চরম দুর্বৃত্ত লোকের সৃষ্টিও তাঁহারা করেন না। প্রকৃত মানুষ যে একেবারে মন্দ হইবে, ভাল একটুও হইবে না, ইহা অসম্ভব! সেইরূপ মানুষের রূপ বা কু-রূপ আঁকিবার সময়েও তাঁহারা নায়ক-নায়িকাকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক সুন্দরী বা চরম মসীবর্ণবিশিষ্ট কদাকার করিয়া চিত্রিত করেন না। তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রে ভাল মন্দ উভয়ই মিশ্রিত থাকে। এই শ্রেণীর নাট্যকারগণ মনুষ্য-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা চরিত্র-সৃষ্টি করেন।

নাট্যকারের শ্রেণীভেদ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার ব্যতীত আর এক শ্রেণীর নাট্যকার আছেন, তাঁহারা কেবল কলাবিৎ অর্থাৎ কলা-কৌশল-প্রদর্শনের জন্যই তাঁহারা চরিত্র-সৃষ্টি করেন। যদি প্রথম শ্রেণার নাটকারদিগকে সুখবাদী বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারগণ দুঃখবাদী। ইঁহারা কেবল দুঃখ ও নৈরাশ্যের গানই গায়িয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবী সুখের স্থান

নহে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারগণ এইরূপ হইলে ইহা একরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে যে, তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যকারগণ প্রথম শ্রেণীর মত আদর্শ-প্রচারক নহেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মত দুঃখবাদীও নহেন; ইঁহারা কস্‌রৎ দেখাইবার জন্যই চরিত্র সৃষ্টি করেন। ইঁহারা যে কোন একটা নীতির প্রচারের জন্য নাটক লিখেন, তাহা নহে। ইঁহারা ইঁহাদের সৃষ্ট-চরিত্রে কেবল পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী ও চরিত্র-চিত্রণের কৌশলই প্রদর্শন করেন। সুতরাং ইঁহাদিগের নাটকের ভিত্তিও যে পর্য্যবেক্ষণ-জনিত অভিজ্ঞতার উপরে স্থাপিত, তাহা বলা যাইতে পারে।

উপরে নাট্যকারগণের যে তিনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শিত হইল, নিম্নে তাহাদের নামকরণ করিলাম। ইউরোপীয় নাটকের জন্মদাতা হইতেছে

শ্রেণীভেদে নামকরণ

গ্রীকজাতি। গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রথম নাট্যকারের নাম আর্সচিলাস্। ইঁহার নাটকে আদর্শ নীতি ও শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টি আদর্শ-মূলক। তাঁহার মতে মানুষ যেমন হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ভাবে চরিত্র-সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের ভিতরেও যে ঐশ্বরিকতার সমাবেশ করা যাইতে পারে, তাহা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউরিপাইডেস্ তাঁহার নাটকে যে সকল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে নর-নারীর স্বাভাবিক মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি আপনার চোখে মানুষকে যেমন ভাবে দেখিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আর্সচিলাস যেরূপ ভাবে উচ্চাদর্শ-মূলক মানব-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইউরিপাইডেস তাহার দিক্ দিয়াও যান নাই। তাঁহার নাটকে নৈতিক শিক্ষা-প্রচারের কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, এবং মানুষে ঐশ্বরিক গুণাবলীর সমাবেশও তিঁনি করেন নাই। বরং তিনি আর্সচিলাসের বিপরীতই দেখাইয়াছেন। দেবতাদের চরিত্রে মানুষের আচার-ব্যবহার ও কার্য্য-কলাপের সমাবেশ করিয়াছেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য,—জনসমাজে দেবতাগণের অন্যায়ত্ব, স্বেচ্ছাতন্ত্রত্ব ও সঙ্কীর্ণত্ব-প্রদর্শন। তাঁহার নাটক-সৃষ্ট নর-নারী ঠিক সাধারণ মানুষেরই মত, এরূপ সৃষ্টি মনুষ্য-সমাজ-পর্য্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতারই ফল। তাঁহার নাটকেও অল্প-বিস্তর দুঃখবাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আর্সচিলাস ও ইউরিপাইডেস্ ব্যতীত সফোক্লিস্ নামক আর একজন খ্যাতনামা গ্রীক নাট্যকার আছেন। তিনি তাঁহাদের দুইজন হইতে বহুলাংশে ভিন্ন। উঁহাদের দুইজনের মত তাঁহার নাটক আদর্শ বা বস্তুতন্ত্রতা-মূলক নহে; তাহাতে কোথাও কোথাও একটু-আধটু আদর্শ প্রচারিত হইয়া থাকিলেও সর্ব্বত্র কলাকৌশল,—চরিত্রাঙ্কন-শিল্পের নিপুণতা বিদ্যমান।

বস্তুতন্ত্র ও আদর্শমূলক নাটক।

উপরে দৃষ্টান্ত দ্বারা তিন শ্রেণীর নাট্যকারগণের বিষয় বর্ণিত হইল। এইবার বস্তুতন্ত্র ও আদর্শ-মূলক নাটকের কথা আরম্ভ করা যাউক। যে নাট্যকার মানুষকে কোন আদর্শানুযায়ী অঙ্কিত করেন, তাঁহার নাটক আদর্শমূলক হয় আর যিনি মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র স্বীয় নাটকে চিত্রিত করেন, তাঁহার নাটক বস্তুতন্ত্র হয়। বর্ত্তমান যুগের নাট্যকারদিগের মধ্য হইতেও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। টলষ্টয়ের "রিসরেক্সন" (Resurrection) নামক নাটক আদর্শ-মূলক। এই নাটকে টলষ্টয় আদর্শ-প্রচারক ও লোকশিক্ষকরূপে অবতীর্ণ। বস্তুতন্ত্র নাটকের কথা পরে বলিতেছি। তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যকারদিগকে আলেখ্যকার বলা যাইতে পারে। ইঁহারা ফোটোগ্রাফার বা আলোকচিত্রকারদিগের সহিত তুলিত হইতে পারেন। ইঁহারা মোটেই লোকশিক্ষক বা নীতি-উপদেশক নহেন, তবে ফোটোগ্রাফারদের মত ইঁহাদের বিষয়-নির্ব্বাচন-শক্তি অসাধারণ। ইঁহাদের চরিত্রাঙ্কণ-নৈপুণ্য এরূপ চমৎকার যে; ইঁহারা যে চিত্রটী আঁকেন তাহা নিরর্থক হয় না। ইঁহাদিগকে নাট্য-চিত্রকর-আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর নাট্যকারদিগের একচ্ছত্র সম্রাট্—সেক্সপীয়র। তাঁহার নাটকে 'রোমান্সে'র পূর্ণ প্লাবন আছে এবং স্থানে স্থানে যে আদর্শের প্রচারও হয় নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি যেমন নিপুণতার সহিত মানব-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমন সজীব ও স্বাভাবিক মানব-চরিত্র আর কোন নাট্যকার অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রে কোথাও ব্যক্তিগত ভাবের ছায়াপাত হয় নাই; অথবা বিদ্যা জাহির করিবার জন্য বা নিরর্থক ভাবে কোথাও নীতি-উপদেশের প্রচার করেন নাই। তিনি কেবল ঘটনার চিত্রই পাঠকের নয়ন-সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন, ঘটনার ফলাফল কিরূপ হইতে পারে, সে চিন্তার ভার পাঠকের উপরই অর্পণ

করিয়াছেন। একজন নিপুণ পর্য্যবেক্ষণক্ষম ও অভিজ্ঞ চিত্রকরের নিকট এই ঘটনা-বহুল পৃথিবী কিরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার প্রদর্শনই তাঁহার নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের পক্ষে কোন্ শ্রেণীর নাটক ভাল? এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, বস্তুতন্ত্রতামূলক নাটকই আমাদের পক্ষে ভাল এবং আমরা ইহাই চাই। এ যুগে সর্ব্বত্রই বস্তুতন্ত্রতার আদর। মনে মনে একটা উচ্চ আদর্শের পরিকল্পনা কেবল ফাঁকা আওয়াজ ও নিরর্থক বাক্যসমষ্টিমাত্র। ঐ সকল পুরাতন যুগের নাটক আমাদের মনে কেবল কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে, এবং সত্যের আলোক পাইলেই তাহা অপসৃত হয়। এইজন্যই বলিতেছি, বস্তুতন্ত্র নাটকই আমরা চাই।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্য তিন চারিটী পরিবর্ত্তনের যুগ অতিক্রম করিয়াছে। প্রথম যুগের নাট্যসাহিত্য একরূপ ছিল। তৎপরবর্ত্তী নাটকীয় যুগকে ফরাসী নাটকের অনুকরণের যুগ বলা যাইতে পারে। মোট কথা, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বরের পূর্ব্বে ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার আবির্ভাব হয় নাই। এইদিন টম্ রবার্টসন-রচিত "সোসাইটী" বা "সমাজ"-শীর্ষক একখানি নাটক 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই নাটকখানি যে খুব ভাল হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু ইহা যে বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, নাট্যকার রবার্টসন যে বোহিমিয়ান জাতির চরিত্র তাঁহার নাটকে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন।

ইংলণ্ডে প্রথম বস্তুতন্ত্র নাটক।

রবার্টসনের নাটক অভিনীত হইবার কুড়ি বৎসর পর পর্য্যন্ত এমন কোন নাটক বাহির হয় নাই, যাহাকে বস্তুতন্ত্র বলা যাইতে পারে। রবার্টসনের পরেও বড় বড় ইংরাজ নাটক-কার ফরাসী নাটকের অনুকরণে নাটক রচনা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।

এইবার আমরা প্রকৃত বস্তুতন্ত্র নাটক-সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে নাট্যকার প্রকৃত বস্তুতন্ত্রতামূলক নাটক রচনা করিবেন, তাঁহাকে স্বদেশ, স্বজাতি এবং যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই

যুগ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। নাটক-রচনার পূর্ব্বেই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক জাতির এক নিজস্ব বিশেষত্ব আছে; তাহার কার্য্যকলাপ, তাহার আচার-ব্যবহার অন্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র। এই স্বীকারোক্তিটুকু করিলে বিজাতীয় আদর্শ-গ্রহণের পথে কাঁটা পড়ে। মোট কথা, বস্তুতন্ত্র নাটকে বিজাতীয় আদর্শ থাকিবে না; জাতীয় ভাব এবং বর্ত্তমান যুগের ঘটনাবলী লইয়াই নাটক রচনা করিতে হইবে। এ যুগের বস্তুতন্ত্র নাটকে সত্য গোপন করা একেবারেই চলিবে না। কোন কু-চরিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে তাহা যথাযথরূপেই আঁকিতে হইবে, কোন স্থান অতি কুৎসিত বলিয়া ঢাকিতে গেলে চলিবে না।

হেনরিক ইব্‌সেনের সামাজিক নাটকসমূহে উল্লিখিত প্রকারের বস্তুতন্ত্রতা ছিল। সেগুলি যখন লণ্ডনে অভিনীত হয়, তখন সকলেই প্রকাশ্যভাবে উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নাটকের জন্য একটী বড় উপকার হইয়াছিল,—তাহা তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যের স্বরূপ-পরিবর্ত্তন। ইংরাজী নাটক-রচনায় যে পরানুচিকীর্ষার প্রভাব ছিল, ইবসেনের নাটকাবলী তাহা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহার পর—সেণ্ট জেমস্ রঙ্গমঞ্চে জর্জ্জ আলেক্জাণ্ডারের "দি সেকেণ্ড মিসেস্ ট্যাঙ্কোয়েরে" নামক নাটকাভিনয়ের পর হইতে ইংলণ্ডীয় নাট্যসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার সম্প্রসারণ হইতে থাকে। তদবধি ইহার গতি উন্নতির অভিমুখেই চলিয়াছে।*

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

---

* "Fortnightly Review" (May, 1913) নামক মাসিক পত্রে Mr. W. L Courtney কর্ত্তৃক রচিত "Realistic Drama" নামক প্রবন্ধাবলম্বনে।

গিরিশ-বাণী।

(তত্ত্বকথা।)

আত্মদর্শনে।

আত্মদর্শনে যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, যাঁহার মন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া নিষ্কম্প দীপের ন্যায় অবস্থান করে, তাঁহারই কেবল কর্ম্ম থাকে না।

গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম।

গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের উচ্চ মাহাত্ম্য এই যে, জগতে এমন কেহই হীন নাই, যে হরিনামের অধিকারী নয়; এমন কেহ অবকাশশূন্য নয়, যে একবার হরিনাম করিতে না পারে; এমন কেহ সংসার-জালে জড়িত নয়, মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা শ্রবণে যাহার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ না হয়; বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক, এমন কঠোর হৃদয় কাহারও নয়, যে হৃদয় লীলারসামৃতে দ্রবীভূত হয় না এবং একবার সেই কঠোর হৃদয় কোমল হইলে বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভক্তি-কমল প্রস্ফুটিত করে।

বৈষ্ণব।

বৈষ্ণব কি বর্ণনা করিতে হইলে যেমন রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবান্‌কে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল; বৈষ্ণব কি, বর্ণনা করিতে হইলে আবার তাঁহার দেহ-ধারণের প্রয়োজন। বৈষ্ণব—বৈষ্ণব।

শ্রীকৃষ্ণ।

তিনি অতি নিষ্ঠুর, অতি ক্রূর, অতি কপট, অতি সকল কথাই বলিতে পারিব, কিন্তু দীননাথ নয়, বলিতে পারিব না। দীনের দাস, একথায় তাঁহার গুণের ব্যাখ্যা। তাঁহার জীবনে সকলকে পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি. কেবল দীনকে পরিত্যাগ করেন নাই, এমন নহে—দীনের দাসত্ব করিতে দেখিয়াছি। দীননাথ বা নিষ্কাম একই কথা।

দুঃখ।

রিপুর তাড়নাই দুঃখ, স্বার্থ থাকিলে সে তাড়না ঘুচিবেই না।

সেবাধর্ম্ম।

যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য, ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তির ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে।

ঈশ্বর।

যিনি যত বড় নাস্তিকতা প্রকাশ করুন, যতই তর্ক করিয়া ঈশ্বর উড়াইয়া দিন,—রোগ, শোক, বিপদ, মৃত্যুভয়-পরিপূর্ণ সংসারে তাঁহার একবার না একবার একটা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়।

অদৃশ্য শক্তি।

ইষ্ট বা অনিষ্ট শক্তি নিয়তই সংসারে প্রবাহিত হইতেছে; ইহা যিনি দেখিতে না পান, তিনি সংসারক্ষেত্রে নিদ্রাবস্থায় চলিতেছেন। এ অদৃষ্ট শক্তি কোথা হইতে আসে, তাহা তিনি স্থির করিতে অসমর্থ; কিন্তু এ শক্তি রহিয়াছে, সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইহা অস্বীকার করিবার তর্ক আজিও সৃষ্টি হয় নাই।

কর্ত্তা কে ?

আমি কর্ত্তা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য হয় নাই, একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর আমার কার্য্যে অধিকার দিন, কিন্তু ফলাফল ও কার্য্যগরিমা তাঁর, "আমার" যেন স্বপ্নেও না বলি।

ধ্যানে বিঘ্ন।

ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতেছ মনে করিবে; কিন্তু কোন যদি বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে, তোমার মহাবিঘ্ন হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে "ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।" ধ্যানস্থ বাসনা আশুফলপ্রদ, সে ফল—অতি কুফল। অবিদ্যার ফল—মানবকে নিরয়গামী করিবার ফল।

ধর্ম্মই ভারতের জীবন।

ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জন এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয়

উন্নতির ভিত্তি, ভারতের ধর্ম্মও সেইরূপ। ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতে উন্নতির প্রত্যাশা বিফল, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না।

প্রেম।

জগতের উৎপত্তি প্রেমে, প্রেমই জগতের ভিত্তি, সেই প্রেমে অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়।

আমি।

রাখ্‌লেই থাকে, ছাড়লেই ছাড়ে। দেখ্‌ছ কি মজার 'আমি'! নেই বল্লেই খুঁজে পাবে না, আর আছে বল্লেই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমি। কি ধাঁধাঁ! বুঝ্‌লে বুঝ্‌তে পার, না বুঝ্‌লে কেউ বোঝাতে পারে না। ঘোরাচ্ছে আমি, অহং, অভিমান, ঘুর্‌ছেও আমি, ঘোরাচ্ছেও আমি, আমি আমার খুঁজে ঘুরে মর্‌ছি, আমি ছাড়্‌লেই ঘোরাঘুরি ফুরায়।

গৃহীর বিপদ।

আমার সুমতি কুমতি দুই স্ত্রী, ঘরের ভিতর দিবারাত্র ঝগড়া করে, আমি দুই সতীনের মাঝে পড়ে নিরন্তর সারা হচ্চি। কুমতির ছটি সন্তান আমার শত্রু, সুমতির দুটি ছেলে বিবেক বৈরাগ্য কখনও আপনার ব'লে আমায় টানে। কিন্তু ছটা ছেলে আমায় আটটা শিকলিতে বেঁধে রেখেছে, আমার নড়্‌বার-চড়্‌বার যো নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল।

কারণমূলে কি রহস্য আছে বলা যায় না কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যশোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের পরিসর না বাড়িয়া স্থলবিশেষে যে জিনিসটা বাড়ে তাহা বিবর্ত্তন-প্রচ্ছন্ন লাঙ্গুলের পরিমাণ ও পরিধি। এরূপ অবস্থায়

যাহা কিছু লিখিতে চেষ্টা করা যায় তাহাতে যশস্বী, দেশ ও জাতির পক্ষে গৌরবের কারণ না হইয়া লজ্জারই আধার হইয়া দাঁড়ায়।

একজন ইংরাজ লেখিকা যশ জিনিসটাকে 'Fickle, fleeting and as transitory as rainbow' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই যশ আমাদের যশস্বীদের মধ্যে কেন যে 'নিরাকার ব্রহ্ম' অপেক্ষাও সত্য ও নিত্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার একটী কারণ এই যে, যশ বস্তুটীও সাকার নহে এবং মাসিকের হাটে ঢ্যাটরা পিটাইয়া যে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা আর যাহাই হউক, 'ব্রহ্মসাধনা' নহে।

মহাত্মাদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণের মধ্যে 'যশে অভিরুচি'ও একটী গুণ বটে, কিন্তু অসরল উপায়ে ইহা অর্জ্জন করা এবং তাহা লইয়া সমাজের ভিতর লাফালাফি করাও যে প্রকৃতিসিদ্ধ, এ মিথ্যা সত্যরূপে চলিয়া যাইবার জন্য লিখন-চাতুরীর অপেক্ষা রাখে। যাঁহারা প্রতিভার গর্ব্ব রাখেন তাঁহারা চেষ্টা করিলে এই "নূতন কথা নূতন ধরণে" বলিয়া পত্রিকা-বিশেষের উদ্দেশ্যকে সফল এবং আপনাপন ভবিষ্যৎকে 'সবুজ' করিয়া যাইতে পারিবেন। অবশ্য সেটা মানব-সমাজের মধ্যে নহে—কারণ, "সবুজ (বৃক্ষ) পত্র" যাহাদিগের নিকট উপাদেয় আহার্য্য, তাহারা দ্বিপদ নয়।

পত্রিকার লেখক না হইলে মানুষ যেমন পত্রিকার সমালোচক হইয়া উঠে, সেইরূপ হিন্দুসমাজে আমল না পাইয়া অনেকেই আজকাল হিন্দুসমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সংস্কারক দু'একজন দেখা যাইতেছে, যাঁহারা হিন্দুত্বের শুভ কামনায় হিন্দুসমাজ অপেক্ষাও অধিক দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হইয়া, "মা'র চেয়ে যা'র দরদ বেশী" ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যটীকে সফল করিয়া তুলিতেছেন। ইঁহাদের ধারণা, "কতকগুলি বিশেষ কারণে" (বিশেষ কারণবশতঃ, এই 'বিশেষ কারণ' উহ্য রাখা হইয়াছে) "হিন্দু তাহার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে; সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের অবস্থা বেশ সহজ নাই। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুই বিধাতার চরম কীর্ত্তি এবং এই সৃষ্টিতেই সমগ্র শক্তি নিঃশেষ করিয়া স্রষ্টা হাত গুটাইয়াছেন, ইহাই হিন্দুর বুলি।" এই ধারণার পশ্চাতে "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" স্বাক্ষরে যে মানুষটী আছেন, তাঁহার অবগতির জন্য হিন্দু বলিতে পারেন—হিন্দুর হিন্দুত্ব-চেতনাকে বিদ্রূপ-

বিকৃত করিয়া বিবেক-সম্প্রদায়ের করতালি লাভ করার সুবিধা ঘটিলেও হিন্দুকে কলমের খোঁচায় কাবু করা সহজ না হইতেও পারে।

বাস্তবিক যদি হিন্দু মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মত জাতি, তাঁহাদের দেশের মত দেশ অথবা তাঁহাদের ধর্ম্মের মত আদর্শ ধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিরল, তাহা হইলে তিনি নূতন কিছুই করেন নাই—সকল জাতি ও সকল দেশের noble weakness যে ধারণাকে বুকে রাখিতে চায়, তাহাই মাত্র করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু যদি মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার কাব্যগুলির মত কাব্য বা তাহার অবলম্বিত আদর্শের মত ধ্রুব আদর্শ দুর্ল্লভ এবং যাঁহারা এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহারা অরসিক—তাহা হইলে হিন্দুর মত একটা সুবৃহৎ জাতি যে আপন গৌরব-সম্বন্ধে কতকটা চেতন থাকিবার অধিকার রাখিবে, ইহা কি বড়ই বেশী কথা? 'গীতাঞ্জলি' অপেক্ষা 'হিন্দুত্ব' লইয়া বিশ্বে কি যথেষ্ট অধিক আন্দোলন হয় নাই? ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা আপনাকে বড় মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন আপত্তি নাই, কিন্তু একটা বিশাল সমাজ ও জাতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেও লজ্জা অনুভব করেন না, আপনাকে এত বড় ভাবিবার কারণ কি? 'উঠিয়াছে', 'তাহার', প্রভৃতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বাক্যে হিন্দুসমাজ-শরীরে অবশ্যই ফোস্কা পড়িবে না, কিন্তু আনন্দসর্ব্বস্ব ঋষিবরের 'সকল কাঁটা ধন্য' করিয়া ফুল কি এইরূপেই ফুটিবে?

স্বীকার করি, হিন্দুর তথাকথিত ধারণা সপ্রমাণ করে যে, 'বিশ্ব-প্রীতি' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আজও হিন্দুসাধারণের আপন হয় নাই এবং এই জন্যই তাঁহারা হিন্দুত্ব-সংস্কারের ন্যায় স্বজাতি-নিন্দায় সহস্র-ফণ-প্রবন্ধাদি ফাঁদিবার অবস্থা স্বীকার করিয়া আত্মবিক্ষোভ ঘটাইতে চাহেন না; তথাপি, একটা কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, হিন্দু হিন্দুত্বকে বিধাতার 'কীর্ত্তি' মনে করেন, 'কলঙ্ক' ভাবেন না, এবং এ সম্বন্ধে সংস্কারকদলের কোনও বিশেষ কারণ-প্রসূত আপত্তি থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

বিশ্ব-জাতীয়তা ও বিশ্ব-প্রেম, খণ্ড জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেম অপেক্ষা অনেক বড় জিনিষ হইলেও, বিন্দুমাত্র বিরোধী জিনিষ নহে; সুতরাং বিশ্ব-প্রীতির বংশ-খণ্ড লইয়া যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতিকে দণ্ড দিতে আসেন, তাঁহারা স্বজাতি-বৎসল ত নহেনই, অধিকন্তু বিশ্ব-প্রীতিরও ভাণ করিয়া থাকেন। এ সত্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সংস্কারক মহাশয়দিগের না থাকিলেও, এ সত্যকে চিনিয়া লওয়া হিন্দুর পক্ষে কঠিন নহে।

হিন্দুত্ব লইয়া হিন্দু যদি আজ উত্তেজিতই হইয়া থাকেন, তাহাতে দুশ্চিন্তার কারণ ত কিছুই দেখি না ; ছারপোকার কামড়ে মানুষ যখন উত্যক্ত হইয়া উঠে, তখন ভবিষ্যৎ, ছারপোকার পক্ষে শুভ না হইলেও মানবের পক্ষে আরামপ্রদই হয়। এ কথা সত্য যে, ঐ উত্তেজনা-সম্বন্ধে হিন্দুর মনোভাব সহজ অবস্থায় নাই, আর উত্তেজনা মানবমাত্রেরই একটা সাধারণ প্রকৃতি ; তবে কথা এই, যে সকল মহাত্মা গায়ে পড়িয়া এই সমাজকে উপদেশসুধা পান করাইতে আসেন, তাঁহাদের মনের ভাবই যে বেশ সজ্ঞান, সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এমন প্রমাণও হিন্দু পান না ; যাহা পাইয়া থাকেন, তাহা তথাকথিত সুধায় উগ্র সুরার গন্ধ।

বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মাঝখান হইতে আপন জাতি-ধর্ম্ম মুছিয়া ফেলিয়াও যাঁহারা বিদেশকে কৃতজ্ঞতার দাম দিতে প্রস্তুত, একটা আকস্মিক মোহে সমাজ ও স্বজাতির সমস্ত শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য আগ্রহান্বিত এবং আপনাপন আনন্দ-সৃষ্ট (?) প্রবন্ধে ও গল্পে, কবিতায় ও বক্তৃতায় ঐ একঘেয়ে সংস্কারের কণ্টকবর্ষণে হিন্দুর চরণতল ভূমি কণ্টকিত করিতেই উদ্যত, তাঁহাদের মত সংস্কারের জন্য হিন্দু যে গৌরববোধ করিবে না, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যটা কোন্‌খানে ?

প্রীতির অভাবই শৃঙ্খলাকে মানুষের নিকট শৃঙ্খল করিয়া তোলে এবং প্রীতির প্রাচুর্য্য শৃঙ্খলকেও পুষ্পডোর করিয়া আনে। কাব্যরসে যাঁহাদের চিত্ত মসগুল্, কাব্যের সার্থকতা তাঁহারই উপলব্ধি করিতে সমর্থ—অন্যের নিকট তাহার প্রকাশ-শৃঙ্খলা শৃঙ্খলেরই নামান্তর। তানসেন যে হিসাবে মেঠো সুর তৈয়ারী করিতে নারাজ সমাজও ঠিক সেই হিসাবে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে অশক্ত। রস-পিপাসুকে 'যেমন যত্ন করিয়া, শিক্ষা করিয়া' এক কথায় আপনাকে গায়কের উপযোগী করিয়া 'ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ' করিতে হয়, 'নিজের খেয়ালমত সেটাকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিলে চলে না'—ব্যক্তিকেও সেইরূপ শ্রদ্ধানত হইয়া ও ভালবাসিয়া সমাজ-তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়. ফুঁ দিয়া উড়াইবার বাতুলতা প্রকাশ করিলে চলে না। আক্ষেপের বিষয়, যাঁহারা হিন্দুসমাজের জন্য দুশ্চিন্তায় অতিরিক্ত কাতর, প্রয়োজনের খাতিরে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া অস্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আত্ম-রচিত উপন্যাসে * সেই সম্প্রদায়ের ভিতরই আদর্শ গড়িবার চেষ্টা করিয়া, কল্পিত-

* প্রবন্ধলেখক সম্ভবতঃ 'গোরা' উপন্যাস-সম্বন্ধেই এই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

'অর্ঘ্য'-সম্পাদক।

দুর্ব্বল-ভিত্তি হিন্দুত্বগৌরবকে সেই আদর্শ-গুরুর চরণ-মূলেই পরিণতি দিতে চান। স্বীকার করি, এটা Technical মারপ্যাচ মাত্র এবং আদর্শের ভিতর যে নিত্যতা আছে তাহা সম্প্রদায়, দেশ বা জাতিগত নহে—তথাপি বিশেষভাবে একথা উল্লেখ করিবার কারণ ইহাই প্রদর্শন করা যে,উদারচেতা (?) লেখকও এ সঙ্কীর্ণতাটুকু এড়াইতে পারেন নাই। এক্ষণে, এমন কথা যদি কোথাও পাই, "কবির অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহা হিন্দুর আদর্শ বা ইংরাজের আদর্শ নয়" তাহা হইলে সেই ধ্রুব আদর্শকে কবির "সম্প্রদায়িক আদর্শ" বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না ? যদি যায়, তবে জিজ্ঞাস্য—দু'দিনের একটা সম্প্রদায়ের উপর উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত কবির মমতা যখন এত অধিক যে, তাঁহার 'অন্তরের ধ্রুব আদর্শ' উহারই মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, তাহা হইলে কালজয়ী হিন্দু-সমাজ তাঁহার উন্মাদ আপত্তিতে হাস্য করিবে না কি ?

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে দেখিতেছিলাম, "যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে......তাহারা আর কোনো কাজ না পাইয়া নিজেদের উদ্বৃত্ত উদ্যম ও তেজ সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে, কাজ করিবার জন্যই যাহাদের জন্ম, কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার জন্যই তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সমাজের চোখে ঠুলি বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া উহারা বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়।"

রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত"—ইত্যাদি।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড ঘানি এবং প্রজ্ঞাচক্ষুতে ঠুলি পরিয়া অনেক রবীন্দ্র ভবেন্দ্র অকালে কুকাজে ঘুরিয়া মরিতেছেন ; কেহ কাব্যের ঘানি টানিয়া 'অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস' (না তৈল ?) বাহির করিয়া বলিতেছেন—"ক্রয় কর, এমন রস আর নাই" এবং এ বিষয়ে ক্রেতা সংশয় প্রকাশ করিলে পাত্রদাতে সাধন-মঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মেছুনী-সুলভ বিবাদ বাধাইতে ছুটিতেছেন—ইত্যাদি। এ সকলের তুলনায় হিন্দুসমাজকে না হয় বলদ বলিয়াই শিরোধার্য্য করা গেল, কিন্তু কল্পনাপটু লেখক যদি ঐ ঘানির 'পবিত্র স্নিগ্ধ

তৈল' দ্বারা আপনার উত্তাপ-প্রমত্ত মস্তক সিক্ত করিয়া ধীর চিন্তার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে 'কেন্দ্রীভূত-লক্ষ-চিত্ত'-সম্বন্ধে এই নির্লজ্জ বিদ্রূপ উচ্চারণ করিতেও পারিতেন না। সমাজের অধিকাংশ লোকই যদি লেখকের ন্যায় প্রেমিক হইয়া "কাহাকেও না মানিতে এবং সকলেই মানাইতে চায়" তাহা হইলে মানব-জগতের ভবিষ্যৎ কোথা গিয়া দাঁড়ায়, একবার কল্পনা করুন দেখি। অত কথায় কাজ কি, এই যে একজন নবীন লেখক আজ আপনার মত না মানিয়া আপনার বিদ্রূপ-ঋণ পরিশোধ করিতেই বসিয়াছে, ইহাতে আপনার সমস্ত অন্তর সুখী হইয়া উঠিয়াছে কি ?

লেখকের আক্ষেপ—"আমাদের সমাজ একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা—অভ্যাসবশে মানিয়া চলা তাহাদের (এখানে আর 'আমাদের' নহে ; লেখক ও তাঁহার মতানুবর্ত্তিবর্গ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিরাই এস্থলে উদ্দিষ্ট) আশ্চর্য্য দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে ; যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই, সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না।" বটে !

আচ্ছা, ধরা গেল—প্রত্যেক লোকসমাজ শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, কাহাকেও মানিব না, কাহারও কথা গ্রাহ্য করিব না, সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিব ;—তারপর ? আশা করি, লেখকের এমন কোনও নিগূঢ় ইচ্ছা নাই যে, অতঃপর সকলে তাঁহাকেই মানিবে ? যদি থাকে, সেটা সদিচ্ছা নয়, কারণ বিশ্বস্রষ্টার তিনিই যে বিশেষ আত্মীয় এ ধারণা তাঁহার মনে যতই বদ্ধমূল থাক, অন্যের ইহাতে আপত্তি থাকাই সম্ভব। এক্ষণে এই স্বাধিকার-মত্ততার ফলে, প্রভাসতীর্থ যে যদুকুলের শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইবে না, তাহার প্রমাণ কি ? দুষ্ট লোকে বলে, 'মাসিদের' ইচ্ছাই তাই ; আমরা একথা বিশ্বাস করি না।

অন্যান্য সকল সমাজেরই মত হিন্দুসমাজের ভিতরও ত্রুটী আছে, অপূর্ণতা আছে, সন্দেহ নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের আদর্শ যত বড়ই গরিমাময় হউক, হিন্দু-সমাজ মানব-সমাজমাত্র ; মানুষ যখন স্বয়ং ধর্ম্মাবতার নয়, পরন্তু ধর্ম্ম-সাধক তখন তাহাদের সমাজও ধর্ম্ম-সাধনক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিন্দুসমাজে নিষেধ আছে, মানা আছে—কোন্ সমাজে নাই ? যদি এমন কোনও সমাজ থাকে যাহা বাধা-নিষেধকে চিন্তার মধ্যে আনে না, তবে সে উচ্ছৃঙ্খলের সমাজ সুতরাং শৃঙ্খলিত সমাজ (যদি হিন্দুসমাজ তাহাই হয়) অপেক্ষাও ভয়ানক। সকল সমাজের মানা বা নিষেধ একই দিকে একই উদ্দেশ্যে কাজ

করে না—সেইজন্য অন্যান্য সমাজে রাজকীয় আইন প্রধান আর হিন্দুসমাজে শাস্ত্রানুশাসন প্রধান; এ অপরাধে হিন্দুর হৃদয়-স্পন্দন থামে নাই বা প্রাণের প্রাচুর্য্যও নষ্ট হয় নাই। বাধা ও নিষেধ না থাকিলে প্রাণবস্তু যে দণ্ডকালও তিষ্ঠিতে পারে না! ভূমিপৃষ্ঠ বাধা দেয় বলিয়াই অঙ্কুর আপনার তেজে তাহা অপসারিত করিয়া বৃক্ষরূপে গজাইয়া উঠে—বাধা আছে বলিয়াই পাষাণ ফাটাইয়া নির্ঝর ছোটে এবং বাধা পায় বলিয়াই তাহার ক্রমবিবর্দ্ধিত বেগ নানা-রূপে প্রবাহিত হইয়া চলে—বাধা থাকে বলিয়াই 'ঢাউস্ ঘুড়ি' বায়ুস্তরের উপর সঙ্গীত সৃষ্টি করে—বাধা থাকা অপরাধ নহে।

ত্রুটী ও অপূর্ণতা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও হিন্দুসমাজ আপন বিশেষত্বকে বিশ্বের ধুলায় লুটাইয়া দিতে আপাততঃ প্রস্তুত নহে—এজন্য যত সংস্কারক যত পারেন কান্নাকাটি করুন। সমগ্র সৃষ্টির যে একটী মহৎ পরিণাম আছে, সকল দেশের সকল জাতি যে একদিন বিশ্বজাতিত্বে পরিণতি লাভ করিবে এবং সকল খণ্ড ধর্ম্ম যে একদা বিশ্বধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে, এ ধারণা রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ লেখকগণ লেখনী ধারণ করিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে এবং হিন্দুর তাহা অবিদিত নাই; কিন্তু কোন্ দেশের আবিষ্কৃত আদর্শমূলে বা কোন্ জাতির সাধনা-লব্ধ ধর্ম্মজ্ঞানের গগন-চুম্বি-পতাকা-তলে সমগ্র বিশ্ব সান্ত্বনা-লাভার্থ সম-বেত হইবে তাহা আজও স্থির হয় নাই। আপন বিশেষত্বে দৃঢ় থাকিয়া হিন্দুও এই মীমাংসার প্রতীক্ষা করিবে। জাতি ও জাতিগত ধর্ম্মের পরস্পর মিশ্রণে অধ্রুব যাহা তাহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির ভিতর হইতে খসিবেই—সামাজিক আচার-ব্যবহার অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইবেই এবং তাহা যে হইতেছে না এমনও নহে—মাঝে পড়িয়া যাঁহারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বাহাদুরি লইতে চাহিবেন, তাঁহারা বিনিময়ে 'রসগোল্লার ঠোঙ্গা' ত পুরস্কার পাইবেনই না, উপরন্তু জাতিকে আপন পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে চেতন ও শক্ত করিয়া তুলিবেন। আঘাত করিয়া ক্ষুদ্রকেই নত ও ভীত করা যায়, যে সর্ব্বাংশে বৃহৎ ও মহৎ তাহাকে আঘাত করিলে প্রত্যাঘাত ত পাইতে হয়ই, তদ্ব্যতীত আত্ম-সঙ্কীর্ণতাকে অনর্থক প্রকট করা হয়;—ব্যক্তিত্ব কোনও কালেই সমাজকে জয় করিতে পারে নাই বা পারিবে না; সমাজ অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করা এবং ভাবে-ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করা মস্তিষ্কের সহজ অবস্থা নহে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

স্বর্গীয় হরিদাস গুপ্ত।

[জন্ম—কার্ত্তিক, ১২৭৭ ; মৃত্যু—আষাঢ়, ১৩২১]

এ শোকবার্ত্তা স্বদেশের কোন বীরের মৃত্যু জ্ঞাপক নহে, অথবা ইহা কোন ধনকুবের বা মহাপণ্ডিত, নৃপতি বা সর্ব্বত্যাগী ধর্ম্মাত্মার মরণ-বিবরণ বহিয়াও আনে নাই যে, উচ্চ কোলাহলে ইহা আপনাদের গোচর করিব। এ যাঁহার শোক-কাহিনী, তিনি ক্ষুদ্র যূথিকার মত ক্ষুদ্র বনস্থলীকে আমোদিত করিয়া আকস্মিক প্রবল বাত্যায় অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সুরের রেশটুকুর মত তাঁহার সৌরভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

জন্মিয়াছি যখন, তখন মরণ ত হইবেই, কালেই হউক আর অকালেই হউক। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধানে মানুষের যে আয়ুষ্কাল আছে, সেটুকুর যিনি সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতে পারেন, তিনি ক্ষুদ্রই হউন আর বৃহৎই হউন, সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। হরিদাসবাবুর জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবধানে মাত্র ৪৪ বৎসর—ইহার ভিতরে কেবল তাঁহার শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের প্রাক্কাল আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—প্রৌঢ়ত্বের পরিণত অবস্থা ও বার্দ্ধক্যলাভের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ যে অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ পরিণতি হয়, হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়, মানুষ অভিজ্ঞতা-লাভের প্রকৃত অবসর পায়, সংযমের অধিকারী হইয়া তাহার চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিতে পারে, হরিদাসবাবুর অকাল মৃত্যু সে সকল তাঁহাকে লাভ করিতে দেয় নাই। দিলে কি হইত বলিতে পারি না, কিন্তু কৈশোর, যৌবন ও প্রথম প্রৌঢ়ত্বে, যখন মানুষ ত্যাগ অপেক্ষা ভোগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে, তখন তিনি ভোগের ভিতর থাকিয়াও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। এইখানেই হরিদাসবাবুর স্বাতন্ত্র্য, এইখানেই তাহার মরণের গৌরব।

হরিদাসবাবু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন,—মৃত্যুর সময়ে তিনি যুক্তপ্রদেশের সহকারী একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল ছিলেন। নিম্নপদ হইতে প্রতিযোগিতার যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি শনৈঃ শনৈঃ এই উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং অভাবের তাড়না ও প্রাচুর্য্যের স্বাচ্ছন্দ্য উভয়ই তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। এ অবস্থায় মানুষের স্বার্থপরতা তাহাকে প্রাচুর্য্যের

স্বাচ্ছন্দ্য একাকী উপভোগ করিতেই প্রলুব্ধ করে। কিন্তু হরিদাসবাবুর হৃদয় এ ধাতুতে গড়া ছিল না। তিনি অপ্রতুলতার দিনে তাঁহার একান্নবর্ত্তী পরিবার সকলকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, প্রতুলতার দিনেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। দৈন্য ও সম্পদে হরিদাসবাবুর হৃদয়ে বিচলতা দেখা যায় নাই। ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থকেই তিনি আপনার হৃদয়ে উচ্চাসন দিয়াছিলেন।

হরিদাসবাবুর পরার্থপরায়ণতা তাঁহার সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে সৃষ্ট হইয়া উহার চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ থাকে নাই, উহা পরিজন-পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বান্ধব-সমাজে, পরিচিত-মণ্ডলীতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই তাঁহার মৃত্যুতে কেবল তাঁহার পরিজনবর্গই শোকে মুহ্যমান্ হন নাই, তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতগণও চোখের জল ফেলিয়াছিলেন।

হরিদাসবাবুর জীবন সংযমের জীবন,—এখানে কোন কিছুরই বাহ্বাস্ফোট ছিল না। তিনি পরের উপকার করিতেন, কিন্তু কোন দিন তাহার জন্য ঢক্কা-নিনাদ করেন নাই। তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিল, কিন্তু তাহা লইয়া কোন দিন গৌরব করিতে শুনি নাই। পদমর্য্যাদাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেজন্য কোন দিন তাঁহাকে স্ফাতবক্ষ দেখি নাই। তিনি স্থির ধীর শান্ত নীরব সদানন্দ ঈশ্বর-বিশ্বাসী পুরুষ,—সারল্যে শিশুর মত এবং বিনয়ে ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় ছিলেন।

বাঙ্গালীর সমাজ হইতে এই শ্রেণীর মানুষ একে একে চলিয়া যাইতেছেন। ফলে বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হরিদাস বাবু বড় ধর্ম্ম-বীর বা কর্ম্ম-বীর ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি সমাজের বেলাভূমিতে যে গভীর রেখা টানিয়া গিয়াছেন, সে রেখা প্রকট ও উজ্জ্বল রাখিতে পারিলে আমাদের সমাজ-জীবন উন্নত হইবে, উহার মঙ্গল হইবে।

বিধাতা হরিদাসবাবুকে ডাকিয়া লইয়াছেন! পঙ্কিল পৃথিবী হইতে আজ তিনি বহুদূরে! শোকাহত আত্মীয়-স্বজন হাহাকার করিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্, বঙ্গসাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক 'অর্চ্চনা'-সম্পাদক শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্ত শোকে মুহ্যমান। ভগবান ইঁহাদের শোক অপনোদন করুন।*

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

---

* গত মাসে স্থানাভাবে ইহা প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য দুঃখিত।

শক্তি-ভিক্ষা।

(টেনিসনের ছায়া)

প্রচণ্ড, স্বাধীন, মুক্ত, হোক্ সুপ্ত প্রাণশক্তি মম,
নিনাদিত উৎস হ'তে প্রতিধ্বনি-মুখর প্রান্তরে
আছাড়িয়া-ছুটে-চলা অনাহত-গতিবেগভরে
নিঃসঙ্গ বিশালবক্ষ খরস্রোতা স্রোতস্বিনী-সম !
নিত্য-বিবর্দ্ধিত-তেজে অবিশ্রান্ত সম্মুখে ছুটিয়া,
উৎপাটিয়া মহীরুহে, দীর্ণ করি' বালির ভূধর,
সিক্ত করি' মরুভূমি, নগর কান্তার-প্রান্ত দিয়া,
ভাষার মর্ম্মর-হর্ম্মে উর্ম্মি-রঙ্গে কাঁপি থর থর,
লবণাক্ত সিন্ধুবক্ষ ফিরে যাক্ গাহি কল্ কল্
বহুক্রোশ ধরি' স্বচ্ছ রাখি' তা'র নভোনীল জল।

[প্রাচ্য]

বাজাও বাজাও শঙ্খ সুগম্ভীরে 'সত্য'-ভগীরথ !
কল্লোলি', কল্লোলি', বুকে, চিত্ত-গঙ্গা উথলিতে থাক্ ;
শুণ্ড আস্ফালিয়া আসি' অন্ধ মত্ত মূঢ় ঐরাবত
তরঙ্গের লীলারঙ্গে তৃণখণ্ড সম ভেসে যাক্ !
পদ্মবন-মধ্যে পশি' ফেণ হাস্যে লুটি' পদ্মফুল,
তীর্থরজঃ বক্ষে মাখি' মহোল্লাসে উছলি' উছলি',
শ্মশানে সুন্দর করি', হাসাইয়া তরুশ্যাম-কূল,
প্রেম-ভক্তি-শক্তি রসে সিক্ত করি' ধরণীর ধূলি,
পুণ্য-বারিধারা সম, শান্তির সাগর-তটে গিয়া
"কোলে লও" বলি' হর্ষে দ্বিধাশূন্য পড়ুক লুটিয়া।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।